মণি বাগচি

জিজ্ঞাসা ॥ কলিকাতা

স্বনামধন্য ঐতিহাসিক
যদুনাথ সরকারের
পুণ্য স্মৃতিতে

RASHTRAPATI NILAYAM,
BOLARUM (HYDERABAD).
राष्ट्रपति निलयम,
बोलारम (हैदराबाद)।

My dear Moni Bagchee,

Thank you for your letter of the 23rd of July.

I am glad to know that you have written a biography of the late Sri Romesh Chander Dutt — a great historian and administrator.

One of his sons was a lecturer in the Law College at Calcutta and he used tu talk about his father.

I have now given up writing forewords to books because I had too many of them already. Forgive me.

With the best wishes,

Yours sincerely,

(S.Radhakrishnan)

Sri Moni Bagchee,
90, Baguiati Road, Dum Dum,
Calcutta-28.

"Biography is the essence of history... If one wants to know the meaning of history, let him look into the lives of great men." মনীষি কার্লাইলের এই মতবাদে আমি বিশ্বাসী। উনিশ শতকের বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে হোলে সেই জাগরণের বিভিন্ন পর্বে যাঁরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের জীবনানুশীলন অপরিহার্য।

রমেশচন্দ্র দত্ত এমনি একজন ব্যক্তি। দুঃখের বিষয়, তাঁর উত্তরপুরুষের নিকট তিনি অনেকখানি অবহেলিত, বিস্মৃতপ্রায় বললেও চলে। বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত তাঁর বিষয়ে একখানি জীবনচরিত লেখা হয়নি; তাঁর বহুমুখী প্রতিভার বিশেষ আলোচনাও সাম্প্রতিককালে হয় নি। ১৯৫৪ সালে একদিন নিবেদিতা-প্রসঙ্গে আচার্য যদুনাথ সরকার আমাকে বলেছিলেন: "যদি পারো, রমেশ দত্তের একখানা জীবনী লিখো। অত বড়ো intellectual leader আমাদের দেশে খুব বেশি জন্মগ্রহণ করেন নি।" সেই থেকে শুরু হয় আমার রমেশ-চরিতানুশীলন।

"He was a man of his own people." রমেশচন্দ্র সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতার এই একটিমাত্র উক্তির মধ্যে বিধৃত হয়েছে তাঁর সমগ্র জীবনের সূত্র। এই সূত্র ধরেই আমি এই মনস্বী ব্যক্তির চিন্তা ও কর্মের মূল্য নিরূপণ করতে প্রয়াস পেয়েছি। তাঁর বহুভঙ্গিম প্রতিভার অকৃপণ দানে ঊনবিংশ শতাব্দের দ্বিতীয়ার্ধের ইতিহাস এবং সমাজ-মানস কতদূর সমৃদ্ধ ও উন্নত হয়েছে, তারই পরিচয় আছে এই গ্রন্থে।

১০ বাওইআটি রোড
কলিকাতা—২৮

মণি বাগচি

॥ মণি বাগচির অন্যান্য বই ॥

ছোটদের ছত্রপতি
ছোটদের বার্ণার্ড শ
ছোটদের শ্রীঅরবিন্দ
ছোটদের বিবেকানন্দ
ছোটদের গৌতমবুদ্ধ
কাজলরেখা
লীলা-কঙ্ক
আমাদের বিদ্যাসাগর
নানাসাহেব
সিপাহী বিদ্রোহ
কেমন করে স্বাধীন হলাম
বাংলা সাহিত্যের পরিচয়
মহাচীনে শ্রীনেহরু
রবির আলো
অমর-জীবন

গৌতম বুদ্ধ
বিজয়কৃষ্ণ
রামমোহন
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
বিদ্যাসাগর
মাইকেল
কেশবচন্দ্র
বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র
নিবেদিতা
নিবেদিতা-নৈবেদ্য
সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস
আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ
সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র
শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার

SISTER NIVEDITA
OUR BUDDHA

॥ পরবর্তি বই ॥

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ
স্যর আশুতোষ

॥ এক ॥

১৮৭১ সালে লণ্ডন থেকে এক কৃতবিদ্য যুবক কলকাতায় তাঁর কনিষ্ঠের কাছে এক চিঠিতে লিখছেন :

"ভারতবর্ষের সভ্যতা প্রাচীন এবং মহৎ, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের আধুনিক সভ্যতা থেকে অনেক কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আশা করি য়ুরোপ ও ইংলণ্ডের সঙ্গে আমরা যত বেশি মিশতে পারব, ততই বেশি করে কয়েকটি মহদ্‌গুণ এবং কয়েকটি মহৎ প্রতিষ্ঠান সেখান থেকে গ্রহণ করব। য়ুরোপের এই শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এগুলো আমাদের পক্ষে খুব প্রয়োজনীয়। যান্ত্রিক পণ্যোৎপাদনে, বাণিজ্য-ব্যবসায়ে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠনে এবং সামাজিক উন্নতিতে ভারতবর্ষ যেদিন পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্থান লাভ করবে, আমাদের সন্তানগণের সন্তানেরাই সেদিন প্রত্যক্ষ করবে। ভারতের সেই দিনের প্রভাত অচিরেই দেখা দিক।" (অনুবাদ)

এই যুবক রমেশচন্দ্র দত্ত।

উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাসেব চরিত্র-চিত্রশালায় একটি অভিনব চিত্র; নিজস্ব মহিমায় দীপ্যমান একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র। তিন বছর বিলেতে অবস্থান করে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে সিবিল সার্বিস ও ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বদেশে ফিরবার সময়ে য়ুরোপীয় সভ্যতার পরিচয়ে মুগ্ধ রমেশচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র তেইশ বছর। বয়স কম হলেও দেখা যাচ্ছে যে, সেই বয়সেই তাঁর মনে জেগেছে একটি উচ্চ আশা ও উজ্জ্বল স্বপ্ন। চিঠিখানিতে তারই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। রমেশচন্দ্রের সেই উজ্জ্বল স্বপ্ন, সেই উচ্চ আশা নিঃসন্দেহে এক ইতিহাস-সচেতন ভবিষ্যৎদ্রষ্টার কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। তেইশ বছর বয়সের এক তরুণ সিবিলিয়ানের এই যে চিন্তার ধারা, ইহাই রমেশচন্দ্রের জীবনাদর্শকে, তাঁর পরবর্তি জীবনের সকল কর্মকৃতিকে বোঝবার পক্ষে আমাদের সহায়তা করবে।

রমেশ-প্রতিভার কয়েকটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য আছে, যথা, স্বদেশের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির ওপর তাঁর গভীর অনুরাগ। উনিশ শতকের প্রত্যেকটি বরণীয় বাঙালি সন্তানের চরিত্র এই লক্ষণাক্রান্ত। সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে রমেশচন্দ্র ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি; তাই তাঁর প্রখর ইতিহাস-বোধ তাঁকে করে তুলেছিল একজন বাস্তবধর্মী ও যুক্তিনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক। এ জিনিস ছিল রামমোহনে, ছিল মাইকেলের মধ্যে আর ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে। কিন্তু রমেশচন্দ্র আরো একটু এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন। প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার ওপর তিনি যে বইখানা লিখেছেন তার ভূমিকায় তিনি বলছেন: "অতীত ইতিহাসের সযত্ন ও সমালোচনামূলক অনুশীলন ভিন্ন জাতির মানস গড়ে ওঠে না, জাতীয় চরিত্র গঠিত হয় না।" অতীতের প্রতি অন্ধ মোহ জাতীয় চরিত্র বিকাশের পথে যে অন্তরায়স্বরূপ, এ কথা রামমোহনের পর, এমন যুক্তিসিদ্ধভাবে রমেশচন্দ্রের মতন আর কেউ বলেছেন কি না সন্দেহ। হিন্দু-শাস্ত্র ও ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু সেই শ্রদ্ধা তাঁর বুদ্ধিকে মোহাচ্ছন্ন করেনি বলেই ভারত-ইতিহাসের গবেষণার ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্র পথিকৃৎ হতে পেরেছিলেন। আবার দেখি, যেমন ইতিহাসে তেমনি অর্থনীতিতেও তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। এ পাণ্ডিত্যের সম্যক মূল্যায়ন আমরা আজ পর্যন্ত ঠিকমত করতে পেরেছি কি না সন্দেহ। অর্থনীতির গবেষণায় রমেশচন্দ্রের অবদান স্মরণীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। উনিশ শতকের আর কোনো বাঙালি চিন্তানায়ক এই ক্ষেত্রে তাঁর তুল্য কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। ইতিহাসের বিবর্তনে অর্থনীতির যে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে, আমাদের দেশে এই বিষয়টি নিয়ে রমেশচন্দ্রের মতন আর কেউ-ই সেযুগে চিন্তা করেন নি। রমেশ-প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য এইখানেই।

বলেছি, হিন্দুশাস্ত্র তথা ঐতিহ্যের প্রতি রমেশচন্দ্রের অনুরাগ ছিল। এই অনুরাগের গভীরতা আজ অনুধাবন করবার দিন এসেছে। ঘোরতরভাবে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং বিশিষ্ট সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্রের হিন্দুধর্মপ্রীতি তাঁর ব্যক্তিত্বকে আর একটি উজ্জ্বল গরিমা প্রদান করেছে। ভারতের প্রাচীন আর্য-ধর্মের প্রতি তিনি যে সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন, বেদ, রামায়ণ-মহাভারতের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করে জাতীয় সংস্কৃতির মহিমাকে পাশ্চাত্য

সমাজে তুলে ধরবার প্রয়াস পেয়েছিলেন, সে কী কম প্রতিভার পরিচায়ক! হিন্দুধর্মের অবহেলিত গৌরবকে, তার বৈশিষ্ট্যকে ইতিহাস-সম্মত ভাবে বুঝবার ও বুঝাবার যে চেষ্টা রমেশচন্দ্র করেছিলেন, সমকালীন বাংলায় তা যে একটি বিশেষ প্রেরণার সৃষ্টি করেছিল, সে কী বিস্মৃত হবার জিনিস? "হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করাই তোমাদের পরম আনন্দ, হিন্দুধর্ম পালন করাই তোমাদের জীবনের ব্রত"—সেযুগের বাংলায় এমন প্রত্যয়ের সঙ্গে এই কথা যাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছিল সেই রমেশচন্দ্র, তাঁর পূর্বসূরি রামমোহনের মতোই ছিলেন 'a brilliant product of English education in India'—ইংরেজি শিক্ষায় সুশিক্ষিত। ঋগ্বেদসংহিতার বাংলা অনুবাদ করতে গিয়ে ধর্মব্যবসায়িদের হাতে রমেশচন্দ্রকে লাঞ্ছিত হোতে হয়েছিল। ঋগ্বেদ-সংহিতা রচনায় এবং তারপর হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থের সারাংশ বাংলায় অনুবাদ করা, এই দুইটি বিষয়েই রমেশচন্দ্রের প্রেরণা ছিলেন বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র। অথচ রমেশচন্দ্রের চিন্তাধারার মধ্যে আধুনিকতা কোথাও বিসর্জিত হয়নি। প্রাচীন ও নবীনের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও অনুরাগ রমেশ-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। যে নবীন জীবনচেতনা ও মূল্যবোধ রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল, তাকে আশ্রয় করেই উনিশ শতকের ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালির সমাজ ও সাহিত্যে আধুনিকতার পদক্ষেপ ঘটেছিল। সেই বহুভঙ্গিম আধুনিকতার সূতিকাগারেই আমাদের এই আলোচনার নায়ক রমেশচন্দ্র দত্তের জন্ম।

প্রতিভাধর পুরুষ রমেশচন্দ্র। তাঁর অসামান্য মেধা ও পুরুষাকার সমকালীন ভারতবর্ষে সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'R. C. Dutt' এই নামটি তখন ভারতবর্ষের বৃহত্তর সমাজে অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে উচ্চারিত হোত; ইংরেজ রাজপুরুষেরা তাঁকে যেমন খাতির করতেন, তাঁর সমকালীন নেতৃস্থানীয় সকলেই তাঁকে তেমনি সমীহ করতেন। কেশবচন্দ্রের পর এক সুরেন্দ্রনাথ ভিন্ন এতখানি শ্রদ্ধা আর কেউই সেযুগে অর্জন করতে পারেন নি। দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্যে সারাজীবন তিনি ব্যাপৃত ছিলেন, অথচ তারই মধ্যে

উদ্বৃত্ত সময় ও সামর্থ্য তিনি যে কেমন করে স্বজাতির কল্যাণে নিয়োগ করে গেছেন, এ-কথা চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়। আচার্য যদুনাথ একবার বলেছিলেন: "যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে, উনিশ শতকের বাংলায় কোন্ মনীষির বহুমুখী প্রতিভা আমাদের জাতীয় জীবনের নানাদিকে নূতন আলোকপাত করেছে, তাহোলে আমি বলব—রমেশচন্দ্র দত্তের।" সেই সঙ্গে আমরা আর একটি জিনিস লক্ষ্য করি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যুগ্মধারা রমেশচন্দ্রের মধ্যে মিলিত হয়েছিল। এটা তিনি পারিবারিক সূত্রে লাভ করেছিলেন। রামবাগানের দত্ত-পরিবার সেযুগে ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য খ্যাত ছিল; অবার ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এই পরিবারের প্রত্যেকটি সুসন্তান জাতীয় সংস্কার ও পারিবারিক রীতি-নীতি মেনে চলতেন। সুহৃদ্ সুরেন্দ্রনাথের মতন রমেশচন্দ্র দেশনায়কের গৌরব লাভ করেন নি বটে, কিন্তু দেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণে তনুমন নিবেদন করে রমেশচন্দ্র যে দেশপ্রেমের পরিচয় রেখে গেছেন, তাঁর উত্তরপুরুষের সামনে আজ সেই আদর্শটি—যা মানবতার আদর্শ—যেন কতকটা উপেক্ষিত মনে হয়। জাতীয় জীবনে তাঁর দান যে অবহেলার জিনিস নয়, বরং গভীরভাবে অনুশীলনের বিষয়, এই কথাটি যেন আমরা মনে রাখি। রমেশ-চরিত্র আলোচনা করলে তাঁর সম্পর্কে একটি বিশেষণই আমার মনে পড়ে—'নীরব দেশপ্রেমিক'। কোলাহল মুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে তিনি তাঁর কর্মজীবনের বেদী রচনা করেন নি। তাঁর সমগ্র সত্তা অনুপ্রাণিত ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধায়। সম্ভবত এই কারণেই সুলেখক ও সুবক্তা হওয়া সত্ত্বেও রমেশচন্দ্রের পক্ষে নীরবে, একাগ্রচিত্তে কাজ করাই ছিল স্বাভাবিক। তাঁর সকল চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্রে ছিল ভারতের অতীত গৌরব আর ভবিষ্যৎ উন্নতি। এইখানে তিনি মাইকেলের সমগোত্র এবং বিবেকানন্দের পূর্বসূরি। বহু বিরুদ্ধগুণের সমন্বয়ে সার্থক হয়েছিল রমেশচন্দ্রের জীবন ও জীবন-সাধনা।

রবীন্দ্রনাথের সংযত লেখনীমুখে রমেশ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এইভাবে বর্ণিত হয়েছে:

"তাঁহার চরিত্রে প্রাণের বেগের সঙ্গে অপ্রমত্ততার যে সম্মিলন ছিল তাহা এখনকার কালে দুর্লভ। তাঁহার সেই প্রচুর প্রাণশক্তি তাঁহাকে দেশহিতকর

বিচিত্রকর্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে। অথচ সে শক্তি কোথাও আপনার মর্যাদা লঙ্ঘন করে নাই। কি সাহিত্যে, কি রাজকার্যে, কি দেশহিতে—সর্বত্রই তাঁহার উদ্যম পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে, কিন্তু সর্বত্রই আপনাকে সংযত রাখিয়াছে—বস্তুত ইহাই বলশালিতার লক্ষণ। এই কারণে সর্বদাই তাঁহার মুখে প্রসন্নতা দেখিয়াছি—এই প্রসন্নতা তাঁহার জীবনের গভীরতা হইতে বিকীর্ণ। স্বাস্থ্য তাঁহার দেহে ও মনে পরিপূর্ণ হইয়াছিল—তাঁহার কর্মে ও মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে এই তাঁহার নিরাময় স্বাস্থ্য একটি প্রবল প্রভাব বিস্তার করিত। তাঁহার জীবনের সেই সদাপ্রসন্ন অরুগ্ন নির্মলতা আমার স্মৃতিকে অধিকার করিয়া আছে। আমাদের দেশে তাঁহার আসনটি গ্রহণ করিবার আর দ্বিতীয় কেহ নাই।"

এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতাকে লেখা রমেশচন্দ্রের একটি চিঠির কথা মনে পড়ে। সেই চিঠিতে তিনি লিখছেন: "জড়ত্বের সাধনা অপেক্ষা স্বপ্ন সত্য। নিষ্ক্রিয়তাই মৃত্যু, সক্রিয়তাই শক্তি।" ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রাচীন হিন্দুজাতির ইতিহাস, বাঙালির ইতিহাস, হিন্দুর ধর্ম, সভ্যতা, সাহিত্য, ভারতীয় মহাকাব্য ও মহাকাব্যের যুগ—এই সবই নিয়ে রমেশচন্দ্র আজীবন স্বপ্ন দেখেছেন, যেমন স্বপ্ন দেখেছিলেন ঐতিহাসিক গিবন। কথিত আছে, ১৭৬৪ সালের এক সন্ধ্যায় রোমের ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে গিবন একবার অতীতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং সেই মুহূর্তে তাঁর কল্পনায় দেড় হাজার বছরের পৃথিবীর ইতিহাস অকস্মাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং তখনই তিনি রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস রচনা করতে কৃতসংকল্প হলেন। সেই সন্ধ্যাবেলার স্বপ্নকে রূপ দিতে গিবন-এর লেগেছিল পঁচিশ বছর; পঁচিশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের একদিকে ছিল অজস্র অধ্যয়ন আর অন্যদিকে অবিশ্রান্ত লেখনী-চালনা। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের অনুশীলনের ক্ষেত্রে, এর মহাকাব্যের অনুবাদ, বিপুলায়তন ঋগ্বেদের অনুবাদ, আর সর্বোপরি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে ভারতবর্ষে সমগ্র ভিক্টোরীয় যুগের অর্থনীতির ক্রমিক রূপ-পরিবর্তনের সুসংহত আলোচনায় তথ্যসন্ধানী রমেশচন্দ্রও

তেমনি স্বপ্ন দেখেছেন, তেমনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁর জীবনব্যাপী সাহিত্য-সাধনা ও স্বদেশসেবার মধ্যে কোনো ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য, প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতা সেদিন ইংলণ্ডের বিদগ্ধ সমাজের কাছে যে প্রশংসা লাভ করেছিল, তার ইতিহাস কোনোদিনই বিস্মৃত হবার নয়। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইংরেজ জাতির পূর্ব-সংস্কার তখন থেকেই বদলাতে শুরু করে। এই স্বদেশসেবার ইতিহাসই রমেশচন্দ্রের জীবনের প্রকৃত ইতিহাস।

বর্তমান আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গি ইহাই।

॥ দুই ॥

রামবাগানের বিখ্যাত দত্ত-পরিবারে রমেশচন্দ্রের জন্ম।

পারিবারিক জীবনে তিনি সত্যই সৌভাগ্যবান ছিলেন। উনিশ শতকের কলকাতায় প্রকৃত সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবার বলতে তিনটি ছিল,—জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার, শোভাবাজারের দেব-পরিবার আর রামবাগানের দত্ত-পরিবার। ইংরেজি বিদ্যার চর্চায় দত্ত-পরিবারের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সুবিদিত। "পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রবেশের দ্বার এই পরিবারে সর্বদাই উন্মুক্ত ছিল। কেবল তাহাই নহে, এই পরিবারে অনেকেই সাহিত্যে বিখ্যাত না হইলেও সাহিত্যচর্চার প্রতি অনুরাগ দেখাইয়াছেন। বিশেষতঃ ইতিহাসচর্চার প্রতি এই পরিবারের সকলের আগ্রহ ছিল।" পরিবার-পরিবেশের প্রভাব ব্যক্তির জীবনে স্বাভাবিক। রমেশচন্দ্রের জীবনে অনুপ্রবেশ করবার আগে আমরা তাই দত্ত পরিবারের কথা কিছু উল্লেখ করব।

এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা নীলমণি দত্ত। তাঁর ডাক-নাম ছিল নীলু দত্ত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অধীনে যে নতুন বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল নীলমণি দত্ত সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই একজন। ইনি রামমোহন ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের অনেক পূর্ববর্ত্তি। যে বছর পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেই বছরে তাঁর জন্ম। সুতরাং তাঁকে আমরা অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মানুষ বলে গণ্য করতে পারি। নীলমণি দত্তের বাবা, পরিবার থেকে পৃথক হয়ে কলকাতায় এসে স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করেন। এই শহরে দত্ত পরিবারের সূচনাকাল তখন থেকেই। বাংলায় তখন একটা বড় রকমের রাষ্ট্রবিপ্লব একরকম নিঃশব্দেই সংঘটিত হয়েছে বললেই হয়। বাঙালির সমাজ-জীবনে তার প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে দেখা দিয়েছে এবং কলকাতা তখন হয়ে উঠেছিল একটি বিরাট যুগ-পরিবর্তনের পীঠস্থান। নতুন শাসক জাতি নিয়ে এলো তাদের নতুন ভাষা। সেই ভাষার মাধ্যমে ইংরেজি সাহিত্যের ভেতর দিয়ে বাঙালি ক্রমে ক্রমে যতই বুঝল যে ইংরেজ বুদ্ধিতে অপরাজেয়, আদর্শে অভিনব, ততই সে শাসক জাতির প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগল।

যতই দিন যেতে লাগল বাঙালি ততই যেন মনে প্রাণে গ্রহণ করল ইংরেজের সাহিত্য, তার সামাজিক ন্যায়বিচার, যুক্তিধর্মী মন ও মনন আর বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা এবং শিক্ষা ও আইনের সার্বভৌম আদর্শ। এই প্রক্রিয়া একদিনে সাধিত হয় নি। পলাশির যুদ্ধের অন্ততঃ পঁচিশ বছর পর থেকে বাঙালির সমাজ-জীবনে এই ক্রমিক রূপ-পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নীলমণি দত্তের শিক্ষা-দীক্ষার আরম্ভ সেই যুগসন্ধিক্ষণেই। অল্প বয়সেই ইংরেজি ভাষায় তিনি পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। এ পারদর্শিতাকে পাণ্ডিত্য মনে করবার কারণ সেই দেশে তখন তার সুযোগই বা কোথায়। তখনকার দিনে সাহেব লোকদের সঙ্গে ইংবেজিতে অনাযাসে কথা বলা বা ইংরেজিতে চিঠিপত্র লিখতে পারাই ছিল পারদর্শিতার সমতুল্য। যে মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত বাঙালি ইংরেজি ভাষাকে প্রায় নিজেদের মাতৃভাষার মতোন আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, নীলমণি দত্ত ছিলেন তাঁদেরই একজন। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীতেই তিনি ইংরেজিনবীস বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তখনকার দিনে ইংরেজি-জানা বাঙালির পক্ষে সব চেয়ে লাভের পেশা ছিল মুচ্ছুদি বা বেনিয়ানের কাজ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গোড়ার আমলের ইতিহাস যাঁদের জানা আছে, তাঁরা জানেন যে, সেযুগে এই পেশা অবলম্বন করে ইংরেজি-শিক্ষিত কয়েকজন বাঙালি বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। এদেশের ব্যবসায়িদের সঙ্গে ইংরেজ বণিকরা যখন ব্যবসায় শুরু করল, তখন তাদের পক্ষে মুচ্ছুদিরা ছিল একান্ত অপরিহার্য। আবার তাদের সময়ে-অসময়ে টাকার প্রয়োজন হলে এদেরই শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন উপায় ছিল না। একদিকে সদাগরী ইংরেজ, আর অন্যদিকে দেশীয় ব্যবসায়ী, এই দুই পক্ষেরই কাজ-কারবার মুচ্ছুদি ছাড়া চলবার উপায় ছিল না। ইংরেজ মহলে সেদিন নীলমণি দত্তের পরিচয় ছিল 'নিলু বেনিয়ান' বলে। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আর সততা, এই দুইয়ের সমাবেশে বর্ধিত হয়েছিল তাঁর প্রতিপত্তি। কথিত আছে যে, সারাদিন ধরে তিনি উপায় করতেন প্রচুর, কিন্তু সেই অর্জিত আয়ের অনেকখানি তিনি রেখে আসতেন। কারবারী ইংরাজদের সঙ্গে মেলা মেশার ফলে তিনি speculatior-এ নামেন। এজন্য তাঁকে সময় সময় প্রচুর আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। কিন্তু সেই ক্ষতির পথ দিয়েই দত্ত-বাড়িতে লক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটেছিল এবং সেইসঙ্গে সরস্বতীরও। এ বাড়িতে

আর কোনো বিগ্রহ স্থান পায়নি। শিক্ষা ও সংস্কৃতিই ছিল এই পরিবারের উপাস্য। বেনিয়ানের কাজ করে যখন নীলমণি দত্ত একটু সঙ্গতিসম্পন্ন হলেন, কলকাতায় রামবাগান অঞ্চলে তিনি এক বিরাট ভূখণ্ড ক্রয় করে বসতবাটি নির্মাণ করেন। জায়গাটা ছিল শোভাবাজারের রাজাদের ব্রহ্মোত্তর জমি। যে ব্রাহ্মণকে এটা দান করা হয়েছিল, তিনিই মাত্র চার-আনা কাঠায় নীলমণি দত্তকে সেই জমি বিক্রয় করেছিলেন।

নীলমণি দত্ত মুচ্ছুদির কাজ করে অর্থ ও প্রতিপত্তি দুই-ই লাভ করেছিলেন। রামবাগানের দত্ত-পরিবারের সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে তিনিই প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। স্বভাবতই তখনকার দিনে উদীয়মান ও প্রভাবশালী অন্যান্য পরিবার তাঁকে সম্মান দেখাতেন। শোভাবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, লর্ড ক্লাইভের মুন্সী নবকৃষ্ণ দেব সব সময়ই এই 'নীলু দত্তের' ইংরেজি জ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করতেন।

নীলমণির তিন ছেলে—রসময়, হরিশ ও পীতাম্বর। কনিষ্ঠ পীতাম্বরই রমেশচন্দ্রের পিতামহ আর তাঁর বড় ছেলে ঈশানচন্দ্র (১৮১৮) তাঁর পিতা। ঈশানচন্দ্র ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। রমেশচন্দ্র যখন হেয়ার স্কুলের ছাত্র, তখন মাত্র দু' বছরের ব্যবধানে তাঁর পিতামাতার মৃত্যু হয়। অতঃপর খুল্লতাত শশীচন্দ্র ভ্রাতুষ্পুত্রদের অভিভাবকের স্থান গ্রহণ করেন। রমেশচন্দ্রের জীবনে তাঁর এই খুল্লতাতের বিশেষ প্রভাব ছিল। রমেশচন্দ্রের কথা বলবার আগে তাঁর খুল্লতাতের কথা কিছু বলা দরকার। আগেই বলেছি, দত্ত পরিবার গোড়া থেকেই ইংরেজি চর্চার জন্য তৎকালীন কলকাতার সমাজে একটা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। শশীচন্দ্র দত্ত ছিলেন তখনকার দিনের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরেজি-লেখক। ইংরেজি পদ্য ও গদ্য রচনায় তিনি সমান দক্ষ ছিলেন। লণ্ডনের 'ব্ল্যাকউডস্ ম্যাগাজিনে' তাঁর ইংরেজি কবিতার সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। 'রায় শশীচন্দ্র দত্ত বাহাদুর'—খেতাব সহ এই নামটি শুনলেই মনে হবে ইংরেজের বশংবদ শ্রেণীর কোনো শিক্ষিত বাঙালির নাম। প্রকৃত ঘটনা কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি সরকারী চাকরি করতেন এবং পাণ্ডিত্য, কর্মদক্ষতা এবং ন্যায়নিষ্ঠতার গুণে শশীচন্দ্র বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে হেড এ্যাসিস্ট্যান্ট পদে উন্নীত হয়েছিলেন। স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ তাঁর ছিল। সরকারী

চাকরি গ্রহণ করেও তিনি সাহিত্যচর্চা থেকে কোনোদিন বিরত ছিলেন না। ভ্রাতুষ্পুত্র রমেশচন্দ্র তাঁর খুল্লতাতের এই গুণটি বিশেষভাবে অর্জন করেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ শশীবাবুর জীবিতকালের ঘটনা। এই বিদ্রোহের কাহিনী নিয়ে তিনি ইংরেজিতে একখানি উপন্যাস রচনা করেন। বইটির নাম:— *Shankar. A Tale of the Indian Mutiny*; নামেই উপন্যাস, কিন্তু এর ভিতর এমন বস্তু ছিল যা তৎকালীন শাসকগোষ্ঠির পক্ষে পরিপাক করা কঠিন ছিল। দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত একজন রাজভক্ত প্রজার কলম দিয়ে ইংরেজের চরিত্রকে কটাক্ষ করে কিছু বেরুতে পারে, শাসকবর্গ যেন এটা ধারণাই করতে পারেন নি। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সৈন্যের দুইজন প্রতিনিধি-স্থানীয় শ্বেতাঙ্গপুঙ্গবের যে চরিত্র শশীবাবু তাঁর এই উপন্যাসে উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছিলেন, তা তখন রীতিমত বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল। এ বই যখন তিনি লেখেন তখন শশীবাবুর চাকরির তেরো বছর চলছে। আরো উন্নত পদে তাঁর প্রোমোশন অবধারিত ছিল, কিন্তু বাদ সাধল 'শঙ্কর'। শশীচন্দ্রকে এই অপরাধের জন্য জবাবদিহি করতে হয়েছিল। বইখানি যখন প্রকাশিত হয় তখন তাঁর প্রোমোশনের সময়। এইবার শশীবাবুর এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারির পদে উন্নীত হবার কথা। যখন দুজন এই দেশীয় সহকারী সচিব নিয়োগের কথা উঠল, তখন স্বতঃই কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে বিবেচনা করে শশী দত্তের নাম একটি পদের জন্য প্রস্তাবিত হোল। কিন্তু ঐ অপরাধের জন্য শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে তাঁকে ডিঙিয়ে দুজন ইংরেজ কর্মচারীকে ঐ দুইটি পদে নিয়োগ করা হোল। নির্ভীক ও তেজস্বী শশী দত্ত প্রতিবাদ জানিয়ে পদত্যাগ করলেন। বিদ্যাসাগরের পরে বাঙালির সরকারী চাকরি ত্যাগ করার এই দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। এই ঘটনার পর ইংরেজ-বিদ্বেষী শশী দত্তকে 'রায় বাহাদুর' খেতাব দেওয়া হয়; কিন্তু খেতাব লাভে তিনি বিশেষ উল্লসিত বোধ করেন নি। চাকরিতে ইস্তফা দেবার পর তিনি পড়াশুনা নিয়েই থাকতেন। তাঁর ঐতিহাসিক রচনাবলীর মধ্যে *The Ancient World, Modern World* ও *Bengal*—এই তিনখানি সমধিক প্রসিদ্ধ। ১৮৮৫ সালে একষট্টি বছর বয়সে শশীচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ভ্রাতুষ্পুত্র রমেশচন্দ্র তাঁর এই খুল্লতাতের কাছ থেকে দুটি জিনিস পেয়েছিলেন—চারিত্রিক দৃঢ়তা আর সাহিত্যিক গৌরবস্পৃহা।

দত্ত-পরিবারের কথা আরো একটু বলব। নীলমণি দত্ত যখন মারা যান তখন তিনি বিরাট ঋণের বোঝা রেখে গিয়েছিলেন। দরাজ হাতে দান-ধ্যান করে নীলু দত্ত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর ছেলেদের বিপদে পড়তে হয়েছিল। বড ছেলে রসময় দত্ত (ইনিই সেই রসময় দত্ত যিনি বিদ্যা-সাগবের ছাত্রাবস্থায় ও পরে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি ছিলেন) কঠিন হাতে রাস টানলেন। ইংরেজি ভাষায় সুপণ্ডিত রসময় দত্ত ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে এবং সমাজ-সংস্কারে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে শাসক শ্রেণীব সুনজরে পড়েছিলেন। পূজাপার্বনে অযথা অর্থব্যয় বন্ধ করে, সমাজ-সংস্কাবে উদ্যোগী হয়ে তিনি সনাতনীদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন, কিন্তু তাতে তাঁর কোনো ক্ষতি হয়নি। ক্রমে তিনি ছোট আদালতের বিচাব কর পদ গ্রহণ করেন। তখনকার দিনে ছোট আদালতের জজ হওয়া শিক্ষিত বাঙালির কাছে খুবই দুর্লভ বিষয় বলে বিবেচিত হোত। রসময় দত্তের পাঠানুরাগ ছিল প্রবল। বস্তুতঃ নীলমণি দত্ত থেকে শুরু করে দত্ত পরিবারের পরবর্তী কয়েক পুরুষের এই-ই ছিল লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। দত্ত পরিবারের বৈদগ্ধ্য উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় হযে আছে। রসময়েব গ্রন্থাগারে ইংরেজি বইয়ের একটি চমৎকার সংগ্রহ ছিল এবং তিনি স্বয়ং ইংরেজির ভক্ত ছিলেন বলে ছেলেদের ইংরেজি শিখবার জন্য সর্বদা উৎসাহ দিতেন। ১৮৪৬ সালে বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজেব সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন, তখন রসময় দত্ত সম্পাদক। সংস্কৃত কলেজের আভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধনের ব্যাপার নিয়ে তাঁর সঙ্গে বিদ্যাসাগবের বিরোধ দেখা দেয়। বিদ্যাসাগরের প্রবর্তিত নীতির সঙ্গে রসময়ের নীতির সংঘর্ষ হোল। সংস্কারের বহর দেখে রসময় দত্ত শঙ্কিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সম্পাদক, তাই ক্ষমতার জোরে তিনি বিদ্যাসাগরের কতকগুলো প্রস্তাব একেবারে বাতিল করে দিয়েছিলেন। এর ফলে স্বাধীনচেতা বিদ্যাসাগর চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছিলেন। এই ঘটনাটি তখনকার দিনে কলকাতার শিক্ষিত সমাজে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি রসময় দত্তের মৃত্যু হয়। তাঁর ছেলে গোবিন্দচন্দ্র দত্ত। মাইকেলের মতন ইনিও ইংরেজিতে কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। গোবিন্দ দত্তের দুই মেয়ে—তরু আর অরু দত্ত—বাঙালি মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রথম

বিদেশী ভাষায় কবিতা লিখে তাঁদের কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। পরিণত বয়সে গোবিন্দ দত্ত খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। দত্ত পরিবারের এই শাখাটিই খ্রীষ্টান।

রমেশচন্দ্রের বাবা ঈশানচন্দ্র, মা থাকমণি। ১৮১৮ সালে ঈশানচন্দ্রের জন্ম। হিন্দু কলেজে ইনি একজন মেধাবী ছাত্র বলে খ্যাতি লাভ করেন। ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের ইনি অন্যতম প্রিয় ছাত্র। ঈশানচন্দ্রেরও সাহিত্য-প্রতিভা ছিল এবং হিন্দু কলেজে পড়বার সময়ে তিনি ইংরেজিতে যেসব প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করেছিলেন সেগুলি তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে প্রকাশিত হয়। মেডিক্যাল কলেজেও তিনি একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। ডাক্তারি পাশ করবার পর ঈশানচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক আগে ডেপুটী কালেক্টরের চাকরি পেয়েছিলেন। কিন্তু বয়োকনিষ্ঠ হোলেও বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ঈশানচন্দ্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। সেই সূত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহ করতেন।

এই প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র লিখেছেন: "যখন আমার ১০।১২ বৎসর মাত্র বয়স ছিল, তখন আমার পিতা এবং বঙ্কিমবাবু একত্র খুলনায় কাজ করিতেন, উভয়েই ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন, উভয়ের মধ্যে অতিশয় স্নেহ ছিল। আমার পিতার রাজকার্য হইতে অবসর লইবার সময় আসিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র রাজকার্যে তখন প্রবেশ করিয়াছেন মাত্র। সুতরাং বঙ্কিমবাবু আমার পিতাকে যৎপরোনাস্তি সম্মান করিতেন, এবং তাঁহার ঋষিতুল্য আদর্শ চরিত্র লক্ষ্য করিয়া বড় ভালো-বাসিতেন। তখন একবার বঙ্কিমবাবু কলিকাতায় আইসেন, আমাদের বাটীতে আমার পিতার সহিত একত্র আহার করেন,— সেই আমি বঙ্কিমবাবুকে প্রথম দেখিলাম। তিনি আমাকে অতিশয় স্নেহ করিলেন,—সে স্নেহ তিনি আজীবন ভুলেন নাই।"

ঈশানচন্দ্র সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন এবং এই উপলক্ষ্যে তাঁকে নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতে হোত। বাংলার প্রথম ছোটলাট স্যর ফ্রেডরিক হ্যালিডের সঙ্গেও ঈশানচন্দ্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। সরকারী চাকরি করলেও, কথিত আছে, ঈশানচন্দ্র একজন আত্মমর্যাদাপরায়ণ মানুষ ছিলেন। তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তা আর পরিশ্রম করবার অপরিসীম ক্ষমতা তাঁকে রাজপুরুষদের নিকট

শ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল। ঈশানচন্দ্রের তিন ছেলে, তিন মেয়ে। রমেশচন্দ্র তাঁর মধ্যম পুত্র। জ্যেষ্ঠ যোগেশ আর মধ্যমপুত্রের জন্মকালের মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র এক বছর চার মাস। তাই সম্পর্কে অগ্রজ হলেও, রমেশচন্দ্র তাঁকে বন্ধুর মতই জ্ঞান করতেন এবং দুই ভায়ের লেখাপড়াও আরম্ভ হয়েছিল এক সঙ্গে এক স্কুলে। উত্তরাধিকারসূত্রে পিতা ও খুল্লতাতের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আর সেইসঙ্গে দত্তপরিবারের ঐতিহ্য রমেশচন্দ্র পূর্ণমাত্রায় লাভ করেছিলেন।

১৮৬১ সালে খুলনায় ঈশানচন্দ্রের মৃত্যু হয়। অল্পবয়সে মাতৃপিতৃহীন হওয়ায় শশীচন্দ্রের সকল স্নেহ যেন বিশেষভাবে গিয়ে পড়ল রমেশচন্দ্রের ওপর। রমেশকে তিনি পুত্রাধিক মনে করতেন এবং ছেলেবেলাতেই তার অধ্যয়নকালে তার প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তিনি তার সম্বন্ধে একটা বড় রকমের ধারণা পোষণ করেছিলেন। এমন কি এ-কথাও বলেছিলেন, 'রমেশ থেকেই আমাদের এই পরিবারের গৌরব সারা দেশে একদিন ছড়িয়ে পড়বে।' শশী দত্তের এই ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয় নি। শুধু দত্তপরিবারের কেন, সমগ্র বাংলা তথা ভারতবর্ষের গৌরবস্থল রমেশচন্দ্র। আর কিছুর জন্যে না হোক, একমাত্র বাংলার নবজাগরণে যাঁরা প্রচুর পরিমাণ উপকরণ যুগিয়েছেন তাঁদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্তের একটি স্বতন্ত্র স্থান আছে—এই কারণে তাঁর কর্মকৃতি, তাঁর চিন্তা-ভাবনা আলোচনা করা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দত্তকুলোদ্ভব তিন মনীষির গৌরবে বাঙালি চিরদিন নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করবে—প্রথম, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দ্বিতীয়, 'তত্ত্ববোধিনী'-র অক্ষয়কুমার দত্ত এবং তৃতীয় এই আলোচনার নায়ক রমেশচন্দ্র দত্ত। ঈশানচন্দ্রের অকালমৃত্যুর পর তাঁর পুত্রকন্যাগণ সকলেই খুল্লতাত শশীচন্দ্রের স্নেহচ্ছায়ায় যথোচিতভাবে মানুষ হয়েছিলেন। তাঁদের শৈশবজীবন সম্পর্কে রমেশচন্দ্রের অগ্রজ যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তার থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হোল:

"রমেশের বয়স যখন চার বছর আর আমার পাঁচ, তখন আমাদের দুজনের একটি পাঠশালায় হাতেখড়ি হয়। একটা শুভদিন দেখে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। পাঠশালাটি ছিল আমাদের পল্লীর অনতিদূরেই। এখানে আমরা প্রথমে তালপাতায় এবং কিছুদিন পরে কলার পাতায় হাতের লেখা অভ্যাস করতাম। প্রথমে গুরুমশাই লিখে দিতেন; আমরা সেই

লেখার ওপর দাগ বুলোতাম। যতদিন আমরা পাঠশালায় পড়েছি ততদিন যুধিষ্ঠির নামে আমাদের একটি গৃহভৃত্য সঙ্গে করে পাঠশালায় নিয়ে যেত। আমরা দুই ভাই প্রথমে একই শ্রেণীতে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি হই। তারপর সরকারি কার্যব্যপদেশে পিতৃদেব যখন যেখানে বদলী হতেন, আমরাও তখন তাঁর সঙ্গে সেখানে যেতাম। ১৮৫৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন কোম্পানীর কাছ থেকে ভারত শাসনের ক্ষমতা গ্রহণ করেন, আমরা তখন পাবনা স্কুলে পড়ি।"

নিজের শৈশবজীবনের স্মৃতি রমেশচন্দ্র স্বয়ং এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন :

"বাল্যকালে পিতৃদেবের সঙ্গে বাংলাদেশের কয়েকটি জেলায় ভ্রমণের স্মৃতি আমার মনে আছে। বাবা ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। তখনো রেলপথ নির্মিত হয়নি। নৌকা অথবা পালকি করে এক দেশ থেকে অন্যদেশে যেতে হোত। কলকাতা থেকে যশোহর যেতে তখন যে সময় লাগত, এখনকার দিনে কলকাতা থেকে লাহোর বা বোম্বাই যেতে তার চেয়ে কম সময় লাগে। তখন লোকে ভ্রমণ কম করত, কিন্তু যেটুকু করত তার মধ্যে দেশের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয় খুব নিবিড়ভাবেই পাওয়া যেত। তখন একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাবার সময় আমরা যত গ্রাম, বাজার, শহর, নদী, ঘাট ও মন্দির প্রভৃতি দেখবার সুযোগ পেয়েছি, এখন দ্রুত বাষ্পীয়যানে ভ্রমণের মধ্যে তেমন সুযোগ কোথায়? এই ভাবেই আমরা বীরভূমে গিয়ে ছিলাম এবং সেখান থেকে আমার মায়ের সঙ্গে (আমার মা খুব ধর্মপরায়ণা ছিলেন) একবার বক্রেশ্বর গিয়েছিলাম। বাবার সঙ্গে আমি কুমারখালি ও বহরমপুর যাই এবং এই দুইস্থানের স্কুলেই কিছুদিন পড়েছিলাম। স্যর ফ্রেডরিক হ্যালিডে যখন মুর্শিদাবাদে দরবার করেন আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। অন্যান্য সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে আমার বাবাও ঐ দরবারে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। অতঃপর আমরা পাবনা যাই ও সেখানে আমরা দু'বছর ছিলাম। তখন সিপাহী বিদ্রোহের সময়। একদল ইংরেজ সৈন্য পাবনায় সেই সময় অবস্থান করছিল; তাদের অত্যাচারে স্থানীয় লোকজন খুব অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সিপাহী বিদ্রোহ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তারা ঐ স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। যাবার আগে তারা সকলে মিলে একটা অভিনয়ের

আয়োজন করেছিল। সেই অভিনয়ের জন্য 'ম্যাকবেথ' নাটকখানি নির্বাচিত হয়েছিল। মুখে মুখে বাবা আমাদের ম্যাকবেথের গল্পটা বলেছিলেন। সেই অভিনয় দেখে আমি খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের অবসান ঘটল এবং ভারত সাম্রাজ্যের শাসনভার মহারাণী ভিক্টোরিয়া গ্রহণ করলেন। এই উপলক্ষ্যে পাবনায় একটি উৎসব হয়। কামানও দাগা হয়েছিল। সেই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। সম্মিলিত জনতার কণ্ঠে 'Long live the king' গানটি ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই গাওয়া হয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমান সকলেই সেদিন এই কামনা প্রকাশ করেন এবং ব্রাহ্মণগণ পৈতাধারণ ক'রে মহারাণীর মঙ্গল কামনা করেছিলেন। পাবনা স্কুলে আমি একজন ভালো ছাত্র বলে পরিগণিত হয়েছিলাম এবং পারিতোষিক লাভ করেছিলাম। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, পারিতোষিক পাবার আমি যোগ্য ছিলাম কি না সন্দেহ। কেন না, আমি ও আমার বড়দাদা···সারাদিন তো হৈ চৈ আর খেলাধুলা করে কাটাতাম। কখনো বা আমাদের বাংলো থেকে পদ্মার তীর পর্যন্ত হেঁটে বেড়াতে যেতাম এবং বিস্ময় বিমুগ্ধ নয়নে সমুদ্রের মতন বিশাল সেই পদ্মার তরঙ্গভঙ্গ, তার স্রোতের উদ্দাম গতি দেখতাম। শৈশবের সেই স্মৃতি ভুলবার নয়।"

রমেশচন্দ্রের জন্মকাল ১৮৪৮, ১৩ই অগাষ্ট। বাংলা দেশে সমারোহপূর্ণ যে ঊনবিংশ শতাব্দী আরম্ভ হয়েছিল, তা তখন পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি এসে গেছে। যুগস্রষ্টা সমাজনেতাদের মধ্যে অনেকেই তখন ইতিহাসের গর্ভ থেকে একে একে আবির্ভূত হয়ে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের দিক দিয়ে বাংলা তখন অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। রমেশচন্দ্র উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের মানুষ; কিন্তু তাঁর জীবন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশককেও স্পর্শ করে গিয়েছে। ভারতবর্ষে সমগ্র ভিক্টোরীয় যুগের গতি ও তাৎপর্য তাঁর জীবনকালেই তিনি চাক্ষুষ করে গিয়েছেন এবং তা করেছেন গভীরভাবেই। এক শতাব্দীর অন্তে আরেক শতাব্দীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যে পট-পরিবর্তন হোল, রমেশচন্দ্রের চিন্তা-ভাবনা তাতেও কিছুটা রঙ

দিয়ে যেতে পেরেছে। তাঁর চরিত্রানুশীলনের সময় এই কথাটি আমাদের বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে।

১৮৬৪ সালে রমেশচন্দ্র হেয়ার স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন। পরীক্ষায় তিনি সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করে স্কলারসিপ পেয়েছিলেন। পুরাতন হিন্দুকলেজ তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। দু' বছর পরে রমেশচন্দ্র ফার্স্ট আর্টস পাশ করেন ও পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বত্রিশ টাকার স্কলারসিপ লাভ করেছিলেন। তিনি যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র, তখন স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ কলেজে সহকারী অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে তখন 'চাঁদের হাট' বসেছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত, আনন্দরাম বড়ুয়া, কার্তিকচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি অনেকে এই সময়ে স্যর গুরু-দাসের ছাত্র ছিলেন। তাঁর কলেজ জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এটি স্যর গুরুদাস তাঁর *The Education Problem* গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বাড়িতে অঙ্ক কষবার জন্য ছাত্রদের ছয়টি করে অঙ্ক দিতেন; সেগুলি সহজ থেকে কঠিন—এই পর্যায়ে সাজান থাকত। পর পর দুদিন রমেশচন্দ্র অঙ্ক কষে না আনাতে, স্যর গুরুদাস তার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। রমেশচন্দ্র উত্তর দেন যে অঙ্কশাস্ত্রে দক্ষতা না থাকায় তিনি নির্দিষ্ট অঙ্কগুলি কষবার চেষ্টা করেন নি। ছাত্রের এই উত্তরে অধ্যাপক সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন: "ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষার জন্য যেটুকু গণিত শিখতে হয়, তারজন্য নিউটন বা লাপ্লাসের প্রতিভার দরকার হয় না এবং ঐ পরীক্ষার জন্য যেটুকু সাহিত্য পড়তে হয়, সেজন্য সেক্‌স্‌পিয়র বা মিলটনের মনীষার আবশ্যক হয় না। একটুখানি পরিশ্রম করলে সকলেই এটা আয়ত্ত করতে পারে।" এই সামান্য তিরস্কার বাক্যে রমেশচন্দ্রের চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। সেইদিন থেকে তিনি যথাসাধ্য অঙ্ক কষতে চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই ঘটনাটির উল্লেখ করে স্যর গুরুদাস বলতেন: "রমেশচন্দ্র যে ভাবে অবনত মস্তকে আমার মতোন একজন নবীন শিক্ষকের উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন, সে কথা মনে হলেই আমার মন আনন্দে ভরে যায়। তখনই আমি বুঝেছিলাম যে এই তরুণ ছাত্রটির মধ্যে মহত্বের সকল উপাদানই নিহিত আছে।"

এই ঘটনার চল্লিশ বছর পরে, ১৯০৪ সালে, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন 'নাইট' উপাধি ভূষিত হলেন, তখন তাঁর একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে রমেশচন্দ্র তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে যে পত্রখানি লিখেছিলেন তার থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম :

"My personal relations with you, and my respect for your abilities and character, stretch back through a period of forty years. I sat at your feet as a humble learner in the Presidency College in the older days...Pardon me for writing all this. It is not often that I have time to indulge in sentiment in the midst of my laborious work. But your name in the papers of yesterday called back to my mind memories of nearly forty years, and if I have written down hurriedly what I felt, you will, no doubt, overlook the indiscretion of one who was your old student and is now your humble fellow-worker."

উনিশ শতকীয় বলিষ্ঠ মানসিকতার ছাপ আছে এই চিঠিখানিতে। এমন শিক্ষক আর এমন ছাত্র সত্যই দুর্লভ।

॥ তিন ॥

১৮৬৮, ৩রা মার্চ। 'মুলতান' জাহাজে চড়ে তিনজন উৎসাহী তরুণ বাঙালি বিলাত যাত্রা করলেন। তিনজনেরই এক লক্ষ্য—সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করবেন। সেই তিনজনের নাম—রমেশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ ও বিহারীলাল। তিনজনেই অভিন্নহৃদয় বন্ধু, এবং রমেশচন্দ্র ও বিহারীলাল ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের দেদীপ্যমান ছাত্র। তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন গ্র্যাজুয়েট; তিনি পড়তেন ডবটন কলেজে অপর দুজন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময়ই বিলাত যাত্রা করেন। রমেশচন্দ্র ও বিহারীলাল তাঁদের অভিভাবকদের না জানিয়েই গিয়েছিলেন; একমাত্র অগ্রজ যোগেশচন্দ্র অনুজের বিলাত যাওয়ার কথা জানতেন। সুরেন্দ্রনাথের বিলাত যাত্রায় তাঁর পিতার শুধু সমর্থনই ছিল না, বৃদ্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণ পুত্র সুরেন্দ্রনাথকে বিদায়সম্ভাষণ জানাবার জন্য চাঁদপাল ঘাট পর্যন্ত এসেছিলেন এবং ছেলেকে এই উপদেশ দিয়ে ফিরে আসেন যে, "বাবা! সব করো, কেবল বিবি বিয়ে করো না।" যাবার আগের রাতটা তিন বন্ধুতে ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের কাশিপুরের বাড়িতে অবস্থান করেছেন এবং পরের দিন সকালে সেখান থেকেই তাঁরা চাঁদপাল ঘাটে এসে জাহাজে চড়েন। কিন্তু বিহারীলালের বাবা চন্দ্রশেখর গুপ্ত পুত্রের বিলাত যাত্রার সংবাদ পেয়ে তাকে ফিরিয়ে নেবার জন্য চাঁদপাল ঘাট পর্যন্ত ছুটে এসেছিলেন।

তিনজন বাঙালি সন্তান একসঙ্গে সিবিল সার্বিস পড়তে বিলাত যাত্রা করছেন; সেদিনকার বাংলায় এটি একটি বড়ো রকমের ঘটনা ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্রমিক রূপ-পরিবর্তনের ইতিহাসে শাসনকার্যে ভারতীয়দের সুযোগ দেবার জন্য ১৮৫৪ সালে সিবিল সার্বিসের প্রবর্তন হয়। অনেকেরই হয়ত জানা নেই যে, সিবিল সার্বিস মুখ্যত লর্ড মেকলের সৃষ্টি। এই সম্পর্কে যে কমিটি বসেছিল মেকলে ছিলেন তার চেয়ারম্যান এবং মেকলেই চার্টার আইন পাশ হবার সময় বৃটিশ পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে তাঁর সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ উক্তিটি করেছিলেন: "It may be that the public mind of India

may so expand under our system as to outgrow that system, that our subjects, being brought up under good Government, may develop a capacity for better Government, that being instructed in European knowledge they may crave for European Institution. I know not whether such a day will ever come, but when it does come, it will be the proudest day in the annals of England."

সেইদিন আসতে খুব বিলম্ব হয়নি। মেকলে যে সিবিল সার্বিসের জন্ম ১৮৫৭তে সুপারিশ করেছিলেন, পরোক্ষভাবে সেই ভারতীয় সিবিল সার্বিসের সঙ্গে সংযুক্ত কয়েকজন ভারতীয় চিন্তানায়কের চিন্তা-ভাবনা সেইদিনটিকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে ত্বরান্বিত করে তুলতে অনেকখানি সহায়তা করেছিল। ১৮৫৪ সালের দশ বছর পরে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম সিবিলিয়ান হয়ে উচ্চ শিক্ষিত ভারতীয়দের সামনে একটা নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এরপর মনোমোহন ঘোষ (মাইকেলের বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম) তিন-তিনবার চেষ্টা করেও সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারেন নি। তিনি অবশেষে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরেছিলেন। রমেশচন্দ্র ও তাঁর বন্ধু দুজন যখন ঐ সুকঠিন ও ব্যয়বহুল পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করবেন সংকল্প করেন, তখন তাঁরা সবচেয়ে বেশি উৎসাহ যাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলেন তিনি ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ, এই কথা সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee) তখন বিলেতে; রমেশচন্দ্রদের বিলাত যাওয়ার সংবাদটা তাঁকে জানিয়ে মনোমোহন লিখলেন যে, তিনি যেন সাউদাম্‌টনে এসে এঁদের অভ্যর্থনা করেন।

এই তিন বন্ধুর বিলেত যাওয়ার খবরটা কলকাতায় আরেকজন জানতেন; তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি এবং মনোমোহন ঘোষ ঠিক তার এক বছর আগে ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরেছেন এবং ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েছেন। মাইকেল তখন থাকতেন স্পেনসেস্ হোটেলে। 'মধু-স্মৃতি' পুস্তকে এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে:

"দেশমান্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিলাত যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে,

তাঁহার পিতৃদেব ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের সহিত স্পেনসেস্ হোটেলে মধুসূদনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। যুবক সুরেন্দ্রনাথ সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দিতে যাইতেছেন এবং বি এ. পরীক্ষায় লাটিনে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন শুনিয়া মধুসূদন তাঁহাকে 'Let me examine you' বলিয়াই পার্শ্বস্থ পুস্তকাধার হইতে জগদ্বিখ্যাত কবি হোরেসের মূল লাটিন গ্রন্থ লইয়া তাহা হইতে একটি কঠিন অংশের কয়েক পংক্তির ব্যাখ্যা করিতে বলেন। সুরেন্দ্রনাথ সেই অংশটি সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করিতে না পারায়, মধুসূদন বলেন, 'তাই তো, তুমি সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ, পাস হবে কি?' সুরেন্দ্রনাথ উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'আজ্ঞে যাচ্ছি তো, দেখি চেষ্টা করিয়া, কি হয়।' পরে মধুসূদন, মনোমোহন ঘোষকে লক্ষ্য করিয়া রহস্যচ্ছলে বলিয়াছিলেন, 'তুমি দেখছি যত কুলি চালান দিচ্ছ।' অতঃপর তিনি তাঁহাকে 'Protector of Indian Emigrants proceeding to Europe'—এই আখ্যায় অভিহিত করেন।"

ঘটনাটি এখানে উল্লিখিত হোল এই কারণে যে, এঁদের আগে যে তিনজন বাঙালি সন্তান ব্যারিস্টারি ও সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দেবার জন্য বিলেত গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রকৃত প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন একমাত্র মাইকেল। বাঙালির ছেলেগুলি যাতে এই সুকঠিন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে, এইটাই ছিল মাইকেলের মনের কথা। এঁদের মধ্যে সকলেই কবির সেই আশা চরিতার্থ করতে পেরেছিলেন। এবং বিশেষ করে পেরেছিলেন রমেশচন্দ্র। আটচল্লিশ জন উত্তীর্ণ ও নির্বাচিত প্রার্থীর মধ্যে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। বাঙালির ছেলের পক্ষে বিলেত যাওয়া তখনো পর্যন্ত 'নিষিদ্ধ যাত্রার' সামিল ছিল। যদিও প্রথমে রামমোহন গণ্ডী ভেঙে দিয়েছিলেন এবং তাঁর অনুবর্তি হয়ে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর সেই পথ কিছুটা সুগম করেন, তবুও বিলেত যাবার নাম শুনলেই রক্ষণশীলদের মনে একটা আতঙ্কের ভাব উপস্থিত হোত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, সেদিন ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরের মনোভাব ছিল স্বতন্ত্র; তিনি এই জিনিসটা খুব সহজ ভাবে শুধু নিয়েছিলেন নয়, তাঁর দূরদৃষ্টি বলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সম্পর্ক নিবিড় করে তোলার জন্য বাঙালির ছেলেকে বিলেত যেতেই

হবে এবং দেশের শাসনকার্যে দায়িত্বপূর্ণ অংশ নিতে হোলে সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় বাঙালির ছেলের পক্ষে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাই না তিনি বন্ধুপুত্র সুরেন্দ্রনাথের বিলাত যাত্রার ব্যাপারে তখন উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন, যেমন তিনি একদা উৎসাহ দেখিয়েছিলেন মাইকেলের ব্যারিস্টারি পড়তে যাবার সময়।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন : "সমুদ্রযাত্রায় আমাদের কোনো কষ্ট বা অসুবিধা ভোগ করতে হয় নি। সামুদ্রিক পীড়ায় (Sea sickness) আমরা কেউ-ই আক্রান্ত হইনি। কলকাতা থেকে ইংলণ্ড আসতে পথে যে সব বন্দরে জাহাজ থেমেছিল, আমরা সেই-সেই বন্দরে নেমে অনেক কিছুই দেখেছিলাম। প্রায় পাঁচ সপ্তাহ জাহাজে কাটাবার পর আমরা সাউদামটনে এসে পৌছলাম। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnrjee) সাউদামটনে এসে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন; মনোমোহন ঘোষ (এই মনোমোহন ঘোষ শ্রীঅরবিন্দের পিতৃবন্ধু; বিখ্যাত ব্যারিস্টার।) আগে থেকেই তাঁকে চিঠি লিখে আমাদের তিনজনের আসবার কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনিই আমাদের লণ্ডনে নিয়ে গিয়ে তোলেন এবং লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি কলেজের সন্নিকটে বার্নার্ড ষ্ট্রীটের একটি বোর্ডিং হাউসে আমাদের থাকার ব্যবস্থাও তিনি করেন। সেখানে কিছুকাল বাস করার পর আমরা স্ব স্ব বাসস্থানে চলে যাই এবং আমাদের সামনে যে কাজ তাতেই আমরা অতঃপর আন্তরিকতার সঙ্গে মন দিলাম।"

তিন বন্ধু যখন বিলাত যাত্রা করেন, তখন এঁদের মধ্যে বিবাহিত ছিলেন একমাত্র রমেশচন্দ্র; শুধু বিবাহিত নয়, তিনি তখন দুইটি কন্যার পিতা। তাঁর বয়স তখন কুড়ি বছর। তখন সিবিল সার্বিস পরীক্ষার বয়সের নিয়ম এই ছিল যে, প্রার্থীর বয়স উনিশ বছরের বেশি আর একুশ বছরের কম হওয়া দরকার। এদিক দিয়ে রমেশচন্দ্রের কোন অসুবিধা ছিল না; অসুবিধায় পড়েছিলেন বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথ। এ-বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে সুন্দর বর্ণনা আছে, কৌতূহলী পাঠক তা পড়ে দেখতে পারেন। বয়স বিভ্রাটের

জন্য ১৮৬৯ সালে জুন মাসে প্রথম যে প্রতিযোগিতা পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাতে সুরেন্দ্রনাথ পাশ করলেও, পরবর্তি পরীক্ষার জন্য তিনি আর অনুমতি পাননি, তালিকা থেকে তাঁর নাম কাটা গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বয়স তাঁর ঠিকই ছিল এবং তিনি পনর বছর বয়সেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি জানিয়েছিলেন যে তখন তাঁর বয়স যোল। এই গণনাটি তিনি করেছিলেন ভারতীয় মতে। যাই হোক, এই ব্যাপারটি নিয়ে এদেশে এবং ওদেশে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। কলকাতা থেকে বিদ্যাসাগর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির স্বাক্ষরিত affidavit গেল বিলেতে; তাতে তাঁরা সকলেই বললেন যে, প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় সুরেন্দ্রনাথের বয়স পনরই ছিল। তখন কেশবচন্দ্র সেন ও স্যার তারকনাথ পালিত ওদেশে ছিলেন। এই বিষয়ে তাঁরাও যুবক সুরেন্দ্রনাথকে অনেক সহায়তা করেন। ঘটনাটি শেষ পর্যন্ত আদালত পর্যন্ত গিয়েছিল এবং অবশেষে সুরেন্দ্রনাথ শেষ পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করবার জন্য অনুমতি লাভ করেন।

লণ্ডনে পৌঁছেই রমেশচন্দ্র সিবিল সার্বিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। মনোমোহন ঘোষের অকৃতকার্যতার দৃষ্টান্ত তাঁর সম্মুখে ছিল; তাই যাবার আগে তিনি যথেষ্ট প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন এবং ফরাসী ও সংস্কৃত ভিন্ন অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ও খুব যত্নের সঙ্গে শিক্ষা করেছিলেন। উনিশ শতকের বাঙালি সন্তানদের জীবনে কোন ফাঁক বা ফাঁকি থাকত না; এঁদের জীবনের ভূমি ছিল সুদৃঢ় আর ছিল অটল আত্মপ্রত্যয়। এই জিনিস আজ বিরল। বর্তমান বাঙালি সন্তানের অধোগতির কারণটাই তো এইখানে। রমেশচন্দ্র ওদেশে গিয়ে অধ্যয়নে কী গভীর মনোনিবেশ করে প্রথম প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় তিনশো পঁচিশজন প্রার্থীর মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন তার পরিচয় তিনি স্বয়ং এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন:

"এক বৎসর ধরে কঠিন পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে পড়াশুনা করে ১৮৬৯ সালের সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় উপস্থিত হলাম। বলা বাহুল্য যে, এই

এক বৎসরকাল যেরূপ অবিরাম কঠিন পরিশ্রম করেছি, পূর্বে আর কখনো সেরূপ করিনি। আমরা লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে নিয়মিতরূপে উপস্থিত হয়ে অধ্যয়ন করতাম, এবং তা ছাড়া অন্য সময়েও ঐ কলেজেরই কোন কোন অধ্যাপকের কাছে গিয়ে উপদেশ গ্রহণ করতাম। তাঁরা সকলেই আমাদের প্রতি খুবই অনুগ্রহ প্রকাশ করতেন। ···আমরা কলেজের অধ্যাপনা গৃহে অথবা লাইব্রেরিতে প্রায় সারাদিন অতিবাহিত করে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরতাম, এবং নৈশ ভোজনান্তে একবার বেড়াতে বেরুতাম; ফিরে এসে একটু চা পান করে পড়তে যেতাম, এবং যতক্ষণ সাধ্য পাঠাভ্যাসে নিরত থাকতাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি স্নান ও প্রাতরাশ শেষ করে আবার কলেজে যেতাম।

"এই ভাবে এক বছর কেটে গেল। পরীক্ষা এসে উপস্থিত। পরীক্ষার্থী ইংরেজ ছাত্রের সংখ্যা তিন শতেরও অধিক। এর মধ্যে মাত্র প্রথম পঞ্চাশটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে গণ্য হবে। এ অবস্থায় আমাদের ভাগ্যে যে কি ঘটবে, তা তখন অনুমান করা অসাধ্য। পরীক্ষার্থীদের অনেকেই লণ্ডন, অক্সফোর্ড অথবা কেম্‌ব্রিজ কলেজে রীতিমত শিক্ষালাভ করেছেন, আবার অনেকে রেন (Prof. Wren) সাহেবের নিকট মাত্র এই পরীক্ষা দেবার জন্যই বিশেষরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন। অধ্যাপক রেনের কাছে ট্রেনিং নিয়ে প্রতি বছর অনেক ছাত্র এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেন।

"শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন কঠিন পরীক্ষা পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। প্রায় একমাসের অধিককাল ধরে এই পরীক্ষা চললো। পরীক্ষার বিষয় বহু প্রকার; কিন্তু রক্ষা এই যে, সব প্রার্থীকেই যে সব বিষয়ের পরীক্ষা দিতে হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকেই তার মনোমত কয়েকটি বিষয়ে মাত্র পরীক্ষা দিতে হয়। প্রত্যেক পরীক্ষিত ছাত্রের সর্ব বিষয়ের পরীক্ষার ফলের সমষ্টি করে, ঐ সমষ্টি ফলের ন্যূনাধিক্য অনুসারে তার শ্রেষ্ঠত্ব-নিকৃষ্টত্বের বিচার হয়। পরীক্ষার জন্য আমি পাঁচটি বিষয় নির্বাচন করেছিলাম, যথা—(১) ইংরেজি সাহিত্য, ইতিহাস ও রচনা; (২) গণিত; (৩) মনোবিজ্ঞান; (৪) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, এবং (৫) সংস্কৃত। প্রত্যেক বিষয়েই দু'রকমের প্রশ্ন দেওয়া হয়···কতক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় মুখেমুখে আর

কতক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় লিখিত ভাবে। এই উভয় পরীক্ষাই আমি ভালই দিয়েছিলাম। যখন পরীক্ষার ফল জানা গেল, তখন দেখলাম যে, ইংরেজি পরীক্ষায় ৩২৫ জন ছাত্রের মধ্যে আমি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি, এবং ৫০০ নম্বরের মধ্যে ৪২০ নম্বর পেয়েছি। সংস্কৃতে আমি ৫০০-র মধ্যে ৪৩০ নম্বর পেয়েছিলাম। কিন্তু গণিতে আমি খুব বেশি নম্বর রাখতে পারিনি। মনোবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে আমি যথেষ্ট নম্বর পেয়েছিলাম।"

রমেশচন্দ্র যে একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেযুগে রামগোপাল ঘোষ ও মাইকেলের পর তাঁর তুল্য ইংরেজি ভাষায় দখল আর কোনো বাঙালির ছিল না। সংস্কৃততেও তিনি কম পারদর্শী ছিলেন না। 'ঋগ্বেদ সংহিতা' তার অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করে। লণ্ডনে যেসব অধ্যাপকদের কাছে রমেশচন্দ্র পাঠ গ্রহণ করেছিলেন, সকৃতজ্ঞচিত্তে তিনি তাঁদের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর সহপাঠী সুরেন্দ্রনাথও তাঁদের প্রতি অনুরূপ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। স্যর হেনরি মর্লি, কাউয়েল সাহেব (ইনি বিদ্যাসাগরের পর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন) ও গোল্ডস্টুকার প্রমুখ অধ্যাপকগণের কথা, তাঁদের উদার ও মধুর ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন :—"We were treated by them all with the utmost kindness and affectionate solicitude' ; আর রমেশচন্দ্র লিখেছেন : "I have never known a kinder a more genuine and true-hearted Englishman than Mr. Henry Morley, Professsor of English literature...No less are we indebted to Dr Theodore Goldstuker, a profound German scholar, whose Sanskrit class we attended in the University College " এই উক্তি দুটো থেকে এই অনুমান করা যেতে পারে যে, লণ্ডনে সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থী এই বাঙালি ছাত্র তিনজনের প্রতি ইংরেজ ও জর্মান অধ্যাপকগণ শুধু অনুগ্রহই প্রকাশ করেন নি, বরং গৌরবসূচক ব্যবহারের পরিবর্তে তাঁরা যেন যথার্থ হিতৈষী বন্ধুর মতোন অকৃত্রিম স্নেহসূচক আচরণ করতেন। ইংরেজ বা য়ুরোপীয় শিক্ষকদের সঙ্গে ভারতীয় ছাত্রদের এই যে মধুর সম্পর্ক, বলা বাহুল্য, মাইকেলই এর পথ কিছুটা সুগম করে দিয়েছিলেন।

টেনিসন, হুগো, মর্লি ও গোল্ডস্টুকারের সঙ্গে মাইকেল য়ুরোপে ব্যারিস্টারি পড়বার সময়ে পরিচিত হয়েছিলেন। এঁরা সকলেই মধুসূদনের পাণ্ডিত্য ও সহৃদয়তায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। সংস্কৃত ভাষাবিদ্ গোল্ডস্টুকার তো মাইকেলের বিদ্যাবত্তায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের বাংলা ভাষার অবৈতনিক অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংযোগের পথ সেদিন বাঙালি কবি মধুসূদন সুগম করে গিয়েছিলেন বলেই না পরবর্তিকালে রমেশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ ও বিহারীলাল লণ্ডনে তাদের ছাত্রজীবনে এমন বিপুল সমাদর লাভ করেছিলেন। দেখা যাচ্ছে যে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালির সঙ্গে ইংরেজের সম্পর্ক একটা দৃঢ়ভূমির উপর দাঁড়িয়েছে।

সিবিল সার্বিস পরীক্ষার শেষ পরীক্ষা গৃহীত হোল ১৮৭১ সালের মাঝামাঝি। আটচল্লিশজন উত্তীর্ণ প্রার্থীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন রমেশচন্দ্র। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন ভিনসেণ্ট স্মিথ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পরবর্তি কালে রমেশচন্দ্র ও ভিনসেণ্ট স্মিথ দুজনেই ভারত-ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে পথিকৃতের গৌরব অর্জন করেছিলেন। এর পর বিহারীলাল ও রমেশচন্দ্র ব্যারিস্টারি পরীক্ষা দিয়েও কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন। তিনি মিডল্ টেম্পলের-এর বার-এ্যাট-ল ছিলেন। মাইকেল ও মনোমোহন ঘোষের পর এঁরাই ব্যারিস্টারি পাশ করেন। রমেশচন্দ্র পুরো তিন বছর ন মাস য়ুরোপে ছিলেন। এই দীর্ঘকাল তিনি শুধু অধ্যয়ন নিয়েই থাকেন নি। এইসময়ের মধ্যে তিনি গ্রেট বৃটেনের নানাস্থান ভ্রমণ করেন এবং ইংলণ্ডের সহিত নিবিড়ভাবে পরিচিত হন। তাঁর ভ্রমণপ্রিয়তা ও পর্যবেক্ষণ শক্তি কৈশোর কাল থেকেই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। য়ুরোপীয় সাহিত্য এবং রাজনীতির সঙ্গে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট যেসব স্থান, এবং বরণীয় মনীষিদের জন্মস্থান হিসাবে যেসব অঞ্চল খ্যাত, রমেশচন্দ্র গভীর আগ্রহের সঙ্গেই পাঠের অবকাশে সেসব স্থান পরিভ্রমণ করে তাঁর জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করেছিলেন। তাঁর ভাবপ্রবণ চিত্ত য়ুরোপের, বিশেষ করে ইংলণ্ডের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচয় গ্রহণে সর্বদা উন্মুখ থাকত। বৃস্টলে রামমোহনের সমাধি স্থানটিও তিনি বাদ দেন নি। কনটিনেণ্টের কয়েকটি স্থানও তিনি ঘুরেছিলেন। ছাত্র

হিসাবে রমেশচন্দ্রের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। রমেশচন্দ্র যে বছর প্রথম ইংলণ্ডে পৌছলেন, সে বছর উদারনৈতিক দলের হাতে ক্ষমতা এলো এবং গ্লাডষ্টোন প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হন। ছাত্র রমেশচন্দ্র হাউস অব কমনস-এ গিয়ে গ্লাডষ্টোন ও ডিজরেলির বক্তৃতা পর্যন্ত শুনেছেন। শুধু কি তাই? জন স্টুয়ার্ট মিল অথবা চার্লস ডিকেন্স যখন যেখানে ভাষণ দিতেন সেসব সভাতেও তিনি উপস্থিত থাকতেন। ভারতের প্রবীণ জননায়ক দাদাভাই নৌরজি তখন লণ্ডনে। রমেশচন্দ্র তাঁর সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাঁরই অনুরোধে তিনি ভারত সভার কোন কোন অধিবেশনেও যোগদান করতেন। তরুণ বয়সের এই যে সর্বতোমুখী আগ্রহ, রমেশ-চরিত্রের এও একটা লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য।

১৮৭১, অক্টোবর। সাফল্যের গৌরবমুকুট মাথায় নিয়ে স্বদেশে ফিরলেন রমেশচন্দ্র, বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথ। এঁরা যখন সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দেবার জন্য বিলাত রওনা হন, তখন কলকাতার একটি সংবাদপত্রে এই মন্তব্য করা হয়েছিল: "আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা যে, ইঁহারা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন।" আজ সত্যই যখন সেই তিনটি তরুণ বাঙলা দেশের মুখ উজ্জ্বল করে দেশে ফিরলেন, তখন স্বভাবতই সেটা একটা স্মরণীয় ঘটনা হিসাবে স্বীকৃত হোল। শুধু তাই নয়, তাঁরা বিশেষভাবে সম্বর্ধিতও হোলেন। এই সম্বর্ধনা সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রমুখ তৎকালীন সমাজনেতৃবর্গ। ভারতীয় ছাত্ররা ইংলণ্ডে গিয়ে সহৃদয় ব্যবহার পায় না, এই রকম একটা ভ্রান্ত ধারণা এদেশে তখনো পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। রমেশচন্দ্র, বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ ফিরে এসে যখন মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে: "We were welcomed wherever we went and everywhere there was a disposition to treat us with kindness due to strangers"— তখন থেকেই শুধু সেই ভ্রান্ত ধারণার অবসান হোল না, সেইসঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্পর্কটা আরো নিবিড় হোয়ে উঠলো এবং ইংরেজের জীবনধারা, ইংরেজের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে ভারতবাসীর চক্ষে

আরো শ্রদ্ধেয় করে তুললো। রমেশচন্দ্র ও তাঁর বন্ধু দুজনে বোম্বাই থেকে সোজা কলকাতায় রওনা হন। তখন বাংলা দেশের জাতীয় উৎসব দুর্গাপূজা আসন্ন; সেই আনন্দ উৎসবের মধ্যেই তাঁরা স্বদেশে ফিরতে চেয়েছিলেন। পথিমধ্যে এলাহাবাদে নীলকমল মিত্র ইংলণ্ড থেকে সদ্য প্রত্যাগত এই তিনজন তরুণ সিবিলিয়ানকে অভ্যর্থনা জানালেন। হাওড়া স্টেশনে তাঁদের স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং কেশবচন্দ্র। কৃষ্ণদাস পাল 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় তাঁদের উদ্দেশ করে লিখলেন, "We receive back you into the bosom of our homes and Hindu socicty," এবং তাঁরা তিনজনেই স্ব স্ব গৃহে স্থান লাভ করলেন; বিলেত যাওয়ার জন্য তাঁদের কেউ-ই জাতিচ্যুত হলেন না। রামমোহনের বহু-নিন্দিত সেই দুঃসাহসিক প্রয়াস আজ হিন্দু-সমাজপতিদের দ্বারা প্রকাশ্যে সমর্থিত ও সম্বর্ধিত হোল। এইটাই ছিল সেদিন সবচেয়ে বড়ো কথা। কলকাতার উপকণ্ঠে মল্লিক-পরিবারের সাতপুকুর বাগানে নবাগত সিবিলিয়ানদের সম্বর্ধনা করার জন্য একটি বিরাট সভার অনুষ্ঠান হোল। সেই সম্বর্ধনা সভার উল্লেখ করে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন: "Satyendra Nath Tagore was the first civilian. We were the second batch...and the success of three of us in one and the same year had created a profound impression upon Indian public opinion. The whole of Indian Calcutta was present at the function, and we were the cynosure of all eyes." আর উত্তরপাড়া হিতকরী সভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত অনুরূপ একটি সম্বর্ধনা সভায় প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে নিজের ও বন্ধুদের পক্ষে রমেশচন্দ্র একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন: "আমরা এখনো স্বদেশসেবার কোন প্রমাণ দিতে পারিনি বটে, তবে আমরা নিজ নিজ কার্যদ্বারা স্বদেশের কিছুটা উন্নতি করতে পারব বলে আশা পোষণ করি। আমি আপনাদের এই কথা বলি না যে, আপনারা ইংরেজের সব কিছু অন্ধভাবে অনুকরণ করুন, কিন্তু আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতি-সাধনে আমরা ইংরেজের কাছ থেকে তাদের রীতিনীতির অনেক কিছুই গ্রহণ করতে পারি। নর-নারীর মধ্যে স্বাধীনতা ও সাম্যের পাঠ ইংরেজদের কাছ

থেকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং এর জন্যই ইংলণ্ডে তরুণদের পাঠাবার ব্যবস্থা করা উচিত।”

উনিশ শতকের সপ্তম দশকের প্রথমভাগে রমেশচন্দ্রের মুখে উচ্চারিত এই কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ভাষণে যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন—‘স্বদেশের উন্নতি করব’—রমেশচন্দ্রের পরবর্তি জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে দেখা যাবে যে, তিনি তাঁর এই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে শুধু সচেতনই ছিলেন না, প্রতিশ্রুতি পালনেও ছিলেন বিশেষ তৎপর। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন রাজপুরুষ, সরকারী কর্মচারী—কমিশনার পর্যন্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সরকারী নথিপত্রের মধ্যেই রমেশ-প্রতিভা নিঃশেষিত হয়নি। এইটাই বাঙালির সৌভাগ্য। তাঁর জাগ্রতচিত্তের সকল চিন্তা-ভাবনা সেদিন বাংলার সাহিত্য ও সমাজ; অর্থনীতি এবং পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাসের আলোচনায় কি ভাবে সার্থক হয়েছিল, অতঃপর আমরা রমেশচন্দ্রের সেই বহুমুখী প্রতিভার আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

॥ চার ॥

দেশে পৌঁছেই রমেশচন্দ্র সিবিল সার্বিসের কাজ আরম্ভ করলেন। তাঁর প্রথম কর্মস্থল আলিপুর। তিনি চব্বিশ পরগণার সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হলেন। এই নিয়োগের তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৭১, এবং এইসময় থেকেই তাঁর কর্মজীবনের আরম্ভ। রমেশচন্দ্র মোট পঁচিশ বছর সরকারী কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। চাকরিজীবনের প্রথম নয় বছর তিনি সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তারপর তিনি অস্থায়ীভাবে জিলা-শাসকের পদে নিযুক্ত হন। পরবর্তি বারো বছর দেখা যায় যে, তিনি কখনো অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে অথবা জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হিসাবে কাজ করেছেন এবং ২য় ও ৩য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবেই কাজ করেছেন। ১৮৯৩ সালে তিনি সর্বপ্রথম প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ১৮৯৪ সালে তিনি অস্থায়ীভাবে বর্ধমান বিভাগের কমিশনার নিযুক্ত হন। সর্বশেষে উড়িষ্যার কমিশনার ও করদমহলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিসাবে তিনি সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

সিবিল সার্বিসে প্রবেশ করবার পর প্রথম এগার বছর রমেশচন্দ্রকে শিক্ষা-নবিসী করতে হয়েছিল অর্থাৎ এই এগার বছর ছিল তাঁর সমগ্র চাকরিজীবনের এপ্রেন্টীসসিপ (Apprenticeship)-এর সময়। আলিপুরে এক বছর কাটাবার পর তিনি সাবডিভিসনের চার্জ পেয়ে এলেন জঙ্গীপুরে (মুর্শিদাবাদ)। এখানে তিনি মাত্র এক বছর তিন মাসকাল ছিলেন এবং তারপর নদীয়া জেলার বনগ্রাম সাবডিভিসনের চার্জ প্রাপ্ত হন। নদীয়া জেলায় তিনি সবশুদ্ধ তিন বছর কাটিয়েছেন। বনগ্রামের পর তিনি এই জেলায় মেহেরপুর সাবডিভিসনের চার্জ পেয়েছিলেন। এইভাবে তিনি পঁচিশ বছরকালের মধ্যে বাংলাদেশের মুর্শিদাবাদ, ত্রিপুরা, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বাখরগঞ্জ, পাবনা, মৈমনসিংহ, দিনাজপুর, মেদিনীপুর ও হুগলী, এই দশটি জিলা পরিভ্রমণ করেছিলেন; বাংলার বাইরে তিনি প্রথমে বালেশ্বর এবং পরে কটকে গিয়েছিলেন। চাকরিজীবনের প্রথম থেকেই দেখা যায় যে, তিনি জনসাধারণের কল্যাণচিন্তায় নিজেকে নিয়োজিত

রেখেছেন। বনগ্রামেই এর হাতে-খড়ি। জনসাধারণের মধ্যে প্রধানত শিক্ষাবিস্তারেই রমেশচন্দ্রের আগ্রহ ও অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছিল। বনগ্রামে সেই সময়ে যে দু'তিনটি স্কুল ও পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়, তা তাঁরই উদ্যোগে হয়েছিল; এখানে একটি বিদ্যালয়ের নূতন ভবন নির্মাণের জন্য তিনি ব্যক্তিগত-ভাবে আড়াইশত টাকা প্রদান করেছিলেন।

মেহেরপুর সাবডিভিসনের চার্জ নিয়ে রমেশচন্দ্র যখন এলেন, তখন সেখানে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়েছে। তাই প্রশাসনিক কাজ অপেক্ষা রিলিফের কাজেই তিনি বেশি মন দিয়েছিলেন। সেইসময়ে এখানে অবস্থিত যেসব সরকারী কর্মচারী রিলিফের কাজে প্রশংসনীয় উদ্যম দেখিয়েছিলেন তাঁদের তালিকায় তরুণ সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্তের নামটি বিশেষভাবেই উল্লিখিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সেই বয়স থেকেই ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ-সমস্যাটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং তিনি গভীরভাবে এর অনুশীলন করতে থাকেন। পরিণত বয়সে এই সমস্যার সমাধানে তিনি যেরূপ চিন্তা-ভাবনা করেন এবং অশেষ যত্নসহকারে যেসব মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ করেন তার প্রকাশ আছে ১৮৯৭ সালে *Fortnightly Review* পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভারতে দুর্ভিক্ষ' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে। এ-বিষয়ে যথাস্থানে আমরা আলোচনা করব। ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে আলোচনায় তিনিই পথিকৃৎ। নদীয়া জেলায় নীলকর সাহেবদের বিষনজরে তিনি পড়েছিলেন; এদের সঙ্গে হাকিমের মতের ঘোরতর পার্থক্য যখন দেখা দিল, তখন 'প্রবল প্রতাপান্বিত' নীলকর সাহেবরা রমেশচন্দ্রকে নদীয়া জেলা থেকে সরিয়ে নেবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেছিল। তখন এই জেলায় 'বিষধর' নীলকরের প্রবল প্রতাপ এবং অবস্থা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল যে, এই মতবিরোধের ফলে রমেশচন্দ্রের চাকরির ভবিষ্যৎ নিয়ে টানাটানি চলেছিল। এই সময়ে করিমপুর থেকে তিনি তাঁর অগ্রজকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন:

"ভাগ্যের প্রসন্নতা ও বিরূপতা দুই-ই সমানভাবেই গ্রহণ করা ভিন্ন আর উপায় কি? আমার চাকরির ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ বলে মনে হচ্ছে না। আমি যখন কৃষ্ণনগরে ছিলাম তখন মিঃ ষ্টিভেনস্ (ইনি তখন নদীয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন) আমাকে জানিয়েছিলেন যে, এক বছরের মধ্যেই

অফিসিয়েটিং জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট হবার সুযোগ আমি পাব। কিন্তু নীলকর সাহেবদের আবেদনের ফলে ম্যাজিস্ট্রেট ও কমিশনারের মন আমার উপর বিরূপ হওয়াই স্বাভাবিক এবং এর ফলে হয়তো বেশ কয়েক বছর লাগবে আমাকে জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে সুপারিশ করবার জন্য। কিন্তু আমার সান্ত্বনা এই যে, : I feel a pride at being thus a martyr to my duty."

রমেশচন্দ্রের পত্রের মধ্যে শেষোক্ত কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। যে যুগে একজন সিবিলিয়ান হওয়া জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষিত বিষয় বলে মনে হোত, সেই যুগে দেখা যাচ্ছে যে রমেশচন্দ্র কর্তব্যকে চাকরির অগ্রে স্থান দিয়েছেন। রমেশচন্দ্র ঐশ্বর্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নি, বহু আয়াস স্বীকার করে তিনি সিবিলিয়ানের চাকরি পেয়েছেন। তথাপি কর্তব্যের খাতিরে তিনি চাকরিসর্বস্ব মানুষ হয়ে উঠতে পারেন নি এবং চাকরিজীবনের আরম্ভকালেই তিনি কর্তব্যকে মুখ্য বলে মনে করেছেন। তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুধাবনযোগ্য। "কর্তব্য পালনের জন্যই জীবনধারণ"—এই যে মনোভাব, ইহাই রমেশচন্দ্রের জীবনে গতি দিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে এবং পরিণত বয়সে তাঁকে করে তুলেছে একজন দেশহিতৈষী। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে একজন ভারতীয় সিবিলিয়ান যে কর্তব্যকে এতখানি প্রাধান্য দিতে পারেন, বোধহয় ইংরেজ রাজপুরুষদের পক্ষে সেটা ধারণার অতীত ছিল। এই ভাবে "martyr to duty" হতে গিয়ে, সরকারী চাকরিতে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও, রমেশচন্দ্র আশানুযায়ী প্রোমোশন বা পদোন্নতি লাভ করতে পারেন নি। চাকরি-জীবনের শেষভাগে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের পদ লাভ করেন আর বিভাগীয় কমিশনারের পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন মাত্র তিন বছর। সরকার নানা কারণে রমেশচন্দ্রের উপর বিরূপ হয়েছিলেন। ১৮৯২-৯৩ সালে যখন তিনি এক বছর ও কয়েক মাসের ছুটি নিয়ে বিলেতে অবস্থান করছিলেন তখন তিনি সেখানে জাতীয় কংগ্রেসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব প্রকাশ্যে সমর্থন করেন। প্রস্তাবটি ছিল বিচার ও শাসন বিভাগের পৃথকীকরণ। এই প্রস্তাব সমর্থন করলে সরকার যে তাঁর ওপর রুষ্ট হবেন এবং তাঁর উন্নতির পথে বিঘ্ন ঘটতে পারে, এ কথা রমেশচন্দ্র ভালোভাবেই জানতেন। সরকারী কাজে যোগ্যতা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও তাঁর চেয়ে জুনিয়র ইংরেজ সিবিলিয়ানদের দ্রুত

পদোন্নতি হয়েছিল। এজন্য রমেশচন্দ্রের মনে কোনো ক্ষোভ ছিল না। সরকারী কর্মজীবনের প্রারম্ভে যে কর্তব্যকে তিনি মুখ্য স্থান দিয়েছিলেন, সেই কর্তব্যের লক্ষ্য ছিল স্বদেশের উন্নতিসাধন। সুতরাং স্বদেশহিতৈষণাকে বিসর্জন দিয়ে রমেশচন্দ্রের পক্ষে চাকুরি-সর্বস্ব মানুষ হয়ে ওঠা আদৌ সম্ভবপর হয়নি।

১৮৭৬ সাল, নভেম্বর মাস। নদীয়া জেলা থেকে বদলি হয়ে রমেশচন্দ্র এলেন বরিশালের দক্ষিণ শাহবাজপুরে। এখানে তখন দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর তাণ্ডব চলছিল। রমেশচন্দ্র এই সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন তার থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হোল :

"১৮৭৪ সালের চেয়ে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ বাংলা দেশে দেখা দিয়েছিল ১৮৭৬ সালে। ঐ বছরের ৩১শে অক্টোবর তারিখের রাত্রিতে যে ঘূর্ণিবাত্যা ও জলোচ্ছ্বাস হয় তার ফলে এক লক্ষ লোকের জীবননাশ ঘটে। দক্ষিণ শাহবাজপুরের অবস্থাই সবচেয়ে শোচনীয় হয়েছিল। গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত এই সাবডিভিসনটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সেই রাত্রেই এখানকার চল্লিশ হাজার অধিবাসী জলে ডুবে মারা যায়। এই সাবডিভিসনের ভারপ্রাপ্ত যে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তিনি এবং তাঁর স্ত্রী দৈবক্রমে গাছের উপর আরোহণ করে তাঁদের জীবনরক্ষা করেছিলেন, কিন্তু বেচারার পরিবারের আর সকলেই মারা যায়। তিনি অবিলম্বে ছুটি নিয়ে দেশে চলে যান এবং তাঁর যায়গায় কৃষ্ণনগর থেকে আমাকে এই সাবডিভিসনে বদলি করা হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় আর জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট—এই দুইটি সমস্যার সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছিল। তখন কলকাতা থেকে খুলনা পর্যন্ত রেলপথ খোলা হয়নি। সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে নৌকাযোগে বরিশাল পৌঁছতে আমার ছয় দিন লেগেছিল।··· নভেম্বরের শেষাশেষি আমি দক্ষিণ শাহবাজপুরে পৌঁছলাম। সেখানে উপস্থিত হয়ে যে দৃশ্য আমার নয়নগোচর হোল তা এক কথায় অবর্ণনীয়। কোনো বিধ্বস্ত রণক্ষেত্রেও এমন শোচনীয় অবস্থা চাক্ষুষ করা যায় কি না সন্দেহ। অধিবাসীদিগের কুটিরগুলি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে ভেসে গিয়েছে; তাদের অনেকেই গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি সমগ্র পরিবার অন্তর্হিত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এমন

পরিবার বিরল। এই বিপদের ভয়াবহতা এমনই ছিল যে যারা রক্ষা পেয়েছিল তাদের দুঃখ বোধ করবার ক্ষমতা পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। গোটা সাব-ডিভিসনটাই যেন এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল। সর্বত্র যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলাম তা জীবনে বিস্মৃত হবার নয়। গবাদিপশু সমস্তই জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছে।··· প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল মহামারীর করাল মূর্তি। মানুষ ও গবাদিপশুর মৃতদেহগুলি পচে এখানকার আকাশ বাতাস ও পানীয় জল সব কিছু বিষাক্ত ও দুঃসহ করে তুলেছিল। প্রথম থেকে গ্রামান্তরে এই মহামারী ছড়িয়ে পড়ল ও কলেরায় আক্রান্ত হয়ে আরো কয়েক হাজার নর-নারী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই অবস্থায় দুর্দশাগ্রস্ত নর-নারীদের যতটা রিলিফ দেওয়া সম্ভব সরকারীভাবে তা করা হয়েছিল।"*

রমেশচন্দ্র দক্ষিণ শাহবাজপুরে কিঞ্চিদধিক দেড় বছরকাল ছিলেন। এই সময়ে মহামারী-বিধ্বস্ত এই অঞ্চলের অধিবাসীদের দুঃখদুর্দশা মোচনকল্পে সরকারীভাবে তিনি যথেষ্ট তৎপরতা দেখিয়েছিলেন। সমসাময়িক পত্রিকার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এ সময়ে তিনি দুর্গত জনসাধারণের দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য যুবজনোচিত আগ্রহ নিয়ে অবিরাম পরিশ্রম করেছিলেন। বরিশালবাসী নর-নারী তাই পরবর্তিকালে তাঁর এই আন্তরিক সেবাপরায়ণতার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করতেন। সেইসময়ে এই সাবডিভিসনের জনৈক অধিবাসী রমেশচন্দ্রের কাজের প্রশংসা করে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় যে পত্রখানি লিখেছিলেন তার থেকে জানা যায়, একমাত্র এই তরুণ সিবিলিয়ানের আন্তরিকতার ফলেই রিলিফের কাজ সর্বপ্রকারে সার্থক হোতে পেরেছিল। সেই পত্রখানি থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হোল :

"সৌভাগ্যক্রমে সিবিল সার্বিসের একজন দক্ষ অফিসারের ওপর এই সাবডিভিসনের ভার ছিল। তাঁর চেয়ে বিচক্ষণ ও যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ। জনসাধারণের প্রতি তাঁর উদার সহানুভূতি এবং তাঁর ওপর যে গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল সেই সম্পর্কে তাঁর আন্তরিকতা—এই দুই কারণে তিনি সংকটত্রাণের কাজে অত অল্পসময়ের মধ্যে এমন সফলতা লাভ করতে

* *Rambles in India* : R. C. Dutt.

সক্ষম হয়েছিলেন। এমন কর্তব্যপরায়ণ রাজকর্মচারী এই অঞ্চলে ইতিপূর্বে বড় বেশি আসেন নি। গত ডিসেম্বর মাস থেকে বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত ও তাঁর সহকারী বাবু সূর্যকুমার সেন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট—এঁরা দুজনে এই সাবডিভিসনের সংগঠনে যথাসাধ্য প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁরা গ্রামে গ্রামে ও গৃহস্থের বাড়িতে বাড়িতে গিয়েছেন; লোকের অবস্থার পরিচয় গ্রহণ করেছেন এবং চাষের খোঁজ নিয়েছেন। কলেরা আরম্ভ হবার সময় তাঁরা যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেছেন। মিঃ দত্ত স্বয়ং তিনটি সংকটত্রাণকেন্দ্র পরিদর্শন করে অধিবাসীদের প্রকৃত অবস্থার পরিচয় গ্রহণ করতে যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি করেন নি। শুধু তাই নয়। এইসব ব্যাপার তিনি যথাসম্ভব কম খরচের মধ্যেই করে একটি নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।"*

এই চিঠিখানিতে রমেশচন্দ্রের গুণপনার বর্ণনা করে বলা হয়েছিল: "Calm, considerate, and bold, Mr. Dutt is a quiet sort of a man, and has his work uppermost in his heart. But for him this subdivision would hardly have recovered." চাকরিতে প্রবিষ্ট হবার পাঁচ বছরের মধ্যেই তরুণ রমেশচন্দ্রের মধ্যে এই যে আমরা একজন স্থিতধী, কর্তব্যপরায়ণ, সদ্বিবেচক ও নির্ভীক প্রকৃতির মানুষকে দেখতে পাই, তৎকালীন সিবিল সার্বিস কর্মচারীর তালিকায় এমন মানুষ বড়ো বেশি ছিল না। সিবিল সার্বিসে ভারতীয়ের নিয়োগ তখনো পর্যন্ত খুব বেশি হয় নি। সরকারী শাসনের আভিজাত্যমণ্ডিত এই ইস্পাত কাঠামোর মধ্যে থেকে একজন রাজপুরুষ শাসনদণ্ড পরিচালনার কালে কতখানি সহৃদয়তা, সদ্বিবেচনা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়ে, একদিকে কর্তব্যপালন এবং অন্যদিকে জনসাধারণের হিতসাধন করতে পারেন, দক্ষিণ শাহবাজপুরে নবীন সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র সেই দৃষ্টান্তই স্থাপন করেছিলেন। বস্তুতঃ সমসাময়িক বিবরণ থেকে যতদূর জানা যায় তাতে মনে হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারীতে বিধ্বস্ত এই অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দের অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশা মোচনের জন্য একাগ্রচিত্ত হয়ে রমেশচন্দ্র যে প্রয়াস পেয়েছিলেন তা কেবলমাত্র একজন সহৃদয় ও কর্তব্যপরায়ণ রাজকর্মচারীর পক্ষেই সম্ভব ছিল। শাসক হিসাবে এই সময়ে তিনি

* *Hindoo Patriot*, 28th July, 1877.

সত্যিই তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর এই সহৃদয়তা এখানকার লোকের মনে স্থায়ীভাবে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। তাই ১৮৮৩ সালে তিনি যখন বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়েছিলেন তখন তিনি আর একবার এই অঞ্চল পরিদর্শনে এসেছিলেন এবং তখন তিনি এখানে বিপুলভাবেই সম্বর্ধিত হয়েছিলেন, দেখা যায়।

১৮৮০। সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হয়ে রমেশচন্দ্র বাঁকুড়া এলেন। তাঁর আশা ছিল, সরকার তাঁকে এইবার পরিপূর্ণ জেলাশাসকের পদেই নিযুক্ত করবেন। তখনকার জেলাশাসনের ইতিহাস পাঠ করলে জানতে পারা যায় যে, সেই সময় বাঁকুড়া জেলার প্রশাসনিক ব্যাপারে সরকার থেকে একটা পরীক্ষা করা হয়—জেলার প্রত্যেকটি উচ্চপদে ভারতীয়ের নিয়োগ করা হবে, কাউন্সিলে এইরকম একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রমেশচন্দ্র এই সম্পর্কে তাঁর অগ্রজকে বাঁকুড়া থেকে এক পত্রে লিখেছিলেন: "I for one will rejoice if Government makes this experiment"—এবং তিনি সেই সঙ্গে আরো লিখেছিলেন যে, এইরকম দায়িত্বজনক পদ যদি তাঁকে সত্যই দেওয়া হয় তা হোলে তিনি সর্বপ্রযত্নে এই গুরুদায়িত্ব পালন করবেন। তাঁর নিজের ক্ষমতার ওপর তাঁর বিশ্বাস ছিল। আর ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সেই তরুণ সিবিলিয়ানের মনে একটা সন্দেহ জেগেছিল—অবিচারপ্রসূত সন্দেহ—যে, তাঁর যোগ্যতার পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে না এবং শাদা ও কালো চামড়ার মধ্যে যে পার্থক্য করা হোত, সেই পার্থক্যটা তাঁকে বিশেষভাবেই পীড়া দিত। এই প্রসঙ্গে ইলবার্ট বিল প্রবর্তন উপলক্ষে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে উইলিয়াম হাণ্টার যে বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন সেই বক্তৃতা থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হোল:

"The native civilians have now reached a stage in their service when they must become, in the natural course, District Magistrates and Sessions Judges. We have guaranteed to them equal rights with their English brethren, yet they must be excluded from those offices in the more eligible districts."—হাণ্টার সাহেবের এই উক্তির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে হোলে আমাদের একটু প্রসঙ্গান্তরে যেতে হবে।

নব্যভারতের ইতিহাসে ১৮৮৩ সালটি বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং ইলবার্ট বিল আন্দোলন—এই দুটো ঘটনাই সমকালীন ভারতবর্ষে জাতীয়তার উদ্বোধনের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। তখন ভারত সরকারের আইনসচিব ছিলেন মিঃ ইলবার্ট। আগে নিয়ম ছিল, মফঃস্বল কোর্টের ভারতীয় কোনো ম্যাজিস্ট্রেট কোনো বিচারাধীন ইংরেজ বা শ্বেতাঙ্গের বিচার করতে পারবেন না। বৈষম্যমূলক এই প্রথাটি তুলে দেবার জন্য মিঃ ইলবার্ট কাউন্সিলে একটা বিল নিয়ে এলেন। এরই নাম ইলবার্ট বিল। এই বিলটিকে কেন্দ্র করে সমস্ত ইংরেজসমাজে হুলস্থুল পড়ে গিয়েছিল সেদিন। নেটিভের হাতে তাদের বিচার! অসম্ভব। শ্বেতাঙ্গ সমাজের বিরোধিতার ফলে শেষপর্যন্ত বিলটি আর পাশ হোল না। কিন্তু আমরা একটা মহৎ শিক্ষা লাভ করলাম। ইংরেজ বুঝিয়ে দিল সঙ্ঘবদ্ধতার শক্তি কত। ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় শ্বেতাঙ্গ সমাজের আন্দোলনই সৃষ্টি করেছিল একটি পাল্টা-আন্দোলন। সেই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন শিক্ষিত ভারতীয়গণ এবং তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ। এই পাল্টা-আন্দোলনের পরিণতিই ন্যাশনাল কনফারেন্স। পাল্টা-আন্দোলন সার্থক হয়নি বটে কিন্তু জনৈক ঐতিহাসিকের মতে, "It left a rankling sense of humiliation in the mind of the educated India,"* এবং পরবর্তিকালে এই চেতনা থেকেই সৃষ্টি হয় সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধ। এই জাতীয়তাবোধ জন্ম দিলো রাজনৈতিক চেতনার এবং ইতিহাসের এক শুভমুহূর্তে সেই চেতনা থেকেই জন্ম নিলো ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র তাঁর কর্মজীবনেই এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সিবিল সার্বিসে সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির তিনি একজন ভুক্তভোগী ছিলেন। এইবার পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক।

স্যর উইলিয়াম হাণ্টার সেইসময়ে ভাইসরয়ের কাউন্সিলে ইলবার্ট বিল আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, "বর্তমান ভারতীয় সিবিলিয়ানগণ এমন

* *A Nation in Making* : S. N. Banerjea.

কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন তাতে করে সম্পূর্ণ জেলার দায়িত্ব তাঁদের ওপর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। তাঁরা সমান ক্ষমতায় আসীন হবেন, এই প্রতিশ্রুতি তাঁদের আমরা দিয়েছি। অথচ জেলার দায়িত্ব থেকে তাঁদের বাইরে রাখা হচ্ছে—বিশেষ করে সেইসব জেলা যেখানে ব্যবসায়ী ইংরেজদের স্বার্থ রয়েছে"—হাণ্টার সাহেব এই কথা বলার পর তাঁর সেই স্মরণীয় বক্তৃতায় বাংলা ও বোম্বাই প্রদেশ থেকে দুটি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, ১৮৮২ সালের ১০ই জানুয়ারি তারিখে জনৈক দেশীয় সিবিলিয়ানকে একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাসহ ঢাকার জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিয়োগ করা হয়। এক সপ্তাহকাল যেতে না যেতে এই নিয়োগ খারিজ করে তাঁকে একটি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ জেলায় বদলী করা হয়।

হাণ্টারের বক্তৃতায় উল্লিখিত এই 'জনৈক সিবিলিয়ান' আমাদের রমেশচন্দ্র। তখন ঢাকা-মৈমনসিংহ রেলপথ স্থাপন উপলক্ষে ঢাকায় বহু ইংরেজের সমাগম হয়েছে; কাজেই একজন নেটিভকে জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট রাখা সরকারের অভিপ্রেত হোতে পারে না। সুতরাং রমেশচন্দ্রের নিয়োগ খারিজ হবারই কথা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দেশীয় সিবিলিয়ানকে জেলার সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদানের একটা পরীক্ষা সরকার থেকে করা হয়েছিল। ১৮৮০ সালে আনন্দরাম বড়ুয়াকে কয়েক মাসের জন্য দিনাজপুরের অফিসিয়েটিং ম্যাজিস্ট্রেটের পদে, বিহারীলাল গুপ্তকে ১৮৮১ সালে এক মাসের জন্য রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে এবং রমেশচন্দ্রকে ঐ বছরে তিন মাসের জন্য প্রথমে বাঁকুড়া এবং পরে ১৮৮২ সালে তিন মাসের জন্য বালেশ্বরের ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিয়োগ করা হয়। তারপর ১৮৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে পরিপূর্ণ ক্ষমতাসহ জেলাশাসকের পদে রমেশচন্দ্র ও আনন্দরামের নিয়োগ যখন সরকারীভাবে ঘোষিত হোল, তখনই শ্বেতাঙ্গ সমাজে এর বিরুদ্ধে দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সেই প্রতিক্রিয়ারই পরিণতি পূর্বোল্লিখিত ইলবার্ট বিল আন্দোলন। সেদিনের সেই তুমুল আলোড়নকে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নেভার-নেভার' কবিতায় চিরস্মরণীয় করে রেখে গেছেন।

ভারতে ইংরেজ-শাসনের আনুপূর্বিক ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের পরিচয়

আছে তাঁরা এই কথা অবগত আছেন যে, দেশীয় সিবিলিয়ানের হাতে এগজিকিউটিভ ক্ষমতা তুলে দিতে ভারত সরকারের তখন কী প্রবল সংকোচ বা অনিচ্ছাই না ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতের প্রথম সিবিলিয়ান, কিন্তু তাঁকে এগজিকিউটিভ পদে নিয়োগ করা হয়নি। ইলবার্টই প্রথম অনুভব করেন যে, পরিপূর্ণ ক্ষমতাসহ জেলাশাসকের পদে ভারতীয় সিবিলিয়ানদের নিয়োগ একান্ত বাঞ্ছনীয়। ভারতশাসন ব্যবস্থায় সেদিন এইরকম একটা পরিবর্তনের প্রস্তাব তুলে তিনি সত্যই একটা যুগান্তর এনেছিলেন। ভারতবাসীর রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ সাধনে পরোক্ষ-ভাবে তিনি যে কতখানি সহায়তা করেছিলেন তা আজ আমরা উপলব্ধি করতে পারি। রমেশচন্দ্রকে যখন বালেশ্বরের অস্থায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিয়োগ করা হয় তার প্রায় এক বছর বাদে ইংরেজদের মুখপত্র 'পাইওনিয়ার' পত্রিকা মন্তব্য করেছিল :

"This is the first occasion on which a native of India has held executive charge of a district; and inasmuch as the appointment of Mr. Romesh Chunder was dated the 18th of July last, so that plenty of time has elapsed to allow bad consequences being developed, if these were in any way bound to flow from the arrangement, it may he assumed that no embarrassments have ensued."

রমেশচন্দ্র তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে সেদিন এই কথাই প্রমাণিত করেছিলেন যে, সিবিল সার্বিসে এই জাতীয় সংস্কার ভিন্ন ভারতে ইংরেজ-শাসনের পথ কিছুতেই সুগম হতে পারে না। যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ না দিলে ভারতীয়রা সরকারী শাসনকার্যে তাঁদের যোগ্যতা প্রদর্শন করবেন কি করে?—এই প্রশ্নের উত্তর মিলল রমেশচন্দ্রের কৃতিত্বপূর্ণ কর্মজীবনে। বালেশ্বরের ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তিনি যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা দেখে ইংরেজদের অপর একটি মুখপত্র 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে সেদিন এই মন্তব্য করা হয়েছিল : "It is impossible to doubt that many native members will show at least equal fitness for high

executive employment with Mr. R. C. Dutt."—ভারতীয় সিবিলিয়ান যে শ্বেতাঙ্গ সিবিলিয়ানদের সমান যোগ্যতার অধিকারী, এইটা প্রমাণ করার মধ্যেই ছিল রমেশচন্দ্রের কর্মজীবনের প্রকৃত সার্থকতা।

বালেশ্বরে রমেশচন্দ্র অল্পকালই ছিলেন, কিন্তু সেই সময়ের মধ্যেই জেলাশাসক হিসাবে যে 'care and thoroughness'-এর পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন, তা উর্ধ্বতন সরকারী মহলে পর্যন্ত স্বীকৃত হয়েছিল। স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে সেদিন যে রিপোর্টটি তিনি রচনা করেছিলেন এবং যেটি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি সরকারী দপ্তরে একটি মূল্যবান দলিল হিসাবে পরিগৃহীত হয়। স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে ইংরেজশাসনাধীন ভারতবর্ষে সেই প্রথম সরকারী আলোচনা এবং এই বিষয়টির আলোচনায় সেই বয়সে রমেশচন্দ্র যে গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা সত্যই বিস্ময়কর। এদেশে শাসনসংস্কার বা স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে যখন কেউ চিন্তা করতে অগ্রসর হন নি, দেখা যায় যে, তখন একমাত্র রমেশচন্দ্রই এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেছেন। রমেশচন্দ্রের সমাজচিন্তা অনুশীলন করতে হলে এই রিপোর্টটি যত্নের সঙ্গে পাঠ করা দরকার। আমরা যথাস্থানে এই বিষয়ে আলোচনা করব।

রমেশচন্দ্রের কর্মজীবনের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় আরম্ভ হয় যখন তিনি বাখরগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। তাঁর জীবনীকার একে 'The most brilliant episode in the whole life of his administrative career' বলে উল্লেখ করেছেন। ইতিপূর্বে তিনি এবং তাঁর যে দুই-একজন সতীর্থকে জেলাশাসকের পদে নিয়োগ করা হয়েছিল তা ছিল নিতান্তই অস্থায়ী রকমের। ১৮৮৩ সালের প্রারম্ভে তিনি ঢাকা ডিভিসনের অন্তর্গত এই জেলার কর্মভার গ্রহণ করেন এবং ১৮৮৪ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত তিনি বাখরগঞ্জের জেলাশাসকের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রমেশচন্দ্র স্বয়ং এই সম্পর্কে লিখেছেন: "এই প্রথম যে একজন ভারতীয়কে একটি জেলার চার্জে দীর্ঘকাল রাখা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে, এটা একটি সন্দেহমূলক পরীক্ষা মাত্র।" বাখরগঞ্জ সবচেয়ে সমস্যাপীড়িত জেলা এবং সমগ্র বাংলা প্রদেশের এটাই ছিল তখন সবচেয়ে 'turbulent'

জেলা আর সময়টাও ছিল, রমেশচন্দ্রের কথায়, 'one of excitement, for the Ilbert Bill agitation greatly exercised the public mind and embittered the public feeling during these years.'—এই পরিবেশের মধ্যেই রমেশচন্দ্র বাখরগঞ্জ জেলাশাসকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং দু'বছর পরে যখন তিনি এই দায়িত্বভার ত্যাগ করেন তখন সরকারীভাবে শাসনকার্যে তাঁর দক্ষতার যে প্রশংসা করা হয়েছিল, সরকারী দপ্তরের পুরাতন নথিপত্র অনুসন্ধান করলে পরে তার অনেক নিদর্শন হয়তো পাওয়া যাবে।

যে দু'বছর তিনি বাখরগঞ্জের জেলাশাসকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে জেলার প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়, বিশেষ করে এর শিক্ষা ব্যবস্থায়। পথঘাট নির্মাণ ও ষ্টিমারের ব্যবস্থাও তাঁরই উদ্যোগে সাধিত হয়। কিন্তু এই জেলার শাসন ব্যাপারে রমেশচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছিল ক্রিমিন্যাল এ্যাডমিনিষ্ট্রেসন বিভাগে। পূর্বেই বলা হয়েছে, ঢাকা ডিভিসনের অন্তর্গত এই জেলাটি সরকারী পরিভাষায় 'কুখ্যাত জেলা' বলেই চিহ্নিত ছিল; প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদারদের মধ্যে বিরোধ হেতু এইখানে সর্বদাই গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা লেগে থাকত। এই জেলার দায়িত্ব গ্রহণ করেই রমেশচন্দ্রের দৃষ্টি এই বিষয়টির উপর প্রথমে পড়ে এবং তিনি অত্যন্ত সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে এই সমস্যাটির সমাধানে প্রয়াস পান। জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাখরগঞ্জের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। কি উপায়ে সমস্যা-পীড়িত এই জেলায় শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে রমেশচন্দ্রের প্রয়াস সার্থক (এই সার্থকতাকে সরকারী রিপোর্টে 'singular success' বলে উল্লিখিত করা হয়েছিল) হয়েছিল, অনুসন্ধিৎসু পাঠক তা তৎকালীন সরকারী রিপোর্ট পাঠ করলে অবগত হবেন।* যে জেলা পূর্বে সরকারী স্বীকৃতি অনুসারে 'notorious for riots' বলে পরিচিত ছিল, রমেশচন্দ্রের শাসনকালে সেই বাখরগঞ্জের চেহারা একেবারেই বদলে যায়। সরকারী রিপোর্টে তাঁর এই দক্ষতার প্রশংসা করে মন্তব্য করা হয়েছিল: "Mr. Dutt is the only District Officer whose name is specifically mentioned for his

* *Administration Report*, Dacca Division, 1883-84.

able administration of a very heavy district." এবং লেঃ গভর্ণর স্তর রিভার্স টমসন এই তরুণ সিবিলিয়ানের কৃতিত্বে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে একখানি ব্যক্তিগত পত্র লিখেছিলেন। তাঁর এই কৃতিত্বের চরম পুরস্কার মিলল যখন বড়লাট লর্ড রিপন তাঁর সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারের জন্য রমেশচন্দ্রকে লাটভবনে নিমন্ত্রণ করলেন। তিনি রমেশচন্দ্রের কাজের খুব প্রশংসা করে তাঁকে বলেছিলেন: "I sent for you as I wished to see you and know you. Your work should be known in England ; the fitness of Indians for high administrative posts would not be then questioned." বস্তুতঃ বাখরগঞ্জে একা রমেশচন্দ্রই শুধু অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নি, পরবর্তি সিবিলিয়ানদের জন্য তিনি পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। অতঃপর শাসনকার্যে ভারতীয়দের যোগ্যতা সম্পর্কে আর প্রশ্ন উঠবার অবকাশ রইল না।

দু'বছর পরে যখন তিনি কার্যভার ত্যাগ করেন তখন বরিশালের সর্বশ্রেণীর অধিবাসী, এমন কি স্থানীয় সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজরা পর্যন্ত তাঁদের এই জনপ্রিয় জেলাশাসককে এক বিদায়-সভায় সম্বর্ধিত করেছিলেন। যেদিন সকালে তিনি স্টিমারে করে বাখরগঞ্জ ত্যাগ করবেন সেদিন ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলো থেকে স্টিমারঘাট পর্যন্ত রাস্তার দুই ধারে স্কুলের ছাত্র এবং সরকারী ও বেসরকারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের যে বিপুল সমাবেশ দেখা দিয়েছিল তেমন দৃশ্য বাখরগঞ্জে ইতিপূর্বে দেখা যায় নি। তাঁর বাখরগঞ্জের কর্মজীবনের শেষভাগের একটি ঘটনা উল্লেখ করব। একবার কোনো একটি ফৌজদারি মামলায় রমেশচন্দ্র এক আসামীকে দণ্ডিত করেন। আসামী প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি, তার পিছনে জমিদারের অর্থবল ছিল। হাকিমের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আসামীর পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়। আসামীপক্ষের ব্যারিস্টার ছিলেন মনোমোহন ঘোষ। নির্জলা মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে রচিত আবেদনটি হাইকোর্ট অগ্রাহ্য করেন এবং হাকিমের রায়ই বহাল থাকে। এই প্রসঙ্গটির উল্লেখ করে রমেশচন্দ্র বরিশাল থেকে ১৮৮৪, ১৭ই জুন তারিখে তাঁর অগ্রজকে একপত্রে লিখেছিলেন: "I am exceptionally careful in my work here, and though the High Court may find sometimes that I am legally or technically wrong, they will never find

that I am unjust, or oppressive, or high-handed as a magistrate. I received a letter from the Legal Remembrancer that the appeal against my order has been rejected by the High Court, as I expected...It is my duty to check influential men when they are wrong." প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা চিরকালই আইনকে পদদলিত করে চলে থাকে, আজও তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কিন্তু বিরল হয়ে পড়েছে রমেশচন্দ্রের ন্যায় ন্যায়পরায়ণ ও নির্ভীক হাকিমের শ্রেণী—যাঁরা বিত্তশালী ও প্রভাবশালী লোকের কাছে নতি স্বীকার করেন না।

সুদীর্ঘ ছুটীর পর য়ুরোপ থেকে প্রত্যাবর্তন করে রমেশচন্দ্র ১৮৮৭ সালে পাবনার জেলাশাসকের পদে নিযুক্ত হন। এখানে জেলাশাসক বলতে জয়েণ্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট ও জয়েণ্ট-কালেক্টর বুঝতে হবে। ত্রিশ বছর পরে রমেশচন্দ্র এই দ্বিতীয়বার পাবনা এলেন। ত্রিশ বছর আগে এইখানে তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়েছিল এবং তখন এখানে থাকবার সময়ে যে স্কুলে তিনি পড়তেন সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষকমহাশয় এখন অবসর জীবনযাপন করছেন। নতুন হাকিম এসে সর্বাগ্রে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। পাবনায় তাঁর স্থিতিকাল মাত্র ছয়মাস এবং তারপর তিনি বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলা মৈমনসিংহে বদলী হন। রমেশচন্দ্র যখন এই জেলার দায়িত্ব নিয়ে এলেন, তখন এখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থায় চরম বিশৃঙ্খলা ও অনিয়মের রাজত্ব চলেছে। কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, জামালপুর, টাঙ্গাইল—সর্বত্রই যেন অরাজকতা। এই অবস্থায় লেঃ গভর্ণর টমসন একজন ভারতীয় ম্যাজিষ্ট্রেটকে এখানে পাঠাবার সিদ্ধান্ত করেন এবং রমেশচন্দ্র দত্তকেই তিনি যোগ্য বিবেচনা করলেন। তাঁর যোগ্যতা ও প্রতিভার এই স্বীকৃতিতে রমেশচন্দ্র স্বভাবতঃই উল্লসিত বোধ করলেন। চীফ সেক্রেটারি স্যর জন এডগার, তাঁর নিয়োগের পর, একপত্রে রমেশচন্দ্রকে লিখেছিলেন যে, "আপনার দক্ষতার উপর সরকারের পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে।" পত্রের শেষাংশে এই লাইনটি ছিল :

"You will justify my recommendation to the most difficult district, in many ways, there is in Bengal."

সদর ভিন্ন মৈমনসিংহ জেলার সাবডিভিসনের সংখ্যা তখন ছিল চারটি এবং প্রত্যেকটি সাবডিভিসনই গুরুত্বপূর্ণ। মৈমনসিংহ ধনী জমিদারদের দেশ এবং তাঁদের প্রতিপত্তিও ছিল অসাধারণ। এই জেলার জনসংখ্যা তখন ক্রমবর্ধমান ; চাষ-আবাদও তখন বাড়তির পথে এবং পূর্বে যেসব জমি অনাবাদী ছিল এখন সেখানে চাষবাস আরম্ভ হয়েছে। পূর্ব-বাংলার পাটের প্রধান কেন্দ্র তখন মৈমনসিংহ। রমেশচন্দ্র যখন এই জেলার ভারপ্রাপ্ত হয়ে এলেন তখন পাটের চাষ যথেষ্ট বর্ধিত হয়েছে ; জেলার অধেকের বেশি জমিতে চাষ হয় এবং পাটের দৌলতে নারায়ণগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জে দুটি প্রধান ব্যবসায়কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। কাজেই এই জেলার শাসনকার্যের দায়িত্ব ছিল স্বতন্ত্র রকমের। রমেশচন্দ্র এই জেলার শাসনকার্যেও যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিলেন। মৈমনসিংহ থেকে কিশোরগঞ্জ পর্যন্ত সড়কটি তাঁরই সময়ে নির্মিত হয়। তাঁর শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ যথেষ্ট উপকৃত হন এবং তাঁদের কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁরা টাঙ্গাইলের পাবলিক হলটির নামকরণ করেন 'রমেশচন্দ্র হল' আর নেত্রকোণার উচ্চ বিদ্যালয়টির নাম রাখা হয় 'দত্ত হাইস্কুল'। মৈমনসিংহে টেকনিক্যাল স্কুলটি তাঁর আর একটি কীর্তি। শহরে পরিস্রুত জলসরবরাহের ব্যবস্থা তাঁরই শাসনকালে হয়। এখানে দুটি প্রতিষ্ঠান ছিল—সারস্বত সমাজ ও জমিদার-সম্মিলনী; রমেশচন্দ্র শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং এই দুটি প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপে তিনি যথেষ্ট আগ্রহ প্রদর্শন করতেন। এইভাবেই তিনি জনসাধারণের সঙ্গে মেলামেশা করে জমিদার ও রায়তদের মধ্যে একটি সম্প্রীতির ভাব জাগিয়ে তুলেছিলেন এবং এর একটা সুফল এই দেখা গিয়েছিল যে, তিনি এই জেলায় আসার পর থেকে বহু মামলা-মোকদ্দমা আপোষে মিটে যেত। তাঁর কার্যকালে মৈমনসিংহের একটি বিখ্যাত ঘটনার উল্লেখ করব। জাহ্নবী চৌধুরাণি ও বিন্দুবাসিনী চৌধুরাণি—এই দুইজন মেয়ে-জমিদারের মধ্যে শরিকানা নিয়ে একটা বিরাট মামলা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছিল। রমেশচন্দ্র বিচক্ষণতার সঙ্গে এই পারিবারিক কলহ মিটমাট করে দিয়ে দুজনেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন। এখানেও তিনি একজন দক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন।

রমেশচন্দ্রের সরকারী কর্মজীবনের পরবর্তি ইতিহাস আলোচনায় আমাদের আর প্রয়োজন নেই। একজন সিবিলিয়ান স্বদেশসেবায় ও জনসাধারণের মঙ্গলকর্মে কতখানি কৃতিত্ব দেখাতে পারেন, রমেশচন্দ্র তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জেলাশাসক হিসাবে তিনি যে কৃতিত্ব, ন্যায়পরায়ণতা এবং জন-সাধারণের অভাব-অভিযোগের প্রতি যে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন তার তুলনা নেই। যে পঁচিশ বছরকাল তিনি সরকারী কর্মে লিপ্ত ছিলেন, সেইসময় তিনি শুধু হাকিমী করেন নি, তিনি যখন যেখানে গিয়েছেন তখন সেখানকার জনসাধারণ, সমাজ, বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ যেমন লক্ষ্য করতেন, তেমনি আবার তাদের আর্থনীতিক জীবনের পরিচয় নিতেও তিনি সর্বদা তৎপর ছিলেন। তাঁর সুবিচার ও জনহিতকর কার্যের জন্য প্রত্যেক স্থলেই তিনি অকুণ্ঠ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। রমেশচন্দ্রের চাকরি-জীবনের আনুপূর্বিক ইতিহাস আলোচনা করলে পরে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি শুধু যোগ্যতারই পরিচয় দেন নি, ভারতীয় ও য়ুরোপীয় নির্বিশেষে সকল অধীনস্থ কর্মচারী রমেশচন্দ্রের মধুর ব্যবহার এবং সহৃদয়তায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। এত কৃতিত্ব ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েও তাঁর ভাগ্যে কিন্তু অস্থায়ী কমিশনারের পদের অতিরিক্ত কিছু মিলল না। সুরেন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে যথার্থই লিখেছেন: "As for Ramesh Chandra Dutt, he was a man amongst men, a prince among his peers. His superiorty was observable in every gathering that he adorned with his presence. Yet this distinguished Civil Servant, such was the reactionary tendency in those days, never rose beyond the position of an officiating Commissioner of a Division."

কিন্তু সরকার যে প্রতিভার যোগ্য সমাদর প্রদর্শনে কুণ্ঠিত ছিলেন, একজন ভারতীয় সামন্ত নৃপতি রমেশচন্দ্রকে তাঁর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করে সেই প্রতিভার যোগ্য সমাদর দেখিয়েছিলেন। সে-কাহিনী আমরা যথাস্থানে বলব।

॥ পাঁচ ॥

"Literature is my engrossing passion and literary fame my first love—" কর্মজীবনে প্রবিষ্ট হয়ে অগ্রজকে লিখিত একাধিক পত্রে রমেশচন্দ্র এই কথা লিখতেন। তাঁর জীবনব্যাপী সাহিত্যকর্মের মূলে এই অনুরাগ সক্রিয় ছিল। তবে তিনি বাংলাভাষার লেখক হতে পেরেছিলেন একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণায়। ইংরেজি ভাষায় কৃতবিদ্য রমেশচন্দ্রের মধ্যে যে একজন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক ছিল, তা তাঁর ইংরেজি পত্রাবলী ও অন্যান্য রচনা, বিশেষ করে *Three Years in Europe* ও *Rambles in India*, এই গ্রন্থ দু'খানি পড়লেই বুঝা যায়। কেমন করে তিনি বাংলাভাষার লেখক হলেন সেই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে রমেশচন্দ্র নিজেই বলেছেন: "আমি বিলাত হইতে ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে প্রত্যাগত হইয়া আলিপুরে কার্যে ব্রতী হইয়াছি। বঙ্কিমবাবু তখন 'বঙ্গদর্শন' বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ভবানীপুরে একটি ছাপাখানা হইতে ঐ কাগজখানি প্রথমে বাহির হয়, তখন বঙ্কিমবাবু সর্বদা যাইতেন। সেই ছাপাখানার নিকটে আমার বাসা ছিল। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমবাবু আসিলেই আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। একদিন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কথা হইল, আমি বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস-গুলির প্রশংসা করিলাম, তাহা বলা বাহুল্য। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি বাংলা পুস্তকে তোমার এত ভক্তি ও ভালোবাসা, তবে তুমি বাংলা লিখ না কেন? আমি বিস্মিত হইলাম! বলিলাম,—আমি যে বাংলা লিখা কিছুই জানি না। ইংরেজি বিদ্যালয়ে পণ্ডিতকে ফাঁকি দেওয়াই রীতি, ভালো করিয়া বাংলা শিখি নাই। কখনো বাংলা রচনা পদ্ধতি জানি না। গম্ভীরস্বরে বঙ্কিমবাবু উত্তর করিলেন, রচনা পদ্ধতি আবার কি,—তোমরা শিক্ষিত যুবক। তোমরা যাহাই লিখিবে, তাহাই রচনাপদ্ধতি হইবে। তোমরাই ভাষাকে গঠিত করিবে।"*

বাংলাসাহিত্যের দ্বিতীয় ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিককে বাংলাভাষায় লিখবার প্রেরণা দেবার পক্ষে এইটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট ছিল। 'ক্যাপটিভ লেডি' কাব্যের

* নব্যভারত, বৈশাখ, ১৩০১

প্রণেতা মাইকেলকে বেথুন সাহেবের চিঠি যেমন বাংলাভাষায় লিখবার প্রেরণা দিয়েছিল, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের এই কয়টি কথা সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্রকে বাংলা-ভাষায় লিখবার উৎসাহ দিল। ক্ষেত্র প্রস্তুতই ছিল, বঙ্কিমের প্রেরণাবারি-সিঞ্চনে তাতে যে ফসল ফলল, তা মাতৃভাষাকে যেমন সমৃদ্ধশালী করে তুলল, তেমনি সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যরচনা দ্বারা এক নতুন আদর্শের সন্ধানও দিল। রমেশচন্দ্রের সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে আমরা তাই একটু বিস্তারিত আলোচনাই করব। রাজকার্যে নিযুক্ত থেকেও রমেশচন্দ্র সাহিত্যসেবাকে জীবনের একটি বিশিষ্ট কর্তব্য হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন; এ ক্ষেত্রে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সগোত্র। এই কর্তব্যের মূলে ছিল দেশসেবা। দেশসেবা ও জাতির প্রতি কর্তব্যবোধ—ইহাই সেই মনীষিকে বাংলা সাহিত্যরচনায় প্রবৃত্ত করেছিল। বস্তুতঃ তাঁর বাংলা সাহিত্যানুশীলনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতিসাধন।

রমেশচন্দ্রের সাহিত্যসাধনাকে আমরা প্রধানত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি—ইংরেজি ও বাংলা। বাংলা ভাষায় লিখতে প্রবৃত্ত হবার আগে তিনি ইংরেজি ভাষায় কয়েকখানি বই লিখে তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য সুখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর অধিকাংশ রচনাই ইংরেজি ভাষায় লেখা। ইহা স্বাভাবিক; কারণ আকৈশোর তিনি ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অনুশীলনে অবহিত ছিলেন। তা'ছাড়া, দত্ত-পরিবারের আবহাওয়াই ছিল ইংরেজিভাবাপন্ন এবং এ-কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ইংরেজি ভাষাই এই পরিবারের অন্যান্য কৃতী সন্তানদের কাছে অনেকটা মাতৃভাষার মতন হয়ে উঠেছিল। রমেশচন্দ্রকে আমরা তাই ইংরেজিতেই তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু করতে দেখি। ছাত্রাবস্থায় য়ুরোপ থেকে তিনি অগ্রজকে ইংরেজিতে চিঠিপত্র লিখতেন। ১৮৭২ সালে সেইসব পত্রের সারাংশ নিয়ে প্রকাশিত হয় রমেশচন্দ্রের প্রথম বই *Three Years in Europe* এবং বইখানি তিনি স্বীয় অগ্রজ যোগেশচন্দ্র দত্তকে উৎসর্গ করেন জীবনব্যাপী স্নেহ ও ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ। এই বইখানি মুখ্যত তাঁর য়ুরোপভ্রমণের অভিজ্ঞতা এবং ১৮৯০ সালে যখন ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তখন তাঁর দ্বিতীয়বার য়ুরোপ গমনের (১৮৮৬)

অভিজ্ঞতাও লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর জীবিতকালে বইখানির চারটি সংস্করণ হয়েছিল এবং এর থেকেই বুঝা যায় যে ইংরেজিশিক্ষিত পাঠকমহলে বইখানির যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিল। সমাদরের কারণ, তাঁর পূর্বে আর কোনো ভারতীয় তাঁদের য়ুরোপবাসের অভিজ্ঞতা এমন সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করবার প্রয়াস পান নি। ভ্রমণকাহিনী হিসাবে *Three Years in Europe* সত্যই একখানি উপাদেয় এবং উপভোগ্য বই। লণ্ডনের সমাজ-জীবনের, বিশেষ করে এই শহরের নিম্ন এবং দরিদ্রশ্রেণীর মানুষের জীবন কী অভিশপ্ত, তার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন রমেশচন্দ্র। নিঃসন্দেহে এ তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির ফল। সেই বর্ণনার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হোল :

"The problem of the condition of the poor engages the attention of Englishmen, and is in the present cold season, e citing deep interest. Notwithstanding many noble qualities, the lower classes of England are in many respects very far from what they ought to be, and their character is soiled by some of the worst vices of human nature. Drunkenness and cruelty to wives prevail to a fearful extent among them."

বৃস্টলে তিনি রামমোহনের সমাধিস্থলটি দেখতে ভোলেন নি। মোট কথা, ভিক্টোরিয় যুগের ইংলণ্ড এবং ঐ সময়কার য়ুরোপের নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, প্যারিস, ইতালি প্রভৃতি দেশের একটি সুন্দর চিত্র রমেশচন্দ্রের এই বইখানিতে পাওয়া যায়।

তাঁর *Rambles in India* বইখানি প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ সালে। তখন রমেশচন্দ্র চাকরিজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন। যে চব্বিশ বৎসরকাল তিনি সরকারি কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, প্রধানত সেই সময়কার অভিজ্ঞতাই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বহু মানচিত্র এবং চিত্র-শোভিত এই বইখানি এক হিসাবে তাঁর জীবনচরিতের একটি মূল্যবান উপাদান বললেও চলে। রাজকার্যে নিযুক্ত একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর জীবনের অভিজ্ঞতা বড় কম নয়, বিশেষ করে তখনকার বাংলার সমাজজীবনে একটা পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করেছে।

এই বইখানি অবশ্য যখন প্রকাশিত হয় তখন রমেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতিমান লেখক। তাঁর এই বই থেকেও রমেশচন্দ্রের জীবনের, বিশেষ করে তাঁর চাকরিজীবনের অনেক ঘটনা জানতে পারা যায়। এ ছাড়া, তাঁর অন্যান্য ইংরেজি রচনার মধ্যে *The Peasantry of Bengal* ও *The Literature of Bengal* বই দু'খানি প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৭৪ এবং ১৮৭৭ সালে। রমেশচন্দ্রের একটি ছদ্মনাম ছিল—'ARCYDE' এবং এই ছদ্মনামে তাঁর বহু ইংরেজি রচনা রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-সম্পাদিত 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' পত্রিকায় এবং শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'মুখার্জিস্ ম্যাগাজিন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই দু'খানি পত্রিকায় তিনি অনেক কবিতা ও প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন। বাংলাসাহিত্যের কোনো ইতিহাস ছিল না। রমেশচন্দ্র অগ্রণী হয়ে সেই অভাব দূর করলেন—লিখলেন *The Literature of Bengal*, প্রাচীনকাল থেকে রমেশচন্দ্রের সময় পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আমরা সেই প্রথম পেলাম। বইখানি প্রকাশিত হওয়া মাত্র পাঠক-সমাজে সমাদৃত হয়েছিল। স্যর উইলিয়ম হাণ্টারের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁর গ্রন্থে এই বই থেকে যথেষ্ট উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুবিখ্যাত 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় এর একটি বিস্তারিত সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। তখনই রমেশচন্দ্রের খ্যাতি বিলেতে পৌঁছে গেছে; তাই আমরা দেখতে পাই, তাঁর বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকায় একটি সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল: "Mr. Dutt springs himself from a distinguished literary family, and he has well maintained its reputation both in prose and verse. The conspicuous merit of his book is its frank acknowledgement that no literary success which an Indian can make in English or any exotic tongue, is to be compared as regards its value to his countrymen with first-class work in his own language. It is this instinct of literary patriotism which animates the best Bengali writers." মাইকেলকে একদা স্বপ্নে কুললক্ষ্মী যা বলে দিয়েছিলেন, রমেশচন্দ্র সেই কথারই

প্রতিধ্বনি তুলে লিখলেন যে, মাতৃভাষার চর্চা ভিন্ন দেশবাসীর নিকট স্থায়ী গৌরবলাভের সম্ভাবনা নেই। যে দেশহিতৈষণা একদা মাইকেলকে প্রেরণা দিয়েছিল, সেই একই কথা রমেশচন্দ্রের সম্পর্কে আমরা বলতে পারি।

তিনি সংস্কৃত সাহিত্য খুব যত্নের সঙ্গে পাঠ করেছিলেন। সংস্কৃতের প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল; এ অনুরাগ কৈশোরেই পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃতসাহিত্যে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল বলেই তিনি সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় অমন কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সংস্কৃত-চর্চা বৃথা যায় নি। চাকরি-জীবনে থাকতেই, সংস্কৃতসাহিত্যের ওপর ভিত্তি করে রমেশচন্দ্র রচনা করলেন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস—*A History of Civilisation in Ancient India.* এই মূল্যবান বইখানির ছত্রে ছত্রে রমেশ-প্রতিভার স্বাক্ষর দেদীপ্যমান; আমরা যথাস্থানে এর আলোচনা করব। তাঁর *Lays of Ancient India* ইংরেজিতে রচিত আর একখানি সুন্দব কাব্যগ্রন্থ। ১৮৯৪ সালে ইহা লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত কবিতার ইংরেজি ছন্দে অনুবাদ সেই প্রথম। মেকলের *Lays of Ancient Rome*-এর অনুসরণে রচিত এই বইখানি বিশিষ্ট সমালোচকদের মতে খুব উৎকৃষ্ট কাব্য হয়নি; তার কারণ ইংরেজি গদ্য রচনায় রমেশচন্দ্র যেরূপ দক্ষ ছিলেন, ইংরেজি কবিতা রচনায় তিনি সে রকম পারঙ্গম ছিলেন না। তাই এই ইংরেজি কাব্যগ্রন্থখানিকে আমরা তাঁর একটি দুর্বল রচনা বলতে পারি।

ইংরেজি কবিতায় রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য দু'খানির সারাংশের অনুবাদ, রমেশচন্দ্রের ইংরেজিচর্চার আর একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। শেষোক্ত বইখানির ভূমিকা লিখেছিলেন পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমুলার। ১৭৮৫ থেকে ১৮৮৪—এই একশত বৎসরকাল ভারতে ইংরেজশাসনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে রমেশচন্দ্রের *England and India* নামক পুস্তকে। এ ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। ইংরেজ আমলের ভারতীয় অর্থনীতি নিয়ে প্রথম গবেষণার কৃতিত্ব রমেশচন্দ্রের এবং এই সম্পর্কে রচিত তাঁর *The Economic History of India* আজো একখানি অসাধারণ গ্রন্থ হিসাবে সর্বজনস্বীকৃত। ঔপন্যাসিক ও ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্রের মধ্যে যে কতবড়ো একজন প্রতিভাবান অর্থনীতিবিদ্ ছিল তার প্রমাণ এই

বইখানি। এ বিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব। বস্তুত ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃতসাহিত্যের অনুশীলনে রমেশ-প্রতিভা সার্থক হয়েছে। রমেশচন্দ্র ফরাসীভাষাও ভাল জানতেন, জার্মানভাষায় লেখা পুস্তকাদি পড়েও রস গ্রহণ করতে পারতেন। তাঁর রচিত সাহিত্যের অনুশীলন করলে বেশ বুঝা যায় যে, তাঁর সাহিত্যসাধনায় এসব ভাষার পরোক্ষ প্রেরণা ছিল। ভাষা শিক্ষাসম্পর্কে তাঁর একটি অভিমত খুবই সুস্পষ্ট: "Our education is incomplete unless we learn the great modern languages—English, French and German." উনিশ শতকের বাংলায় মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের পর এতগুলি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন সম্ভবত রমেশচন্দ্র দত্ত।

রমেশচন্দ্রের প্রধান জীবনীকার (জামাতা জে এন গুপ্ত, আই সি এস.) তাঁর পুস্তকে সতীর্থ বিহারীলাল গুপ্তকে লেখা রমেশচন্দ্রের একখানি পত্রের উল্লেখ করেছেন। সেই পত্রখানি পাঠ করে আমরা জানতে পারি যে, স্বলিখিত ইংরেজি বইগুলির মধ্যে তিনখানি সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। ১৯০৩ সালে বন্ধু বিহারীলালকে তিনি লণ্ডন থেকে লিখছেন: "My, *Ancient India* and *Epics* and *Economic History* will remain the most important productions of my rather prolific pen during the maturest period of my life, between fifty and sixty." আজ অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল অতীত হয়েছে, তবু এ কথা অবিসম্বাদিতভাবে স্বীকৃত যে, স্বদেশসেবার প্রেরণাতে রচিত হয়েছিল বলেই না তাঁর এই ইংরেজি রচনাগুলি এমনভাবে কালজয়ী হতে পেরেছে।

১৮৭২ (বাংলা ১২৭৯, বৈশাখ মাস) সালটি আধুনিক বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এই বছর বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসেবার দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হয় 'বঙ্গদর্শন'-কে কেন্দ্র করে। বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের এবং তাঁহার নেতৃত্বে ইংরেজিশিক্ষিত লেখক-গোষ্ঠীর রচনায় 'বঙ্গদর্শন সেদিন সত্যিই বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতির দর্পণস্বরূপ হয়ে উঠেছিল। বিজ্ঞান, দর্শন,

সাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্য ও কাব্য, সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, অর্থনীতি, সঙ্গীত, ভাষাতত্ত্ব, পুস্তক সমালোচনা—এমন কোনো বিষয়বস্তু নেই, যা বঙ্গদর্শনে স্থান পেত না। এ সকল বিষয়ের আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র গতানুগতিকতার হাত থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নূতন পথ ধরেছিলেন। বাংলার শিক্ষিতসমাজ নতুন আলোকে উদ্ভাসিত এক নতুন পথে পদক্ষেপ করল। সেই প্রথম যে, শিক্ষিত বাঙালির চিত্তলোক অবারিত আর চেতনা প্রসারিত হোল। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন:

"বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদপদ্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল। পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম, দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তে অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিষয়বস্তু, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলো, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য। বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত 'সমাগতো রাজ-বদুন্নতধ্বনিঃ'।...বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"

বঙ্গদর্শন প্রথম কলিকাতা-ভবানীপুর প্রেসে ছাপা হোত। তাঁর কর্মজীবনের প্রথমে রমেশচন্দ্রের বাসা ছিল ভবানীপুরে। সেইসময় ঐ প্রেসেই একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, এ-কথা পূর্বেই বলেছি। তখনো পর্যন্ত তিনি ইংরেজিভাষার লেখক। তাঁর 'বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে রমেশচন্দ্র লিখেছেন: "সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্র আমাকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'You will never live by your English writings' এবং তাঁর এই কথাটি আমার হৃদয়ে গেঁথে যায়। এই কথাবার্তার দু'বছর পরে, ১৮৭৪ সালে আমার প্রথম বাংলা রচনা 'বঙ্গবিজেতা' প্রকাশিত হয়।" বাংলাসাহিত্যের জগতে বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন রমেশচন্দ্রকে আহ্বান করে নিয়ে এলেন সেইদিন থেকে তিনি মাতৃভাষার অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করলেন। অবশ্য পরবর্তি জীবনে, বিশেষ করে স্বদেশসেবার তাগিদে গবেষণা ও

* বঙ্কিম-প্রসঙ্গ: রবীন্দ্রনাথ।

আলোচনা তিনি ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই করেছিলেন। রমেশচন্দ্র ছিলেন ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় সব্যসাচী লেখক। বাংলা অপেক্ষা তাঁর ইংরেজি রচনার পরিমাণই অধিক। রমেশচন্দ্রকে আমরা বঙ্কিমের ভাবশিষ্য বলতে পারি। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তাঁর ওপর বঙ্কিমের প্রভাব ও প্রেরণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। রমেশচন্দ্র লক্ষ্য করেছিলেন যে, বিদ্যাসাগর, মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি তাঁর পূর্বসূরিগণের সাহিত্য অনুশীলনের মূলে ছিল তাঁদের দেশসেবা করবার আকাঙ্ক্ষা। সেই একই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রমেশচন্দ্র ছাব্বিশ বছর বয়সে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। ইতিহাসের প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক অনুরাগ বা প্রবণতা ছিল। স্কট তাঁর প্রিয়তম লেখক, এ-কথা তিনি নিজেই বলেছেন। বঙ্কিমও তাঁর প্রিয় লেখক ছিলেন। স্কট ও বঙ্কিমচন্দ্র এই দু'জনকে সম্মুখে রেখেই রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় হস্তক্ষেপ করলেন। তবে তিনি একান্তভাবে বঙ্কিমানুসারী উপন্যাস লেখক।

রমেশচন্দ্র মাত্র ছয়খানি উপন্যাস লিখেছেন; চারখানি ইতিহাস-ভিত্তিক, অপর দুইখানি সামাজিক সমস্যা নিয়ে রচিত। সংখ্যায় অল্প হলেও এই ছয়খানি উপন্যাসের মধ্যে তাঁর শিল্পী-মানসের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। 'বঙ্গবিজেতা' তাঁর প্রথম উপন্যাস। এর প্রকাশকাল ১৮৭৪। এই উপন্যাসখানি প্রথমে 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গবিজেতা' যখন প্রকাশিত হয় রমেশচন্দ্র তখন মেহেরপুর সাবডিভিসনের চার্জে ছিলেন। আজীবন সুহৃদ বিহারীলাল গুপ্তকে তিনি বইখানি উৎসর্গ করেন। রমেশচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস 'মাধবীকঙ্কণ'। প্রকাশকাল ১৮৭৭। রমেশচন্দ্র তখন কৃষ্ণনগরের সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর। এ বইখানি তিনি তাঁর বিলাতযাত্রা ও বিলাতপ্রবাসের অন্যতর সঙ্গী বন্ধুবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে তিনি সুরেন্দ্রনাথকে 'স্বদেশহিতৈষী' বলে অভিহিত করে লিখেছেন: "তুমি যে ব্রত ধারণ করিয়াছ, তাহা অপেক্ষা মহত্তর ব্রত জগতে আর নাই। সেই মহৎকার্যে সফল হও, এই সহিত এই সামান্য পুস্তকখানি তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম।" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সুরেন্দ্রনাথ, বিহারীলাল ও রমেশচন্দ্র তিন বন্ধুই একত্রে সিবিলিয়ানি কার্য গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের ভাগ্যে সিবিলিয়ানি বেশি দিন সহ্য হয়নি।

প্রথমে তিনি শ্রীহট্টের সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৭৩ সালে তিনি বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা লাভ করেন। এই সাফল্যলাভই তাঁর কাল হয়েছিল। তিনি নিজেই বলেছেন "My success was the cause of my official ruin." অতঃপর তিনি জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত হন এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাঁদারল্যাণ্ডের বিষদৃষ্টিতে নিপতিত হন। তারপর সামান্য ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথের কর্মচ্যুতি ঘটে, সে-কাহিনী তিনি তাঁর আত্মচরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু দেশের পক্ষে এ যেন শাপে বর হোল। দেশের রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সুরেন্দ্রনাথ অতঃপর নিজেকে উৎসর্গ করেন। দূর থেকে বন্ধুর এই কাজকেই রমেশচন্দ্র 'মহৎ ব্রত' বলে উৎসর্গপত্রে অভিহিত করেছেন।

'মাধবীকঙ্কণ' প্রকাশিত হবার পর বাংলাসাহিত্যের প্রতি রমেশচন্দ্রের মনোভাব পূর্বাপেক্ষা আরো অনুরাগসিক্ত হয়ে উঠল। এইসময়ে বাখরগঞ্জ থেকে অগ্রজকে লেখা একখানি পত্রে তিনি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করে লিখছেন: 'আমি দুইখানি বাংলা উপন্যাস রচনা করিয়াছি এবং সম্ভবত আমার মৃত্যুর পর এই দুইখানি স্থায়িত্ব লাভ করিবে। আমার নিজের মাতৃভাষাতেই আমি অনুশীলন করিব।" সেই অনুরাগের ফল ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত'। রমেশচন্দ্র তখন দক্ষিণ শাহবাজপুরে। সেখানে কী পরিবেশের মধ্যে তিনি ছিলেন, তার আভাস পূর্বে দিয়েছি। বইখানি তিনি 'ভ্রাতার জীবনব্যাপী স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ' কনিষ্ঠ সহোদর অবিনাশচন্দ্র দত্তকে উৎসর্গ করেন। অবিনাশচন্দ্রও কৃতবিদ্য ছিলেন এবং য়ুরোপ থেকে "নানা ভাষা ও নানা বিদ্যা আহরণ" করে এসেছিলেন। এখানে বলে রাখা ভালো যে, গুরু এবং শিষ্য উভয়ের রচনা যুগপৎ বাংলাসাহিত্যে দেখা দিয়েছিল; বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' এবং রমেশচন্দ্রের 'জীবন-প্রভাত' একই বছরে দুটি মাসিকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্গদর্শনে রাজসিংহ আর বান্ধবে জীবন-প্রভাত। পরবর্তি বৎসরে প্রকাশিত হয় 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা'। ইহাই রমেশচন্দ্রের চতুর্থ বা শেষ ঐতিহাসিক উপন্যাস। তখন তিনি ত্রিপুরায়। এই উপন্যাসখানি তিনি অগ্রজ যোগেশচন্দ্র দত্তকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরকে

"স্বদেশপ্রিয়, অমায়িক, উদারচরিত্র" বলে অভিহিত করেছেন। শৈশবেই তিনি পিতৃহীন হয়েছিলেন, এই অগ্রজের স্নেহ অনুজের জীবনে পরম সম্পদ ছিল—তাই তিনি উৎসর্গপত্রে অকপটচিত্তে স্বীকার করেছেন "শৈশবে তোমার স্নেহে আমি পুষ্ট হইয়াছিলাম, বাল্যকালে ঐ ভালবাসায় আমি স্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল হইয়াছিলাম। এখনও জীবনের নানা আকাঙ্ক্ষায় যখন ক্লান্ত হই, জীবনের অনন্ত চেষ্টা-পরম্পরায় যখন শ্রান্ত হই… …তখন ঐ আদর্শরূপ নির্মল চরিত্র, ঐ অকৃত্রিম অমায়িক স্নেহের কথা চিন্তা করি, আমার হৃদয় শীতল হয়, আমি শান্তিলাভ করি।" উনিশ শতকের বাংলার সম্রান্ত ও অভিজাত পরিবারের মধ্যে সামাজিক বন্ধন কতখানি প্রীতিপূর্ণ ছিল তার কিছুটা আভাস এখানে আমরা পাই।

ছয় বৎসরের মধ্যে চারখানি বৃহৎ উপন্যাস রচনা করা নিঃসন্দেহে রমেশচন্দ্রের কর্মসামর্থ্যের পরিচায়ক। ভারতবর্ষের একটা পুরো শতাব্দীর মানবজীবনের বিভিন্ন দিক, সমস্যা, ঘটনা ও ব্যক্তি নিয়ে লেখা এই উপন্যাস চারখানি রমেশচন্দ্রের অনন্যসাধারণ প্রতিভারও পরিচায়ক। ১৮৭৯ সালে এই উপন্যাস চারখানি একসঙ্গে 'শতবর্ষ' নামে প্রকাশিত হয়। বঙ্গবিজেতা উপন্যাসের কাহিনীকাল ১৫৮০ সাল আর জীবন-সন্ধ্যার কাহিনীকাল ১৬৬৩ সাল—এই শতবর্ষকালের ইতিহাস এই উপন্যাস চারখানিতে বিবৃত হয়েছে। "এই শতবর্ষের বিশেষ ঘটনা আকবরের প্রভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, রাজপুত শক্তির জীবন-সন্ধ্যা এবং আওরংজেবের সময়ে শিবাজীর প্রভাবে মহারাষ্ট্রশক্তির জীবন-প্রভাত। এই চারখানি উপন্যাসে লেখক ভারতবর্ষের সন্ধ্যাপ্রভাত ও সন্ধিবিগ্রহের শতবর্ষকে অঙ্কিত করিয়াছেন, আর সেই উপলক্ষে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষের ভূখণ্ডে তাঁহাকে পর্যটন করিতে হইয়াছে।"

বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্রষ্টার গৌরব বঙ্কিমচন্দ্রের, যেমন মধুসূদনের গৌরব অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টিতে। বঙ্কিমের অনুসারী ছিল, মাইকেলের যোগ্য অনুসারী কেউ হতে পারেননি—না হেমচন্দ্র, না নবীনচন্দ্র। রমেশচন্দ্রের প্রথম চারখানি উপন্যাসই ইতিহাসকে ভিত্তি করে রচিত। তাঁর

উপন্যাসগুলিতে নতুন নতুন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে, নতুন চরিত্রসৃষ্টিও পরিলক্ষিত হয়, তথাপি মূল উপন্যাস কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রমেশচন্দ্রের এইখানে একটা বড়ো রকমের পার্থক্য দেখা যায়। দুর্গেশনন্দিনী, চন্দ্রশেখর, মৃণালিনী প্রভৃতি উপন্যাসগুলির কাহিনীতে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসনির্দিষ্ট সীমানাকে অতিক্রম করে গিয়েছেন—এখানে শিল্প মুখ্য ইতিহাস গৌণ। রমেশচন্দ্র ইতিহাসকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন, বিশেষ করে জীবন-প্রভাত ও জীবন-সন্ধ্যা উপন্যাসদুখানিতে। বিশিষ্ট সমালোচকদের মতে এই দুখানিই প্রকৃত বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস। রমেশচন্দ্রের ইতিহাসজ্ঞান অসাধারণ, তার ওপর ছিল প্রতিভা ও কল্পনা। এরই ফলে তাঁর হাতে ইতিহাসের তথ্য যেমন বিকৃত হয়নি, তেমনি প্রতিভা ও কল্পনার বলে প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্রই প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতে পেরেছে। তবে তাঁর রোমান্সসৃষ্টির দক্ষতা মাধবীকঙ্কণ, জীবন-প্রভাত ও জীবন-সন্ধ্যায় সমধিক অভিব্যক্ত। তাঁর শেষোক্ত উপন্যাসদুখানিতে কল্পনা ঐতিহাসিক সত্যের যতটা অনুগামী হয়েছে দেখা যায়, প্রথম দুইখানিতে ঠিক এর বিপরীত জিনিস লক্ষ্য করা যায়; অর্থাৎ বঙ্গবিজেতা ও মাধবীকঙ্কণে শুধুই কল্পনার আধিপত্য; আবেষ্টনটি মাত্র ঐতিহাসিক। "ইতিহাসের শুষ্ক অস্থির মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিতে হইলে, ঐতিহাসিক বাহ্য ঘটনাকে মানুষের প্রকৃত জীবনের ও হৃদয়াবেগের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিতে হইলে কল্পনার সাহায্য অপরিহার্য। রমেশচন্দ্রের শেষের দুইখানি উপন্যাসে যে কল্পনার পরিচয় পাই, তাহা মুখ্যতঃ এই জাতীয়।" উত্তরকালে বাংলার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্বদেশী আন্দোলনের সময় বহু তরুণ বাঙালি দেশপ্রেমের প্রেরণা লাভ করেছিলেন 'জীবন-সন্ধ্যা' ও 'জীবন-প্রভাত' উপন্যাসদুখানি থেকে, যেমন তাঁরা অনুরূপ প্রেরণা পেয়েছিলেন বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' থেকে। এইদিক দিয়ে বিবেচনা করলে রমেশচন্দ্রের এই ঐতিহাসিক উপন্যাসদুখানির সার্থকতা বড়ো কম নয়। রাজভক্ত সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত তার অকৃত্রিম দেশপ্রেমের স্বাক্ষর রেখে গেছেন এই উপন্যাসদুখানির ছত্রে ছত্রে।

রমেশচন্দ্র একটি বিশেষ উদ্দেশ্যদ্বারা প্রণোদিত হয়েই উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যটি তিনি নিজে এইভাবে ব্যক্ত করেছেন

My sole object has been to narrate the glories of our past and the greatness of our national heroes. If I have succeeded in kindling a single spark of love and admiration for our national heroes, then not in vain did I take up my pen." রমেশচন্দ্রের সাহিত্যকৃতি এবং তাঁর সমগ্র জীবনের মূল সূত্রটিকে আমরা তাঁর এই কথাগুলির মধ্যে পাই। স্পষ্টতই দেখা যায়, তিনি একজন ঐতিহ্যবাদী লেখক ছিলেন, যেমন ছিলেন তাঁর পূর্বসূরি বঙ্কিমচন্দ্র। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস এবং সেই ইতিহাসের বিভিন্ন চিন্তানায়কগণের জীবন ও জীবনাদর্শ সবই এই ঐতিহ্যবাদ দ্বারা চিহ্নিত। রমেশচন্দ্রের সাহিত্যসেবা দেশসেবারই নামান্তর ছিল; এইরকম একটা বড়ো প্রেরণা তাঁর সাহিত্যকর্মের পিছনে ছিল বলেই না তিনি তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতির অতীত গৌরবের প্রতি এমন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই শ্রদ্ধা নিয়েই তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রাচীন হিন্দুর ইতিহাস, ধর্ম, সভ্যতা, সাহিত্য সবকিছুর আলোচনা এবং অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই মহৎ আকাঙ্ক্ষাই রমেশ-সাহিত্যে আভাসিত; শুধু আভাসিত নয়, ঐকান্তিকভাবে অনুশীলিত। ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্রকে তাই বিস্মৃত হওয়া কঠিন।

আগেই বলেছি, উপন্যাসের ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের ছন্দানুবর্তি। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে অভিনবত্ব সঞ্চার করেন, প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী মোটমুটি সেই ধারাই কথা-সাহিত্যের গতি নির্দেশ করেছিল। এই পর্বের উপন্যাসের লক্ষ্যণীয় ধারা দুটি—ইতিহাস-মিশ্র রোমান্স-নির্ভর আখ্যায়িকা ও সমাজ-সমস্যামূলক উপন্যাস। এই দুটি ধারাই রমেশচন্দ্রের উপন্যাসকে পরিপুষ্ট করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণা ও প্রভাব তাঁর রচনায় সুস্পষ্ট; তবে রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসরচনার আদর্শ স্পষ্ট। তাঁর পথ স্বতন্ত্র। ইতিহাসের মধ্যে তিনি শুধু রোমান্স-রসের অনুসন্ধান করেন নি, অথবা একেই তিনি তাঁর উপন্যাসে চূড়ান্ত করে তোলেন নি। তাঁর রচনা সার্থক হয়েছে অকুণ্ঠ দেশপ্রেমিকতায় আর দেশের লুপ্ত সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টায়। তাঁর প্রথম উপন্যাস-চতুষ্টয়ের কালানুক্রমিক গতির পথ লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব যে, ঐতিহাসিক রোমান্সকে অতিক্রম করে ক্রমাগত

ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার প্রতিই ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্রের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। 'বঙ্গবিজেতা'র ঘটনাকাল ১৫৮০-৮২; টোডরমল্লের তৃতীয়বার বাংলায় আগমনের পটভূমিকায় উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। তাঁর এই প্রথম উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় থাকলেও, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজা টোডরমল্লের চরিত্রটিকে নিতান্তই নিষ্প্রভ মনে হয়। নিষ্প্রভ এবং প্রচ্ছন্ন। অথচ উপন্যাসের ইতিহাস-অংশের নায়ক টোডরমল্ল। তাঁর গুণাবলী ও ব্যক্তিচরিত্রের বর্ণনা লেখক কিছুটা দিয়েছেন, কিন্তু চরিত্রটির অন্তর্জীবন বলে কোনো বস্তুই নেই; এমন কি চরিত্রটিকে যুগজীবনের প্রতিটি স্পন্দনের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়নি। অন্যান্য চরিত্রও তেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেনি। যে কয়টি কাল্পনিক চরিত্র আছে সেগুলির মাধ্যমে আমরা সমকালীন বাংলার সমাজ-জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় খুব বেশি পাই না। 'বঙ্গবিজেতা' অবিমিশ্র রোমান্স, কিন্তু রমেশচন্দ্রের ইতিহাস-আনুগত্য বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে সত্যনিষ্ঠ ও স্পষ্টতর। ইতিহাস,লৌকিক কাহিনী আর কল্পনা—এই নিয়ে বঙ্গবিজেতার আখ্যায়িকা রচিত। ইতিহাসের কোলাহলমুখর আলোকবঞ্চিত রাজপথেই রমেশচন্দ্র পরিভ্রমণ করেছেন, পার্শ্ববর্তি অনভিজাত গলিপথ তাঁর কাছে এক বিস্মৃত-দিনের ছায়াদীর্ঘ কম্পমান যবনিকা বলে মনে হয়েছে। লেখক কৌতূহলী হয়ে সেই যবনিকাপ্রান্ত তুলে ধরেছেন মাত্র, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করেননি। তবে প্রথম রচনায় এই ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় উপন্যাস 'মাধবীকঙ্কণ'-এ রমেশচন্দ্র প্রাথমিক প্রচেষ্টার জড়তাকে অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছেন। ইতিহাস-চিত্রণ ও ঔপন্যাসিক ধর্ম দু'দিক থেকেই 'মাধবীকঙ্কণ' লেখকের উন্নত শিল্পশক্তির পরিচয় বহন করে। বঙ্গবিজেতায় ইতিহাস ম্লান প্রাণহীন, মাধবীকঙ্কণে ইতিহাস প্রাণচঞ্চল ও গতিমুখর—রমেশচন্দ্র এইখানে একটি যথার্থ ঐতিহাসিক আবহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। "সপ্তদশ শতাব্দীর প্রখর মধ্যাহ্নে, সম্রাট শাজাহানের রাজত্বের অন্তিমলগ্নে যে ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রামের প্রলয়ঙ্কর শিখা জ্বলে উঠেছিল, তাকেই মধ্যযুগীয় রোমান্সের দূর-বিসর্পী রহস্যের সঙ্গে সমন্বিত করে রমেশচন্দ্র এক

অসাধারণ যুগচিত্রকেই উদ্ভাসিত করে তুলেছেন।" যদিও অনেক সমালোচকের মতে মাধবীকঙ্কণ মূলতঃ একটি পারিবারিক উপন্যাস, ইতিহাস এর অপ্রধান অংশ, তথাপি এর আখ্যানভাগের পটভূমিকার বিস্তৃতি বিস্ময়কর। "ভাগীরথী তীরবর্তি নিস্তরঙ্গ পল্লীজীবন ও বিলাস-বিভ্রমময় মুঘল রাজধানী দিল্লী, এমন কি মুঘলের রাজান্তঃপুরের বর্ণনা পর্যন্ত অতি সুন্দর। স্বার্থকৌটিল্য, মুঘল হারেমের উচ্ছৃঙ্খল বিলাস, ষড়যন্ত্র-সঙ্কুল রাজনৈতিক জটিলাবর্ত—যুগজীবনের প্রতিটি সত্য রমেশচন্দ্র যেন জাতিস্মরের মতোন বর্ণনা করেছেন।" এক আশ্চর্য হৃদয়াবেগে স্পন্দিত এই উপন্যাসের প্রতিটি অধ্যায়। চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়েও মাধবীকঙ্কণ সফল হয়েছে। পরিবার-জীবনাশ্রিত একটি মনোজ্ঞ কাহিনী ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় বিবৃত হয়েছে এবং সেই কারণেই গল্পবর্ণনা ও চরিত্রায়ন সজীবতা-দীপ্ত হয়ে উঠেছে। সমালোচক ও পাঠক সকলেই রমেশচন্দ্রের এই দ্বিতীয় উপন্যাসটিকে 'of great beauty and wide human interest' বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। এই সাফল্যই পরবর্তি-কালে রমেশচন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করেছিল এর একটি ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করতে; *The Slave Girl of Agra*, বাংলা মাধবীকঙ্কণের হুবহু অনুবাদ নয়, মূল উপন্যাসের সারাংশ নিয়ে রমেশচন্দ্র স্বাধীনভাবেই এই ইংরেজি উপন্যাস-খানি রচনা করেছিলেন। ১৯০৯ সালে লণ্ডন থেকে বইখানি প্রকাশিত হয়েছিল। যাঁদের এই বইখানি পড়বার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরাই লক্ষ্য করেছেন যে, ইংরেজি ভাষার ওপর অধিকার কতদূর প্রগাঢ় হলে পরে, অমন সুন্দর বই লেখা যায়; 'দি স্লেভ গার্ল অব আগ্রা'-র ইংরেজি লিপিকুশলতা যে কোনো ইংরেজ কথা-সাহিত্যিকের ঈর্ষার বিষয় হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্টেটসম্যান, লিভারপুল ডেইলি পোস্ট, ওয়েস্টার্ণ মর্ণিং প্রভৃতি বহু দেশী ও বিদেশী পত্রিকায় রমেশচন্দ্রের *The Slave Girl* উপন্যাসখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেরিয়েছিল এবং কোনো কোনো পত্রিকার সমালোচনায় রমেশচন্দ্রকে বুলওয়ার লিটনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল। তাঁর বঙ্গবিজেতা, জীবন-সন্ধ্যা ও জীবন-প্রভাতেরও ইংরেজি অনুবাদ আছে; অনুবাদ করেছেন রমেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ এবং একমাত্র পুত্র অজয় দত্ত; ইনিও একজন প্রখ্যাত সিবিলিয়ান ছিলেন।

এরপরে উপন্যাস রচনায় রমেশচন্দ্র এক সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। রাজপুতের শেষ স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও মহারাষ্ট্রের নবীন উৎসাহদীপ্ত উত্থান—ভারত ইতিহাসের এই দুইটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় অবলম্বন করে তিনি দুখানি মহৎ উপন্যাস রচনা করলেন। মহৎ এবং বৃহৎ। মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' ও 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' উপন্যাসদুটিতে লেখকের প্রবণতা বিশুদ্ধ ইতিহাসের দিকে। পূর্ববর্তি উপন্যাসদুটির তুলনায় ইতিহাস এখানে সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে, জীবন-সন্ধ্যায় ইতিহাসের প্রাধান্য সবচেয়ে বেশি। ফলে, উপন্যাস দুটিতে উচ্চাঙ্গ শিল্পকর্মের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। এতে উপন্যাসগুণ যদিও দুর্বল বলে প্রতিভাত হয়, তথাপি এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থক অবয়ব এখান থেকেই গড়ে উঠেছে। জীবন-প্রভাত ও জীবন-সন্ধ্যা দুটিই সার্থকতম ঐতিহাসিক উপন্যাসের নিদর্শন। এই বিখ্যাত উপন্যাসদুখানি সম্বন্ধে আরো একটু বলবার আছে। চরিত্র-চিত্রণ অপেক্ষা রমেশচন্দ্র এই উপন্যাসদুটিতে সমগ্রভাবে জাতীয় জীবনের একটি বীরত্ব যুগেরই বর্ণনা করতে চেয়েছেন এবং এই কারণেই উপন্যাসদুটির চরিত্রগুলি তাদের কোনো নিজস্ব রূপ নিয়ে ফুটে উঠতে পারেনি। 'জীবন-সন্ধ্যা'য় ব্যক্তি-চরিত্র বিকাশের সামান্যতম প্রচেষ্টাও নেই। এখানে রমেশচন্দ্র শুধু দেশ ও কালকেই দেখেছেন, যেন একটি জাতীয়-জীবনের পতন-অভ্যুদয় বর্ণনাই তাঁর কাছে মুখ্য হয়ে উঠেছে। উপন্যাসদুখানির উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছেন টডের রাজস্থান-কাহিনী থেকে। ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠ আনুগত্যে শিষ্য রমেশচন্দ্র এই দুটি উপন্যাসে গুরু বঙ্কিমচন্দ্রকেও অতিক্রম করেছেন।

প্রসঙ্গত ঐতিহাসিক উপন্যাস-লেখক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের তুলনা করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, একজনের ইতিহাস-আনুগত্য অন্যজন অপেক্ষা সত্যনিষ্ঠ ও স্পষ্টতর হোলেও, বঙ্কিমের কল্পনা-প্রসারতা ও সৃষ্টি-নৈপুণ্য রমেশচন্দ্রে একেবারেই অনুপস্থিত। চরিত্র-চিত্রণে ও অন্তর্জীবনের রহস্য উদঘাটনে বঙ্কিমচন্দ্র যে অপূর্ব শিল্প-সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন রমেশচন্দ্র তা পারেন নি। সে প্রতিভা তাঁর ছিল না। বাস্তবজীবনের সঙ্গে মানব-নিয়তি ও দুর্নিরীক্ষ্য রহস্যকে রমেশচন্দ্র কোথাও একসূত্রে যুক্ত

করতে পারেন নি—এইখানেই বঙ্কিমের অসাধারণ কৃতিত্ব। বঙ্কিমচন্দ্রের অশান্ত জীবন-জিজ্ঞাসা, কবি-কল্পনার মহিমাদীপ্ত ঐশ্বর্য ও উচ্চতর ট্র্যাজেডির মহৎ সমুন্নতি রমেশচন্দ্রের পক্ষে অনায়ত্তই ছিল। তথাপি বাংলাসাহিত্যের সার্থকতম প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস-রচয়িতা হিসেবে রমেশচন্দ্রের নাম স্মরণীয়। তাঁর রচনায়, স্কটের মতোই ইতিহাস ও উপন্যাস একসূত্রে বিধৃত আর সেই সঙ্গে উদ্দীপ্ত হয়ে আছে তাঁর সুগভীর স্বদেশপ্রীতি। উভয়ের জীবিতকালেই 'বেঙ্গলি' পত্রিকায় একবার বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের ঔপন্যাসিক প্রতিভা সম্পর্কে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল; ঐ প্রবন্ধে তাঁদের উভয়কেই "as the only two writers of fiction who have risen to distinction and fame" এই বলে অভিহিত করা হয়েছিল। উক্ত সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়েছিল এবং রমেশচন্দ্র সম্পর্কে বলা হয়েছিল:

"But in one respect at least Romesh Chunder excels all living writers in Bengal. The singleness of aim, earnestness of purpose, a manly devotion to duty, a burning and and zealous enthusiasm in its performance; these high notions illumine every work and almost every chapter of the young and enthusiastic writer."*

'হিন্দুপেট্রিয়ট' পত্রিকাতেও 'জীবন-প্রভাত'-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে ঠিক এইরকম তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছিল। বস্তুতঃ তখনকার দিনে বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র এই দুজনকেই বাংলা সাহিত্যের প্রধান (Major) ঔপন্যাসিকের স্থান দেওয়া হোত

রমেশচন্দ্রের মধ্যে একটি সমাজসচেতন মন ছিল। দেশের অতীত গৌরবের অনুশীলনেই তাঁর প্রতিভা নিঃশেষিত হয়নি, দেশের বর্তমান কাল সম্বন্ধেও তিনি বেশ সচেতন ছিলেন। এর স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন তাঁর দুটি সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস ও সামাজিক

* The *Bengalee*, 15th March, 1879.

উপন্যাস রচনার মধ্যে বেশ কয়েক বছরের ব্যবধান ছিল। ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম সামাজিক উপন্যাস 'সংসার' এবং এর আট বছর পরে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় সামাজিক উপন্যাস 'সমাজ'। 'সংসার' প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র পরিচালিত 'প্রচার' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসেবার তৃতীয় পর্বে 'প্রচার পত্রিকা প্রকাশিত হয়, এর সম্পাদক ছিলেন তাঁর জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই উপন্যাসদুটিতে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র জীবনের অতীত-ভূমি থেকে বর্তমানের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করেছেন আর চলমান জীবধারাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ঐতিহাসিকের নিষ্ঠা ও বোধ নিয়ে। ফলে, সামাজিক জীবন-চিত্র হিসেবে এই উপন্যাসদুটি পূর্ণাংগ নিখুঁত হয়েছে। শিল্পি-মনের সহজ সহৃদয়তাও এখানে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। উপন্যাসের কাহিনীদুটিতে সরসতার অভাব নেই, কিন্তু সংসক্তি অপেক্ষাকৃত কম। 'সংসার' পশ্চিম বঙ্গের গ্রাম্য জীবনকথা। পশ্চিম বাংলার চাষীজীবনের নিখুঁত চিত্র সম্ভবত প্রথম আঁকেন রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তাঁর *Bengal Peasant Life* বইতে। রমেশচন্দ্রের পথপ্রদর্শক ছিলেন দে সাহেব, এ-কথা বলা যায়। 'সংসার' উপন্যাসখানি রমেশচন্দ্র উৎসর্গ করেছেন স্মরণীয় তিনজন বাঙালি সন্তানের নামে— রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র। এর থেকে বুঝা যায় যে, এই তিন মনীষির সমাজচিন্তার অনুসারী ছিলেন তিনি। 'সমাজ' প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সালে। বই আকারে প্রকাশিত হবার আগে 'সমাজ'-এর কিছু অংশ সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই বইখানি তিনি উৎসর্গ করেন আরো তিনজন বাঙালি সন্তানের নামে— মধুসূদন, অক্ষয় দত্ত আর দীনবন্ধু মিত্র। এই ছয়জন বাঙালিকেই রমেশচন্দ্র 'মহাত্মা' বলে অভিহিত করেছেন।

রমেশচন্দ্র শুধু ঐতিহ্যবাদী ছিলেন না, একজন সংস্কারকও ছিলেন। তাঁর সময়ে দুইটি সমাজ আন্দোলনের প্রচণ্ড স্রোত বাংলার সমাজজীবনের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে—একটি বিধবা-বিবাহ আন্দোলন, অপরটি অসবর্ণ বিবাহ প্রচেষ্টা। প্রথমটির প্রবর্তক ছিলেন বিদ্যাসাগর আর দ্বিতীয়টির পরিচালক ব্রাহ্মসমাজ। সমাজে নতুন যুগ এসে গিয়েছে, যুগচেতনা নিয়ে এসেছে নতুন

জীবনবোধ। রমেশচন্দ্র তাই এই দুটি আন্দোলনেরই সার্থকতা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। সেই অনুভূতিরই প্রকাশ 'সংসার' ও 'সমাজ'। ১৮৮ সালের প্রথমভাগেই রমেশচন্দ্র দু'বছরের ছুটি নিয়েছিলেন; তেরো বছর একাদিক্রমে চাকরি করার পর সেই প্রথম তিনি অবকাশসুখ উপভোগ করেন কিন্তু নামেই মাত্র অবকাশ—ছুটির অবসরে তিনি দুটি বৃহৎ সাহিত্যকর্মে হস্তক্ষেপ করেছিলেন; একটি হোলো ঋগ্বেদের বাংলা অনুবাদ আর অপরটি হোল 'সংসার' উপন্যাস প্রণয়ন। সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে রমেশচন্দ্র আমাদের শান্ত নিরুদ্বেগ পল্লীজীবনের সুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখকের বিশ্লেষণ খুব গভীর নয়, কিন্তু পল্লীগ্রামের চিত্র ও চরিত্রগুলির মধ্যে মোটামুটি একটি নম্র-সুন্দর মাধুর্য ও স্বাভাবিকত্ব আছে। 'সংসার' উপন্যাসে বিধবা বিবাহ এবং 'সমাজ' উপন্যাসে অসবর্ণ বিবাহের কথা আছে। শেষোক্ত উপন্যাসটি কিছুটা প্রচার-ধর্মী, লেখকের শিল্প-দৃষ্টি তাই এখানে আচ্ছন্ন দেখা যায়। তথাপি একজন বিশিষ্ট সমালোচকের মতে এই দুটি উপন্যাসে রমেশচন্দ্র ইতিহাসের ঘটনাবৈচিত্র্য ও উদ্দাম কোলাহল থেকে বহুদূরে ফিরে এসে শান্ত পল্লীজীবনের যে সুন্দর, সরস, সহানুভূতিস্নিগ্ধ চিত্র এঁকেছেন তা বাংলা উপন্যাসে সুলভ নয়। রমেশ-প্রতিভা এই দুটি উপন্যাসে নতুন শক্তির পরিচয় দিয়েছে।

এখানে একটি প্রশ্ন আছে। পরিণত বয়সে রমেশচন্দ্র সামাজিক উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হলেন কেন? একটি কারণ অনুমান করা যেতে পারে যে ইতিমধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ জাতের উপন্যাস রচনার পথ দেখিয়েছেন। কিন্তু এটা বাহ্য। তখন একটা প্রচণ্ড সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়েছে বাংলা দেশে এবং অদূর ভবিষ্যতে তার পরিধি যে সর্বভারতীয় হিন্দু সমাজে পরিব্যাপ্ত হবে এটা রমেশচন্দ্রের দূরদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। এ বিষয়ে তাঁর নিজের অভিমত খুবই সুস্পষ্ট। তিনি লিখেছেন: 'On principle inter caste marriage is a duty with us, because it unites the divided and enfeebled nation, and we should establish this principle (as well as widow marriage etc.) safely and securely in our little society, so that the greater Hindu

society, of which we are only a portion and the advanced guard, may take heart and follow." এই বলিষ্ঠ মানসিকতাই রমেশচন্দ্রকে নিঃসন্দেহে এই দুঃসাহসিক সাহিত্যকর্মে প্রবৃত্ত করেছিল। দুঃসাহসিক বলছি এই কারণে যে, তাঁর সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র বিধবাবিবাহের বিপক্ষে ছিলেন এবং বিষয়টি আইনতঃ স্বীকৃত হোলেও সমাজে গৃহীত হয়নি। সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগরের প্রতি রমেশচন্দ্র কী গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন সে-কাহিনী সুবিদিত। তাই তো তিনি বিধবাবিবাহ বিষয়টিকে শুধু উপন্যাসের উপজীব্য করে ক্ষান্ত হন নি—একে জানালেন তার অকুণ্ঠ সমর্থন। শরতের মায়ের গুরুদেবের মুখ দিয়ে রমেশচন্দ্র যেখানে বলিয়েছেন: "মা, একদিন আমি বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের সহিত বিধবাবিবাহ লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছিলাম, অনেক কলহ করিয়াছিলাম, তখন আমি শাস্ত্রবিদ্যাভিমানী ছিলাম। কিন্তু মা, বাল্যকাল হইতে সেই পণ্ডিতশ্রেষ্ঠকে আমি জানি, তিনি ভ্রান্ত নহেন, প্রবঞ্চকও নহেন, তাহার কথাটি প্রকৃত। বিধবাবিবাহ সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে"*—সেখানে তিনি বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রবর্তকের প্রতি তার অন্তরের শ্রদ্ধাই নিবেদন করেছেন। এই প্রসঙ্গে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই অশ্রদ্ধেয় উক্তিটি স্মরণীয়। আর অসবর্ণ বিবাহ নিয়ে তখন সবেমাত্র আলোচনা শুরু হয়েছে এবং সে আলোচনাও ছিল ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কাজেই এ বিষয়ে হিন্দুসমাজের একজন বিশিষ্ট সন্তান হিসেবে সমাজচেতনায় আরো একটু অগ্রসর হয়ে রমেশচন্দ্র তার বিপ্লবী মনের পরিচয় দিলেন এবং উপন্যাসের মাধ্যমে নির্দেশ দিলেন যে, অসবর্ণ বিবাহ একটি কর্তব্য। সংসার ও সমাজের রমেশচন্দ্র আর বঙ্কিমের দ্বারা প্রভাবিত নন; এখানে তাঁর চিন্তাসূত্র নিজস্ব; এমন কি এখানে তিনি বঙ্কিম-বিরোধী। হিন্দুশাস্ত্র ও ঐতিহ্যের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও রমেশচন্দ্র যে এইরকম দুঃসাহস সেদিন দেখাতে পেরেছিলেন, তার মূলে সক্রিয় ছিল যুগচেতনা। বঙ্কিম এই যুগচেতনাকে এড়িয়ে গেছেন, রমেশচন্দ্র তাই গুরুকে পিছনে রেখে এক ধাপ অগ্রসর হলেন। পরিবর্তিকালে রমেশচন্দ্র ইংরেজিতে 'সংসার' উপন্যাসের সার সংকলন করে *The Lake of Palms* নাম দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। বিলাতে স্পেক্টেটর,

* সংসার: ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পল-মল গেজেট, গ্লাসগো হেরাল্ড প্রভৃতি পত্রিকায় এর বহু প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বের হয়েছিল। গুজরাটি ভাষায়ও 'সংসার' উপন্যাসের একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। অনুবাদ করেছিলেন শারদা দেবী; ইনি একজন গুজরাটি মহিলা।

রমেশচন্দ্রের সাহিত্যসাধনা সম্পর্কে আর বেশি বলার নেই। যে প্রেরণা বঙ্কিমের সাহিত্যসাধনার মূলে ছিল, সেই দেশভক্তি রমেশচন্দ্রের সাহিত্যকর্মের মূল কথা। রামমোহন থেকে রমেশচন্দ্র, উনিশ শতকের বাংলার প্রত্যেক চিন্তানায়কের কর্মকৃতির মূল উৎসই ছিল স্বদেশ-বাৎসল্য। রমেশচন্দ্রের ক্ষেত্রে তাঁর সকল রকম সাহিত্যকর্ম ও সমাজ-চিন্তার মধ্যে, এমন কি তাঁর রাষ্ট্রনীতিক ও আর্থনীতিক চিন্তার মধ্যেও একটি জিনিস দীপ্যমান। সেটি তাঁর অপরিমেয় স্বদেশানুরাগ। তাঁর জীবনের লক্ষ্য, এক কথায় বলতে গেলে, অতীত মহিমার পুনরুদ্ধার এবং সংস্কারের দ্বারা সমকালীন সমাজকে সুস্থ ও সক্রিয় করে তোলা। সাহিত্যের মাধ্যমে তিনি এই লক্ষ্যসাধনে তৎপর ছিলেন এবং এই কথা বলবার দিন আজ এসেছে যে, রমেশচন্দ্র দত্তের সাহিত্যপ্রয়াস বাংলা-দেশের নবজাগরণ তথা এর সর্বাত্মক উন্নতিকে অনেকখানি ত্বরান্বিত করেছে। বাংলা সাহিত্যে রমেশচন্দ্রের দানকে তাই বিস্মৃত হওয়া কঠিন।

॥ ছয় ॥

সব্যসাচী সাহিত্যস্রষ্টা রমেশচন্দ্র।

ইংরেজিতে যাকে বলা হয় prolific writer, তিনি ছিলেন সেই শ্রেণীর লেখক। তাঁর লেখনীর বিরাম ছিল না। প্রতিভাও ছিল তাঁর সর্বতোমুখী। তাঁর সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের পরিচয় দিয়েছি, এইবার তাঁর মনন সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করব। গুরুদায়িত্বপূর্ণ সরকারী কর্মে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন; যে দীর্ঘকাল তিনি কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন সেইসময়ে প্রশাসনিক ব্যাপারে তাঁকে কত মূল্যবান রিপোর্ট রচনা করতে হয়েছে। কিন্তু ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে, সেই অবস্থার মধ্যে থেকেও ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় তিনি কি বিপুল পরিমাণ সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন। বাঙালির পরম সৌভাগ্য যে, কি বঙ্কিমচন্দ্র, কি রমেশচন্দ্র, কেউ-ই শুধু সরকারী নথিপত্র রচনা করে তাঁদের প্রতিভা নিঃশেষ করেন নি। তাঁদের জাগ্রতচিত্ত বহু দিকে ধাবিত হোত; দেশকে, জাতিকে তাঁদের যা যা দেবার ছিল, সেসব তাঁরা পরিপূর্ণভাবেই দিয়ে যেতে পেরেছেন।

রমেশচন্দ্রের মনন সাহিত্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়: এক, অনুবাদ; দ্বিতীয়, মৌলিক রচনা। তাঁর অনুবাদ পুস্তকগুলির মধ্যে 'ঋগ্বেদ সংহিতা' সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। সমগ্র ঋগ্বেদের বাংলা অনুবাদ এতে তিনি দিয়েছেন। ১৮৮৫ সালে বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন অনুবাদকার্য অসম্পূর্ণ ছিল। ঋগ্বেদ সংহিতার নামপত্রটি (Title page) এইরূপ:

ঋগ্বেদ সংহিতা

মূল সংস্কৃত হইতে

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক

বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত।

প্রথম অষ্টক

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের পক্ষে মুদ্রিত

১৮৮৫

এই গ্রন্থখানি রমেশচন্দ্র তাঁর পিতামাতার নামে উৎসর্গ করেছেন। ঋগ্বেদের অনুবাদের নেপথ্য প্রেরণা ছিলেন বিদ্যাসাগর। এই কর্মে যখন তিনি আত্ম-নিয়োগ করেন তখন রমেশচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছ থেকে বিশেষ উৎসাহ, প্রেরণা ও সহায়তা পেয়েছিলেন, এ-কথা তিনি বলেছেন পুস্তকের ভূমিকায়। সমকালীন বাংলার এই পুরুষসিংহের প্রতি রমেশচন্দ্র গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন; বিদ্যাসাগরও রমেশচন্দ্রের প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও দেশপ্রীতির পরিচয়ে যারপরনাই মুগ্ধ ছিলেন, এবং অনুজের তুল্যই তিনি তাঁকে স্নেহ করতেন; ডাকতেন 'রমেশ' বলে। রাজকার্যের অবসরে যখনই তিনি কলকাতায় আসতেন তখনই তিনি শত কাজ ফেলে আগে এসে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তাঁর চরণধূলি স্পর্শ করে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। তিনি নিজেই বলেছেন: "আমি ইতিপূর্বে মধ্যে মধ্যে তাঁহার (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর) সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতাম।" বিদ্যাসাগরের জীবনের শেষভাগে রমেশচন্দ্র তাঁর সান্নিধ্যে আসেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরীর অনেকটা ভেঙে গেছে। তথাপি রমেশচন্দ্র ঋগ্বেদের অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছেন জেনে তিনি তাঁকে একদিন বলেছিলেন: "ভাই, উত্তম কাজে হাত দিয়াছ, কাজটি সম্পন্ন কর।"

উত্তম কাজ ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সংরক্ষণশীল হিন্দুসমাজের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হোল। বিলাতফেরৎ সিবিলিয়ান এবং জাতিতে কায়স্থ রমেশ দত্ত করবেন আর্যজাতির সুপবিত্র বেদের অনুবাদ! ধর্মব্যবসায়িদের উদ্বেগের সীমা রইল না। উদ্বেগের কারণ, সরল বঙ্গভাষায় বেদের সহিত পরিচয় লাভ করলে পরে সকলেই "প্রকৃত হিন্দুয়ানী ও হিন্দুধর্ম লইয়া ভণ্ডামীর বিভিন্নতা" বুঝতে পারবেন। তথাপি এই দুঃসাহসিক কর্মে প্রবৃত্ত হলেন রমেশচন্দ্র। বস্তুত বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের পর বাংলাদেশে, এই অনুবাদকে কেন্দ্র করে এমন প্রচণ্ড সাহিত্যিক বিতর্ক সেযুগে আর দেখা যায়নি। বই মুদ্রিত হয়ে বেরুবার আগেই সনাতনী হিন্দুদের মনোভাব কি রকম ছিল তা তাঁর জীবনীকার এইভাবে বর্ণনা করেছেন: "Furious articles appeared week after week in vernacular newspapers, sarcasm or invective was poured on the devoted head of the daring

translator ; and the translation itself was condemned and vilified before it had appeared in print !" এই প্রবল প্রতিবাদের বিরুদ্ধে রমেশচন্দ্র বীরের মতই দাঁড়িয়ে তাঁর অভীষ্ট কার্য সম্পন্ন করেছিলেন। ১৮৮৫ সাল শেষ হবার আগেই সনাতনী হিন্দু সমাজকে বিস্মিত করে বেরুল তাঁর ঋগ্বেদের অনুবাদের প্রথমভাগ, আর বেরুবার সঙ্গেসঙ্গেই তা নিঃশেষিত হয়ে গেল। বিরুদ্ধবাদীরা তো রীতিমতো হতমান এই দেখে। তারপর ১৮৮৬ সালের প্রথমভাগে তাঁর য়ুরোপ যাত্রা কররার আগেই সম্পূর্ণ অনুবাদ ছাপাখানায় চলে গেল। বাংলাভাষায় ঋগ্বেদের অনুবাদ এই প্রথম, ভারতবর্ষের যে কোনো আঞ্চলিক ভাষাতেও প্রথম। এই সুকঠিন ও ব্যয়বহুল কাজের জন্য বাংলা সরকার রমেশচন্দ্রকে সহায়তা করেন, মুদ্রণের ব্যয়ভার অনেকাংশে বহন করেন। ১৮৮৫, ১০ই ডিসেম্বর তারিখের 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় ঋগ্বেদের অনুবাদ সম্পর্কে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছিল দেখা যায় :

RIG VEDHA SANHITA

Complete Bengali Translation in 8 Volumes

By

R. C. Dutt, C. S.

Advance subscription Rs. 5 for Translation, or Rs, 8 for Sanskrit and Translation,

Apply to Translator, 20, Beadon Street, Calcutta.

First Volume (Ashtaka) out.

বিজ্ঞাপনে দেখা যায় যে, অনুবাদকের ঠিকানা দেওয়া হয়েছে ২০নং বিডন ষ্ট্রীট। উহাই তখন ছিল কলকাতায় রমেশচন্দ্রের নতুন বাড়ি। পৈতৃক বসতবাড়ির বাইরে এসে সেই তখন তিনি তাঁর প্রথম নিজস্ব বাসভবন তৈরি করেছেন। কিন্তু এখানে তিনি দীর্ঘকাল বাস করেন নি। তাঁর মেয়েরা পিয়ানো বাজিয়ে গান করত, এবং তারা কখনো ফিটন গাড়ি চড়ে আবার কখনো বা ঘোড়ায় চড়ে বিকেলবেলায় ময়দানে হাওয়া খেতে বেরুত। প্রতিবেশীদের বেশির ভাগই ছিলেন সংরক্ষণশীল হিন্দু। তাঁরা এতে আপত্তি জানিয়েছিলেন। অগত্যা বাধ্য হয়ে রমেশচন্দ্র হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটে আর একটি নতুন বাড়ি তৈরি করে উঠে যান।

রামমোহনের পর হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যায় যে তিনজন মনীষি প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিতীয়জন বঙ্কিমচন্দ্র আর তৃতীয় ব্যক্তি রমেশচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্য-সাধনার তৃতীয় পর্বে এই বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হয়েছিলেন; রমেশচন্দ্রকে উহা বিশেষভাবেই অনুপ্রাণিত করে থাকবে। সেই অনুপ্রেরণার ফল ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ। এই বিরাট কাজ একজনের প্রচেষ্টায় হবার নয়, এইজন্য রমেশচন্দ্রকে কয়েকজন প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সহায়তা নিতে হয়েছিল, এ-কথা তিনি ভূমিকাতেই স্বীকার করেছেন। তবে তাঁর স্বাভাবিক সংস্কৃত-প্রীতি বড়ো কম ছিল না; বিলাতে সিবিল সার্বিস পরীক্ষার প্রস্তুতিকালে তিনি অধ্যাপক গোল্ডস্টুকারের কাছে সংস্কৃত সাহিত্য বিশেষভাবেই অধ্যয়ন করেছিলেন। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম সংস্করণের ভূমিকাটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হোল:

"ঋগ্বেদের অনুবাদরূপ গুরু কার্যে মাদৃশ ব্যক্তির হস্তক্ষেপ করা ধৃষ্টতা মাত্র। বঙ্গদেশের পণ্ডিতাগ্রগণের মধ্যে কেহ এই বৃহৎ কার্যের ভার লইলে আমি পরম সন্তোষ লাভ করিতাম। অনেকদিন হইল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই গ্রন্থের একটি সুন্দর অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু তাহা শেষ হইল না। পরে কয়েকবৎসর হইল সংস্কৃত কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্র পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী এই কার্য পুনরায় আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাহারপর বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদ করিবার আর কোনও চেষ্টা করা হয় নাই; শীঘ্র যে হইবে তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

"এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বে আমি বঙ্গদেশের অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই উদারপ্রকৃতি মহোদয় কেবল যে আমাকে এই কার্য সম্পাদন করিতে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন এমন নহে, তিনি নিজে আমার অনুবাদটি দেখিয়া দিবেন এরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন। তাঁহার শরীরের অসুস্থতাবশতঃ তিনি সেটি করিতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহার নিকট আমি যে উৎসাহ ও উপদেশ পাইয়াছি সেজন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষরূপে ঋণী আছি। এখনও সময়ে সময়ে আমার আবশ্যক হইলেই তাঁহার নিকট উপদেশ ও সহায়তা প্রাপ্ত হইতেছি।

"সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ও আমাকে এই কার্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও উপদেশ দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমার এই অনুবাদটি কতক কতক দেখিয়া দিয়াছেন; এবং এই গুরু কার্যে আমার যখন যেরূপ সহায়তা আবশ্যক হইবে সেইরূপে আমায় সহায়তা করিবেন, এই আশ্বাসবাক্য দ্বারা আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রাখিয়াছেন।

"সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকটও যথেষ্ট সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। হরপ্রসাদবাবু সংস্কৃতভাষা ও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রসমূহে কৃতবিদ্য; তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ও 'শাস্ত্রী' উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া পণ্ডিতবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সহিত অনেক প্রাচীন শাস্ত্রালোচনা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। তিনি এই বৃহৎ কার্যে প্রথম হইতে আমায় বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহার সহায়তা ভিন্ন আমি এ গুরু কার্য সমাধা করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ।

"আমার ভূতপূর্ব শিক্ষাগুরু এবং পরম সুহৃদ শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে এই বৃহৎ কার্যে সহায়তা করিতেছেন। তিনি সংস্কৃতভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং সংস্কৃতশাস্ত্রে পারদর্শী। তাঁহার সহায়তায় আমি এই কার্যে যে কতদূর উপকার লাভ করিয়াছি তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। সংস্কৃত কলেজের শ্রীআলোকনাথ ন্যায়ভূষণ মহাশয়ও আমায় সাহায্য করিতেছেন।

"আমার অনুবাদে যদি কোনও গুণ থাকে, তাহা উপরিউক্ত পণ্ডিতদিগের উপদেশ ও সহায়তায়, আমার নিজের গুণে নহে। তবে আমি এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে সায়ণাচার্যের টীকার সহায়তায় ঋগ্বেদের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে আমি পরিশ্রমের ত্রুটী করি নাই। আমার যতদূর সাধ্য, ঋগ্বেদের প্রকৃত অর্থটি পাঠকদিগকে দিতে যত্নবান হইয়াছি।"

ভূমিকায় সাহায্য ও উপদেশ পাওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভঙ্গি থেকে রমেশচরিত্রের একটি বিশেষ দিকের সঙ্গে আমরা পরিচয় লাভ করি। সেটি হোল তাঁর বিনম্র স্বভাব। "পরিশ্রমের ত্রুটী করি নাই"—এ-কথাটিও লক্ষ্য-করবার মতোন। একহাজার তিনশত সত্তর পৃষ্ঠায় এই বিপুলায়তন গ্রন্থের

পাতায় পাতায় রমেশচন্দ্রের মনীষাও বিপুল পরিশ্রমের স্বাক্ষর বিদ্যমান। এই একখানি গ্রন্থই তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট। অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে প্রায় প্রতি পাতায় অসংখ্য পাদটীকা; এইসব পাদটীকায় তিনি ম্যাক্সমুলার, উইলসন প্রভৃতির গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

চব্বিশ বছর পরে, বাংলা ১৩১৬ সালে, ঋগ্বেদসংহিতার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। রমেশচন্দ্র তখন তাঁর ৯।১ হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটের বাড়িতে বাস করছেন। দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্র থেকে জানা যায় যে, তখন এইটি ৬৩নং বিডন ষ্ট্রীটে অবস্থিত এলম প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এই সংস্করণের ভূমিকায় রমেশচন্দ্র লিখছেন: "চতুর্বিংশ বৎসর অতীত হইল, এই অনুবাদের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকখানি আর পাওয়া যায় না; অথচ এই অনুবাদ ভিন্ন ঋগ্বেদসংহিতার বঙ্গভাষায় অন্য কোন সম্পূর্ণ অনুবাদ নাই। অতএব বঙ্গীয় পাঠকদিগের ব্যবহারার্থ অন্য এই অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।"

রমেশচন্দ্রের এই সাহিত্যকীর্তি আজ লোকলোচনের অন্তরালে অন্তর্হিত হয়েছে—সুদীর্ঘকালযাবৎ বইটি আর ছাপা হয়নি; ছাপবার কথা কেউ চিন্তা করেছেন কিনা সন্দেহ। তাঁর হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থ সম্বন্ধেও ঐ একই অভিযোগ করা যেতে পারে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ অথবা ভারত সরকারের সাহিত্য আকাদমির দৃষ্টি আমি এইদিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করছি। কেন করছি, রমেশচন্দ্রের নিজের কথাতেই আমি এর উত্তর দিলাম। তিনি লিখেছেন:

"জগতের অন্যান্য সুসভ্য দেশে এই গ্রন্থের যথেষ্ট সমাদর ও অনুশীলন আছে। য়ুরোপে রোসেন প্রথম বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টক লাটিন ভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাহার পর ফরাসী পণ্ডিত লাংলোয়া সমস্ত ঋগ্বেদ সংহিতা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। আজ পর্যন্ত তাঁহার অনুবাদ ভিন্ন ঋগ্বেদ সংহিতার সম্পূর্ণ অনুবাদ আর কোন ভাষায় নাই। কিন্তু লাংলোয়ার অনুবাদটি তাঁহার নিজের কল্পনায় বিজড়িত, অতএব দূষিত। এদেশে প্রথম ষ্টিভেনশান পরে রোয়ার মহোদয়গণ বেদের অতি অল্প অংশই ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহার পর যখন আচার্য মক্ষমূলর মূল ঋগ্বেদ সংহিতা সায়ণের টীকা সহিত মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন

উইলসন মহোদয় তাহার একটি ইংরেজি অনুবাদ আরম্ভ করিলেন। উইলসন সাহেবের মৃত্যুর পর কাউয়েল সাহেব সেই কার্যের ভার লইয়াছিলেন। বেনফে মহোদয় ঋগ্বেদের কতক অংশ জার্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।··· কেবল কি আমরা এই আর্যজাতিব আদিগ্রন্থ, এই হিন্দুধর্মের মূল গ্রন্থের পরিচয় গ্রহণে অসমর্থ থাকিব? এটি আমাদেব পৈতৃক ধন, কেবল কি আমরাই এই ধনের সম্ভোগে বঞ্চিত থাকিব?"

ঋগ্বেদসংহিতাব অনুবাদ যে কত সুন্দর ও সাবলীল তাব একটু নিদর্শন এখানে তুলে দিলাম :

৬১ সূক্ত

ঊষাদেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি

১। হে অন্নবতী ধনবতী ঊষা। আমি স্তব কবিতেছি, তুমি প্রকৃষ্ট জ্ঞানবতী হইযা আমাব স্তোত্র গ্রহণ কর। হে সকলের ববণীয়া পুরাতনী যুবতীর ন্যায় শোভমানা ও বহু স্তোত্রবতী ঊষা। তুমি যজ্ঞকর্মাভিমুখে আগমন কব।

২। হে মরণবহিতা চন্দ্রবথা সুনৃতবাক্যোচ্চারণশীলা ঊষা! তুমি শোভমানা হও। যেসকল প্রভূত বলযুক্ত হিরণ্যবর্ণ অশ্ব আছে, তাহাদিগকে সুখে বথে যোজিত কবিতে পাবা যায়। তাহাবা তোমাকে আবাহন করুক।

৩। হে ঊষা! তুমি মরণধর্মরহিত সূর্যেব কেতুস্বরূপ। তুমি ত্রিভুবনাভিমুখে আগমনশীলা। তুমি আকাশে উন্নতা হইয়া রহিয়াছ। হে নবতবা ঊষা! তুমি একপথে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করিয়া চক্রের ন্যায় পুনরাবৃত্ত হও।

বেদ আর্যধর্মের প্রতিপালক ও রক্ষক—রমেশচন্দ্র এ কথা কতদূর বিশ্বাস করতেন তা তাঁর এই রচনাংশের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারা যায়। রমেশচন্দ্র ধর্মের চরিত্র এবং হিন্দুধর্মের প্রাচীনতা সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত আলোচনা এখানে দিয়েছেন :

"ধর্ম জাতির জীবন। ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতগণ আনন্দের সহিত জাতীয় জীবনের উন্নতির সহিত ধর্মের উন্নতি লক্ষ্য করেন, আমরাও আনন্দের সহিত ঋগ্বেদস্বরূপ অঙ্কুর হইতে কিরূপে হিন্দুধর্মস্বরূপ বিশাল বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিব। ফলত ধর্ম যদি জাতির জীবন হয়, তবে সেই বহমান জীবনের সহিত ধর্মও বহিতে থাকে, একস্থানে একরূপে দাঁড়াইয়া থাকে না। যদি ধর্ম জাতীয় জীবনের সহিত পরিবর্তনশীল না হইত তবে জগৎ হইতে এতদিন লোপ পাইয়া যাইত। মৃত, জীবন রহিত, গতি বহিত, ধর্ম লইয়া মনুষ্যের কাজ চলে না, তাহাদিগেব হৃদয়ের আশাগুলি পূর্ণ হয় না। হিন্দুধর্ম যে চারি সহস্র বৎসর ভারতবর্ষে বিবাজ করিতেছে, সে কেবল হিন্দুধর্ম সজীব ধর্ম এইজন্য। হিন্দুধর্ম আমাদিগের জাতীয় উন্নতির সহিত উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, নূতন নূতন রূপে আমাদিগের নূতন নূতন সামাজিক অভাব পূরণ করিয়াছে, আমাদিগেব সুখ দুঃখ, অধীনতায় স্বাধীনতায়, শিক্ষায় ও মূর্খতায়, আমাদিগের সহচর ও সহায় হইয়াছে। হিন্দুধর্মই ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের ধর্ম, তাহার কাবণ এই যে হিন্দুধর্ম সজীব ও উৎকর্ষশীল। মৃত জড় পদার্থ নহে। · ঋগ্বেদের ধর্মই রূপান্তরিত হইয়া পর সময়ের হিন্দুধর্ম হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম যদি গতি বহিত উন্নতি বহিত হইত, তাহা হইলে অন্ত হয় হিন্দুধর্মের সহিত আমাদের স্থিব হইয়া দাঁডাইয়া থাকিতে হইত না হয়, সেই পুবাতন চাবি সহস্র বৎসবেব বন্ধুব নিকট বিদায় লইয়া অগ্রসর হইতে হইত। কিন্তু হিন্দুধর্মেব পুবাতন ইতিহাস দেখিয়া প্রতীয়মান হয যে হিন্দুধর্ম গতি রহিত বা উন্নতি রহিত নহে, আমাদিগেব উন্নতির সহিত উন্নতি লাভ করিবে, জাতীয় জীবনের পবিবর্তনের সহিত পরিবর্তিত হইবে, উৎকর্ষের সহিত উৎকৃষ্ট হইবে, অথচ আমাদর পুরাতন সহচব চিরকাল সঙ্গে থাকিবে। ·· যাঁহারা কেবল সত্য উপলব্ধির জন্য ধর্মের বিশ্বাস আলোচনা করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন প্রাচীন ঋষিগণও একদিনে সত্যলাভ করেন নাই। তাঁহারা দেখিবেন ঋগ্বেদের ঋষিগণ সূর্য ও অনন্ত আকাশকে স্তুতি করিতে করিতে কখন কখন সন্দিগ্ধমনা হইয়াছিলেন। কখনো বৈদিক দেবদিগের উপরে আর একজন দেব আছেন, এইরূপ কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা সত্যলাভের কঠোর পথ একদিনে অতিবাহিত করেন নাই; সে

কঠোরপথে তাঁহারা কিরূপে গিয়াছিলেন, ভ্রান্ত মনুষ্য কত ভ্রম করিয়া সত্য পাইয়াছিলেন, জ্ঞানের আলোচনার সহিত ভারতবর্ষে ধর্মবিশ্বাস কিরূপ ক্রমশ পরিবর্তন ও বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, এইটি বুঝিব আমাদের এই উদ্দেশ্য।”

এই অনুবাদ কার্যে রমেশচন্দ্র বেশির ভাগ স্থলে বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্যকেই অনুসরণ করেছেন এবং এই পন্থা অবলম্বন করে তিনি বিচক্ষণতারই পরিচয় দিয়েছেন। অত্যন্ত সুচিন্তিত পরিকল্পনার স্বাক্ষর আছে এই অনুবাদের প্রতিটি পৃষ্ঠায়। সাধারণ পাঠকদের উপযোগী করে রচিত এই গ্রন্থখানির বিন্যাসপদ্ধতিতে অনুবাদকের যথেষ্ঠ মৌলিকতা পরিলক্ষিত হয়। প্রতি খণ্ডের শেষে বেদোক্ত বিষয়বস্তুর বিস্তারিত সূচীপত্র সন্নিবেশিত হওয়ার ফলে সাধারণ পাঠকদের কাছে বেদের মধ্যে অনুপ্রবেশ সহজ হয়েছে। ‘ইংলিসম্যান’ পত্রিকা তাই এর সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিল: “On the whole we consider the work a very useful publication,” আর ‘বেঙ্গলি’ পত্রিকা লিখেছিল: “The translator of the Vedas has rendered a public service.” বিদেশের মনীষিগণের মধ্যে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার আর কাউয়েল সাহেব দুজনেই রমেশচন্দ্রকে তাঁর এই মহৎ কার্যের জন্য অভিনন্দিত করেছিলেন। ম্যাক্সমুলার লিখলেন: “It must have been a hard piece of work and I congratulate you on having finished it,” আর কাউয়েল সাহেব লিখলেন: “I congratulate you most heartily on your having finished the Bengali translation of the ‘Rig Veda.’ It is an achievement well worth the labour.” শুধু বিদেশের পণ্ডিতসমাজ কর্তৃক তিনি যে অভিনন্দিত হয়েছিলেন তা নয়; স্বদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা রমেশচন্দ্রের এই দুঃসাহসিক মহৎ প্রয়াসের জন্য প্রশংসা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত এখানে উদ্ধৃত হোল। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং তখন হিন্দুজাতির প্রাচীন ধর্ম ও দর্শন নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন; কাজেই তাঁর পক্ষে রমেশচন্দ্রের এই

দুরূহ কার্যের তাৎপর্য বা গুরুত্ব উপলব্ধি করা সহজ ছিল। 'প্রচার' পত্রিকায় ঋগ্বেদ সংহিতার সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন: "বাবু রমেশচন্দ্রের এই সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে অতি উচ্চ প্রশংসা করা অসম্ভব। ঋগ্বেদ সংহিতা অনুবাদ করা বড় সহজ কাজ নয়। যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খতার সহিত নিভুর্লভাবে এবং ক্ষিপ্রতার সহিত তিনি এই কার্য সম্পন্ন করিতেছেন তাহাতে মনে হয় যে, রমেশচন্দ্র যদি য়ুরোপে জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে এই মহৎ কার্যের জন্য তিনি বিপুলভাবে প্রশংসিত হইতেন। কিন্তু এই সব ব্যাপারে আমাদের দেশের জনসাধারণের অনুভূতি স্বতন্ত্র রকমের, তবে আমি আশা করি যে এইজন্য তিনি কিছুমাত্র নিরুৎসাহিত বোধ করিবেন না ..অন্যে যাহাই বলুক, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, তাঁহার এই সুমহতী প্রয়াসের জন্য বাবু রমেশচন্দ্র শাশ্বত খ্যাতির অধিকারী হইবেন। যখন য়ুরোপে আধুনিক ভাষায় খ্রীষ্টধর্মের পবিত্র গ্রন্থ বাইবেল অনূদিত হইয়াছিল তখন রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতগণ ইহার তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলেন। ইহা অসম্ভব নয় যে, রমেশচন্দ্রকেও অনুরূপ প্রতিকুলতার সম্মুখীন হইতে হইবে। কিন্তু য়ুরোপে যেমন বাইবেলের অনুবাদ ধর্ম সংস্কার ও সভ্যতার অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল, ইহা সুনিশ্চিত যে ঋগ্বেদের এই অনুবাদের ফলে আমাদের দেশেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটিবে। বাঙ্গালি জাতি কখনই শ্রীবুত দত্তের এই ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না।" মনীষি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঋগ্বেদের অনুবাদ পাঠ করে এতদূর উল্লসিত হয়েছিলেন যে, তিনি রমেশচন্দ্রকে একখানি পত্র লিখে জানিয়েছিলেন: "প্রিয়বরেষু, আপনার সাদর এবং মূল্যবান উপহার পাইয়া আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নাই। বাঙ্গালি জাতিকে আপনি এক অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিলেন। মৃত্তিকার সুগভীর তলদেশে যে রত্নরাজি এতকাল লুক্কায়িত ছিল তাহা আপনি এক্ষণে বাঙ্গালিজাতির চক্ষুগোচর করিলেন। এই প্রাচীন এবং মূল্যবান সম্পদরাজি নিঃসন্দেহে আমাদের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত, কিন্তু নিঃসন্দেহে আপনার দৌলতেই ইহা আজ পুনরায় আমরা চাক্ষুষ করিলাম।"

অনুবাদ প্রকাশিত হলে পরে একদিন অপরাহ্নে রমেশচন্দ্র বাদুড়বাগানে গিয়ে বিদ্যাসাগরের হাতে একখানি বই দিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন।

রমেশচন্দ্রকে কী বলে আশীর্বাদ করবেন, বিদ্যাসাগর তার ভাষা খুঁজে পেলেন না যেন। তখন তাঁর শরীর অসুস্থ, বিছানায় শুয়েছিলেন। রমেশচন্দ্র প্রণাম করতেই তিনি উঠে বসলেন; বললেন, "রমেশ, তুমি যে একটি কী মহৎ কার্য করিলে, উত্তরকাল তাহার বিচার করিবে। আমি আর কি বলিয়া তোমাকে আশীর্বাদ করিব—তুমি বঙ্গমাতার একটি উজ্জ্বল রত্ন। তুমি দীর্ঘজীবি হও।" স্বদেশের ও বিদেশের বহু প্রশংসা লাভ করলেও, এই একটি মানুষের কাছ থেকে আন্তরিকতাপূর্ণ এমন আশীর্বাদ লাভ করে রমেশচন্দ্র যে সেদিন মনে মনে নিজেকে কৃত-কৃতার্থ জ্ঞান করেছিলেন, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। বিদ্যাসাগরের লাইব্রেরির সহায়তা আর তাঁর অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন বলেই না তাঁর পক্ষে এই পরিশ্রমসাধ্য কার্যে হস্তক্ষেপ করা সহজ হয়েছিল, এ-কথা রমেশচন্দ্র যেমন জানতেন, আর কেউ ততটা জানতেন কিনা সন্দেহ।

আর্যজাতির আদি গ্রন্থ, হিন্দুধর্মের মূল গ্রন্থের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালির পরিচয় সাধন করিয়ে দিয়ে যে সফলতা তিনি লাভ করেছিলেন তা নি সন্দেহে রমেশচন্দ্রের সাহিত্যিক-জীবনের একটি অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়। সফলতা নিয়ে এলো অধিকতর উৎসাহ আর নতুন কর্মশক্তি। এইবার তিনি বিভিন্ন হিন্দু শাস্ত্র-গ্রন্থের সারাংশের বাংলা অনুবাদে হস্তক্ষেপ করলেন। এরই ফল দুইখণ্ডে প্রকাশিত 'হিন্দুশাস্ত্র'—রমেশ-প্রতিভার আর একটি দিক্-চিহ্ন। একদা কলকাতা শহরে যুবক কালীপ্রসন্ন সিংহ যেমন পণ্ডিতদের সহায়তায় মূল মহাভারতের অনুবাদ কার্যে হস্তক্ষেপ করেছিলেন, তার দীর্ঘকাল পরে সেই শতাব্দীর অন্তিমপাদে আর একজন কৃতবিদ্য বাঙালি সন্তান অনুরূপ একটি দুরূহ কার্যে অগ্রসর হলেন। 'হিন্দুধর্ম' গ্রন্থের প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র : শুধু প্রেরণা নয়, তিনিই রমেশচন্দ্রকে এ বিষয়ে যথোচিত সাহায্য-দানেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই সাহায্যদান বলতে বুঝতে হবে literary collaboration এবং মহাভারত অংশের সংকলনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু ১৮৯৩ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হওয়াতে তাঁর এই দায়িত্বপালন অসম্পূর্ণই থেকে যায়। রমেশচন্দ্র এই অনুবাদ কার্যে শুধু

নিজেই ব্রতী হন নি, হিন্দুশাস্ত্রের যে যে বিষয়ে তৎকালীন যে যে পণ্ডিত বিশেষজ্ঞ বলে স্বীকৃত ছিলেন, তিনি সেইসব সুবিজ্ঞ পণ্ডিতদেরও এই কার্যে ব্রতী করিয়েছিলেন। ঋগ্বেদ সংহিতা ও হিন্দুশাস্ত্রের প্রকাশকালের মধ্যে দশ বছরের ব্যবধান দেখা যায়।

হিন্দুশাস্ত্র, প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় রমেশচন্দ্র লিখছেন: "আজ তিন বৎসর হইল, একদিন প্রাতঃস্মরণীয় বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। কথায় কথায় আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বিপুল হিন্দুশাস্ত্র সমূহের সার সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তকরূপে প্রকাশ করা সম্ভব কি না?…বঙ্কিমচন্দ্র উদারমনা, উৎসাহশীল, স্বদেশহিতৈষী লোক ছিলেন। অন্যে যে প্রস্তাবে সঙ্কুচিত হইত, তিনি সেরূপ প্রস্তাব শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। আহ্লাদের সহিত আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, এবং কয়েকজন স্বধর্মপ্রিয় বন্ধুর মত লইবার প্রস্তাব করিলেন।" এই প্রস্তাব অনুসারে, এই ভূমিকা থেকেই আমরা জানতে পারি যে, বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে তৎকালীন শাস্ত্রজ্ঞ কয়েকজন পণ্ডিত একদা সমবেত হন এবং সেখানে রমেশচন্দ্রের প্রস্তাবটি সকলেই সমর্থন করেন। "স্থির হইল যে যিনি যে শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী, তিনি তাহার সার সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিবেন। উৎসাহী বঙ্কিমচন্দ্র নিজে মহাভারত ও ভগবদ্গীতা অংশের সংকলনের ভার লইলেন।"

হিন্দুশাস্ত্র, প্রথম খণ্ডের নামপত্রটি এইরূপ:

হিন্দুশাস্ত্র

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা সঙ্কলিত ও অনুবাদিত।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত।

প্রথম খণ্ড।

পাঁচ ভাগে সম্পূর্ণ যথা—

১। বেদ-সাহিত্য, সঙ্কলনকারী { শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী ও শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

২। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্, „ ঐ ঐ

৩। শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্মসূত্র „ ঐ ঐ

৪। ধর্মশাস্ত্র { শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য
" শ্রীকৃষ্ণপদ বিদ্যারত্ন

৫। ষড়দর্শন " শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ

কলিকাতা,
২৯ নম্বর বীডন ষ্ট্রীট, এলম প্রেসে
শ্রীসুরেন্দ্রকুমার সাহা দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১৩০২ সাল।

প্রথমখণ্ডখানি রমেশচন্দ্র তাঁর 'স্নেহময়ী ভগিনী চমৎকারমোহিনী ও অপরা-াী'-র নামে উৎসর্গ করেন। এই সংকলনেব প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণনা করে ভূমিকার শেষাংশে রমেশচন্দ্র লিখেছেন: "যাঁহারা অল্প আয়তনেব মধ্যে বিপুল শাস্ত্রসমূহের সাবমর্ম জানিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা বালক-বালিকাদিগকে প্রাচীন শাস্ত্র হইতে হিন্দুনীতি শিক্ষা দিতে অভিলায করেন, যাঁহাবা প্রত্যহ শাস্ত্রীয় কথা পাঠ কবিতে এবং শাস্ত্রীয় নীতি ও নিয়ম পালন করিতে বাঞ্ছা করেন, এই গ্রন্থখানি তাঁহাদিগের ব্যবহারোপযোগী হইবে, এইরূপ আমাব ভবসা হয়।" এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য এই যে, এই গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয়, রমেশচন্দ্র তখন কটকের কমিশনার পদে নিযুক্ত হয়েছেন।

এইবার হিন্দুশাস্ত্র: দ্বিতীয়খণ্ডের কথা। দ্বিতীয়খণ্ড আয়তনে অপেক্ষাকৃত বড়ো। এই খণ্ডের ভূমিকায় রমেশচন্দ্র লিখছেন: "প্রায় পাঁচ বৎসর হইল, 'হিন্দুশাস্ত্র' নামক এক অভিনব পুস্তক প্রকাশ ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলাম। অদ্য সেই ব্রত উদযাপন পূর্বক সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি আমার স্বধর্মীদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলাম।" দেখা যাচ্ছে, এই বিরাট কাজটিকে রমেশচন্দ্র ব্রত হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই ব্রতের উদযাপনে তিনি নিজেকে কৃতার্থ বোধ করছেন। 'ব্রত' আর 'কৃতার্থ'—এই কথা দুইটির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে রমেশচন্দ্রের attitude বা, প্রকৃতি। এই নম্রতা আর দৃঢ়তা রমেশ-চরিত্রকে একটি স্বতন্ত্র গৌরব প্রদান করেছে। দ্বিতীয়খণ্ডের প্রকাশকাল চৈত্র, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৯৬ সাল।

তখন বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম উভয়েই গত হয়েছেন। দ্বিতীয়খণ্ডের আখ্যাপত্রটি এইরূপ:

হিন্দুশাস্ত্র

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা সঙ্কলিত ও অনুবাদিত।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত দ্বারা সম্পাদিত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

চারিভাগে সম্পূর্ণ যথা:

৬।	রামায়ণ	সঙ্কলনকারী	শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন
৭।	মহাভারত	,,	শ্রীদামোদর বিদ্যানন্দ
৮।	শ্রীমদ্ভাগবতগীতা	,,	ঐ ঐ
৯।	অষ্টাদশ পুরাণ		(শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী [illegible]কেশ

কলিকাতা:

২৯নং, বিডন ষ্ট্রীট, এলম প্রেসে

শ্রীমতিলাল সিংহ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৩০৩ সাল।

যোগ্য পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা রমেশচন্দ্র এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করেন এবং এই পণ্ডিতমণ্ডলীর নির্বাচন ব্যাপারে তিনি বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েরই সুপরামর্শ লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয়খণ্ডের ষষ্ঠভাগের ভূমিকায় রমেশচন্দ্র লিখছেন: "পণ্ডিতবর শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ইতিপূর্বে মূল সংস্কৃত রামায়ণ এবং তাহার একখানি বিস্তীর্ণ ও সর্বাঙ্গসুন্দর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গদেশে কীর্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদের ন্যায় রামায়ণের উৎকৃষ্ট বঙ্গানুবাদ আর একখানিও নাই। তাঁহার কৃত রামায়ণের এই সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বঙ্গীয় পাঠক মাত্রের নিকটই আদরণীয় হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই কার্য সম্পাদন করিয়া বাঙ্গালী পাঠকদিগের জন্য একখানি অতি আবশ্যকীয় ও উপাদেয় গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং আমাকে যারপরনাই অনুগৃহীত করিয়াছেন।"

এই হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন সংস্কৃত কলেজের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন এবং বিদ্যাসাগর স্বয়ং এঁর পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করতেন। হেমচন্দ্রের পূর্বে আর কেউ রামায়ণের পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদে অগ্রসর হন নি। এই বইখানির পুনর্মুদ্রণ বাঞ্ছনীয়। সেকেলে পণ্ডিত হোলেও হেমচন্দ্রের বাংলা কত সুন্দর ও সাবলীল তা হিন্দুশাস্ত্র, দ্বিতীয়খণ্ডে সন্নিবেশিত রামায়ণের অনুবাদ পাঠ করলেই প্রতীয়মান হয়। এখানে একটু উদ্ধৃতি দিলাম:

"অনন্তর মারীচ রত্নময় মৃগরূপ ধারণ করিয়া সীতাকে লোভ প্রদর্শনের নিমিত্ত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল, এবং কখনো তৃণ, কখন বা পত্র ভক্ষণ করতঃ কদলী বাটিকায় প্রবেশ করিল। এদিকে মদিরেক্ষণা জানকী পুষ্পচয়নে ব্যগ্র হইয়া, কর্ণিকার অশোক ও আম্রবৃক্ষের সন্নিহিত হইলেন, এবং পুষ্পচয়ণ প্রসঙ্গে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে, ঐ মুক্তামণিখচিত রত্নময় মৃগ তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল। তিনি সেই অদৃষ্টপূর্ব মায়াময় মৃগকে বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে সস্নেহে দেখিতে লাগিলেন। মৃগও রামপ্রণয়নীকে দর্শন করিয়া, বনবিভাগ আলোকিত করতঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল।"

সপ্তমভাগের ভূমিকায় রমেশচন্দ্র লিখছেন: "যে ক্ষণজন্মা লেখক ও উৎসাহী সুহৃদের সহযোগীতার উপর নির্ভর করিয়া আমি হিন্দুশাস্ত্র সঙ্কলন কার্যে ব্রতী হইয়াছিলাম, সেই অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এই মহাভারত অংশ সঙ্কলন করিবেন মানস করিয়াছিলেন।... বঙ্কিমচন্দ্রের বিয়োগের পর এ কায আমি কাহার হস্তে ন্যস্ত করিব, এই চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে মদীয় সুহৃদ পণ্ডিতবর শ্রীদামোদর বিদ্যানন্দ মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে কথা-বার্তা হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ এ গুরু কার্যে ব্রতী হইলেন।" এই দামোদর বিদ্যানন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের বৈবাহিক দামোদর মুখোপাধ্যায়। ইনিই কপালকুণ্ডলার উপসংহার 'মৃণ্ময়ী' রচনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর বড়ো পরিচয় গীতার অনুবাদ। সেযুগে এমন বিস্তীর্ণ ও বহু টীকা-সমন্বিত অনুবাদ বিদগ্ধমণ্ডলীর প্রশংসা অর্জন করেছিল। দামোদরবাবুকে দিয়ে রমেশচন্দ্র তাই গীতারও একটি সরল অনুবাদ করিয়েছিলেন। দামোদরের সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে ভূমিকায় বলা হয়েছে: "দামোদরবাবু খ্যাতনামা লেখক, তাঁহার গ্রন্থাদি বঙ্গীয় পাঠকদিগের নিকট সুপরিচিত, তাঁহার রুচি মার্জ্জিত, তাঁহার লেখনী মধুময়ী।"

এই মধুময়ী লেখনীর নিদর্শনস্বরূপ সপ্তমভাগের 'সভাপর্ব' থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিলাম :

"অনন্তর যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে উদ্যত হইয়া অনুজ চতুষ্টয়কে চতুর্দিক বিজিত করিতে প্রেরণ করিলেন। ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব, বিবিধ বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, বিভিন্ন প্রদেশবর্তী রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিলেন এবং সর্বত্র ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অবিসংবাদিত প্রাধান্য সংস্থাপন করিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলে, তদীয় অনুজ্ঞাক্রমে যুধিষ্ঠির অনুজগণের সহিত যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। স্বয়ং মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ঋত্বিকগণ সমভিব্যাহারে যজ্ঞানুষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিলেন। দিগ্দেশীয় রাজন্যগণ, বিপ্রমণ্ডলী, বৈশ্যসমূহ এবং সম্মানার্হ শূদ্রগণও নিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও কৃপাচার্য প্রভৃতি কৌরবাশ্রিত পূজার্হগণ এবং দুর্যোধনাদি কৌরবগণও আমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিলেন। অনন্তর সকলের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলেন।"

দ্বিতীয়খণ্ডের অষ্টমভাগে সন্নিবেশিত হয়েছে গীতা। ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র গীতার অনুবাদও করতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন এবং প্রথম দুটি অধ্যায়ের অনুবাদকার্য সম্পন্ন করেন। অবশিষ্ট অধ্যায়গুলির অনুবাদ করেন তাঁর বৈবাহিক দামোদর মুখোপাধ্যায়। রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত গীতার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন; বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জীবিতকালেই তাঁকে এই অনুমতি দিয়ে গিয়েছিলেন। কৌতূহলী পাঠক এই অনুবাদ পাঠ করলে বঙ্কিম-প্রতিভার আর একটি দিক দেখতে পাবেন।

হিন্দুশাস্ত্রের দ্বিতীয়খণ্ডের নবমভাগে সন্নিবেশিত হয়েছে অষ্টাদশ পুরাণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। অনুবাদকের মধ্যে পণ্ডিত আশুতোষ শাস্ত্রী সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। এর ভূমিকায় রমেশচন্দ্র লিখছেন : "পুরাণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। যে কালে বৈদিক যাগযজ্ঞ ও অনুষ্ঠানাদির নিয়মাবলী বেদের ব্রাহ্মণ অংশে প্রকটিত হয়, যে কালে পরমাত্মা ও পরলোক তত্ত্ব বেদের উপনিষদ্ অংশে নিরূপিত হয়, কুরু ও পাঞ্চালগণ, বিদেহ ও কাশীগণ, যে কালে গঙ্গা ও যমুনা-তীরে নিজ নিজ রাজ্য বিস্তার করিয়া যুদ্ধে শৌর্য, যাগযজ্ঞে ধর্মপরায়ণতা, এবং

শাস্ত্রানুশীলনে মনীষিতা প্রকাশ করেন সেই অতি প্রাচীনকালে ঐতিহাসিক কথা অবলম্বন করিয়া 'ইতিহাস-পুরাণ' নামক গ্রন্থ রচিত হয়।" রমেশচন্দ্রের মতে পুরাণ ইতিহাস। তিনি বলেছেন: "অনেকগুলি পুরাণেই মগধরাজ্যের বিস্তীর্ণ ইতিহাস সন্নিবেশিত আছে এবং চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকরাজার কথা লিখিত আছে। এমন কি খৃষ্টাব্দের পর যে অন্ধ্ররাজগণ মগধে ও দাক্ষিণাত্যে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া রাজ্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কথাও পুরাণসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়।" তবে আঠারোখানি পুরাণের চার লক্ষ শ্লোকের মধ্যে ঐতিহাসিক কথা অতি অল্প, এর বেশির ভাগই পৌরাণিক দেব-দেবীর কথায় পূর্ণ। রামমোহনের চিন্তায় পুরাণ তাই বর্জিত হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায়ও। তবে রমেশচন্দ্র কেন পুরাণের দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন? উত্তর—তিনি সমগ্র আর্যজাতির চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, পুরাণকে বাদ দিয়ে সে পরিচয় যে অসম্পূর্ণ, এ-কথা তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। পুরাণকে বাদ দিয়ে হিন্দুশাস্ত্র হতে পারে না—এই তথ্যটি সেদিনের বাঙালির সামনে নতুন করে তুলে ধরবার প্রয়োজন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণ-চিন্তার যে প্রয়োজনীয়তা ছিল সেদিন, রমেশচন্দ্রের শাস্ত্র-চিন্তারও ঠিক অনুরূপ প্রয়োজনীয়তা ছিল—এই কথাটি আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

বলা বাহুল্য, ঋগ্বেদ সংহিতার প্রকাশের সময় সংরক্ষণশীল ও অনুদার হিন্দু-সমাজ যেমন রমেশচন্দ্রকে ক্ষমার চক্ষে দেখেন নি, 'হিন্দুশাস্ত্র' প্রকাশের কালে এর ঠিক বিপরীত জিনিস পরিলক্ষিত হয়েছিল। সংস্কার-বিরোধী ও সংস্কার-সমর্থক সকল হিন্দুই তাঁর এই মহৎ কাজের জন্য অকুণ্ঠ প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। সংহিতা আর এই বিপুলায়তন হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থ প্রকাশের সমগ্র ব্যয়ভার রমেশচন্দ্রের নিজের ছিল। স্বোপার্জিত বিত্তের এমন সদ্ব্যবহার এ-যুগে আমরা কল্পনা করতে পারি না।

য়ুরোপের জ্ঞান-গরিমায় বিভূষিত ছিলেন রমেশচন্দ্র এবং ছাত্রাবস্থার পরও একাধিকবার তিনি য়ুরোপে গিয়েছিলেন। আহারে-বিহারে ও পরিচ্ছদে তিনি সাহেবই ছিলেন। অত বড়ো একজন কৃতবিদ্য ও সুদক্ষ সিবিলিয়ানের পক্ষে তখনকার দিনে 'সাহেব' হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়, অশোভনও কিছু নয়। দত্তপরিবারের মতন তখনকার দিনে ইংরেজি-জানা পরিবার কলকাতায়

খুব বেশি ছিল না। তথাপি এ-কথা সত্য যে, রমেশচন্দ্র মনেপ্রাণে খাঁটি ভারতীয় ছিলেন, খাঁটি বাঙালি ছিলেন। এবং ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে হিন্দুধর্ম বা বেদ নিয়ে আলোচনা করা আশ্চর্যের কিছু ছিল না। যদিও তাঁর বন্ধু লালমোহন ঘোষ পরিহাস করে তাঁকে বলতেন: "রমেশ, তুমি দেখছি বেদ থেকে আরম্ভ করে ধারাপাত, সব কিছু লিখে গেলে"। সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্তের হিন্দুপ্রীতি আকস্মিক ছিল না, এ জিনিস অতি সঙ্গত এবং স্বাভাবিক কারণেই তাঁর মধ্যে এসেছিল। যুগচেতনা পরোক্ষভাবে রমেশচন্দ্রকে এই কাজে প্রেরণা দিয়েছিল। ঋগ্বেদ সংহিতা আর হিন্দুশাস্ত্র, এই গ্রন্থ দুখানির রচনা ও প্রকাশ-কালটা লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, যে সময়ে বঙ্কিম-রমেশ-প্রতিভা একত্রে হিন্দুধর্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েছে, সেই সময়টা ছিল বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটা কালান্তরের সময়। ১৮৮৫ সালে কেশবচন্দ্রের মৃত্যুতে ব্রাহ্ম সংস্কার-যুগের অবসান আর ঠিক তার পরের বছর রামকৃষ্ণের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নব্য হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান আমরা প্রত্যক্ষ করি। ব্রাহ্ম সংস্কারযুগের ভাবধারা বাঙালির সমাজ ও ধর্মজীবনকে যতখানি সংস্কৃত করা আবশ্যক ততখানি ইতিহাসের তাগিদেই করেছিল। ধর্মে, স্বদেশপ্রেমে, সাহিত্যসেবায় ও মানবীয় চিন্তার উন্মেষসাধনে এই সংস্কারযুগ তার একটা সুস্পষ্ট ছাপ রেখে গিয়েছে, সন্দেহ নেই এবং এর পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের চিন্তাধারা দেশকে, জাতিকে যতটুকু এগিয়ে দেবার তা দিয়েছিল। কিন্তু শতাব্দীর সংস্কারযুগের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে অর্থাৎ ১৮৮৫-তেই দেখা গেল যে, শিক্ষিত বাঙালি আবার স্বধর্মে স্বপ্রতিষ্ঠ হোতে চাইল। সংস্কারযুগের নায়কদের মধ্যে একমাত্র রামমোহন ভিন্ন আর কেউ-ই হিন্দুসভ্যতার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন না কিংবা হবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি। ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি আর উৎকৃষ্ট সংস্কার-প্রণালী—এই দুইয়ের সমন্বয় ব্যতিরেকে জড়তার পাষাণভার থেকে জাতির চিত্তের মুক্তি নেই—এই তথ্যটি রামমোহনই বুঝেছিলেন, তাঁর উত্তরাধিকারিদের মধ্যে না মহর্ষি, না ব্রহ্মানন্দ কেউ-ই এটা বুঝতে পারেন নি। তাই এঁদের জীবনেতিহাসে দেখা যায় যে, এঁরা যেন কতকটা ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে এবং হিন্দুশাস্ত্র বিশেষরূপে অধ্যয়ন না করেই হিন্দুজাতির সংস্কারকার্যে হস্তক্ষেপ করেছিলেন; এঁদের কেউ-ই এই দেশের

প্রাচীন সভ্যতার উপাসক ছিলেন না—তাই এঁরা প্রাচ্য সভ্যতার সঙ্গে প্রতীচ্য সভ্যতাকে মিলাতে পারলেন না—একটা গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে রইল এঁদের ধ্যান-ধারণা আর অনুভূতি। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের প্রয়োজন এইখানেই দেখা দিয়েছিল। এঁদের সাহিত্যপ্রয়াসের মধ্যে আমরা যে একটি মহৎ ব্রতানুচরণ লক্ষ্য করি, সেটা হোল প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার এক-সুন্দর সমন্বয় সাধন। এঁদের কেউ-ই একটিকে স্বীকার করে অন্যটিকে অস্বীকার করবার মানুষ ছিলেন না। এই দুই চিন্তানায়কের সাহিত্যকর্মকে তাই ধর্মাচরণের সঙ্গে অনেকটা তুলনা করা যায়। রমেশচন্দ্রের সাহিত্য-কৃতির মধ্যে থেকে আমরা যে সামঞ্জস্যের শিক্ষা পাই, সংস্কারযুগের অবসানে ইতিহাসের প্রয়োজনেই তা এসে গিয়েছিল।

॥ সাত ॥

নব্য য়ুরোপের ভাবধারায় স্নাত হোয়ে যুবক রমেশচন্দ্র যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন তখন বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে ছিলেন। বঙ্কিম-মানসে তখন থেকেই স্বদেশ ও সমাজের হিতচিন্তার উন্মেষ দেখা যায়। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর বন্ধুপুত্র এবং সেই হিসাবে প্রিয়পাত্র। কথিত আছে, এই সময়ে একবার তিনি এক চিঠিতে রমেশচন্দ্রকে লিখেছিলেন: "রমেশ, ডেপুটির পদ, বাঙালির ইন্দ্রত্ব; তুমি তদপেক্ষা উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত; কিন্তু দেখিও রাজ-সেবা যেন তোমার জীবনের মুখ্য ব্রত না হয়।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপদেশটি যেমন তাঁর হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিল, তেমনি সমকালীন আরেকজন পুরুষসিংহের অনুরূপ একটি উপদেশবাক্যও রমেশচন্দ্রের হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিল। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রমেশচন্দ্রকে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত স্নেহ করতেন—এই কৃতবিদ্য যুবকের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। একবার রমেশচন্দ্রকে তিনি বলেছিলেন, "ভাই, যদি পারো স্বদেশের একখানি ইতিহাস রচনা করিও। আমাদের জাতির ইতিহাস বিদেশীরা প্রণয়ন করিবে, ইহা আমাদের পক্ষে নিতান্ত অগৌরবের বিষয়।" রমেশচন্দ্র যখন মৈমনসিংহ জেলার শাসনভার লাভ করেন তখন তিনি তাঁর সাহিত্যজীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজটিতে আত্মনিয়োগ করতে মনস্থ করেন। সেই কাজ ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস রচনা। এই কাজটি ছিল যেমন ব্যাপক তেমনি শ্রমসাধ্য। সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম জেলার শাসনকার্যের গুরুদায়িত্ব তখন তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছে। ভাবলে বিস্মিত হোতে হয় যে, সেই অবস্থায় রমেশচন্দ্র *A History of Civilization in Ancient India* রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর জীবনচরিতকার রমেশচন্দ্রের এই প্রয়াসকে 'the most ambitious effort of his life' বলে উল্লিখিত করেছেন। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা তাঁর এই অতুলনীয় সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করব।

রমেশচন্দ্রের এই বইখানি প্রকাশিত হবার পর থেকেই সমগ্র ইতিহাস-জগতে ইহা একটি বিশেষ মর্যাদার স্থান লাভ করেছে। সাধারণত ইহা Dutt's *Ancient India* নামেই বিদগ্ধমহলে সুপরিচিত। বইখানি প্রথমে তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের আখ্যাপত্রটি এইরকম ছিল .

A

HISTORY OF CIVILIZATION

IN

ANCIENT INDIA

Based on Sanscrit Literature

BY

ROMESH CHUNDER DUTT

In Three Volumes

Vol 1

Vedic and Epic Ages

Calcutta : Thacker, Spink and Co.

London : Trubner and Co.

1889

(*All rights reserved*)

পিতৃস্নেহের নিদর্শনস্বরূপ রমেশচন্দ্র বইখানির প্রথম খণ্ড তাঁর জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা কন্যাদ্বয়—কমলা ও বিমলার নামে উৎসর্গ করেছেন। পরবর্তিকালে অবশ্য এই তিনটি পৃথক খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হয়। প্রথমখণ্ডের সূচীপত্র থেকে জানা যায় যে, ইহা দুইটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের অধ্যায় সংখ্যা ৭ আর দ্বিতীয় অংশের অধ্যায় সংখ্যা ৯; প্রথম অংশের আলোচ্য বিষয় বৈদিক যুগ আর দ্বিতীয় অংশের আলোচ্য বিষয় মহাকাব্যের যুগ।

আখ্যাপত্র থেকে জানা যায় যে ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের উপর ভিত্তি করেই রমেশচন্দ্র প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কথা এই গ্রন্থখানিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। বইখানির বহুলাংশের বাংলা অনুবাদ ১২৯৭-১৩০০ বঙ্গাব্দের 'নব্যভারত' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেছিলেন শ্রীনাথ দত্ত। রমেশচন্দ্র নিজে এই অনুবাদ দেখে দিতেন এবং সেই কারণে এই অনুবাদ তাঁরই নামে প্রকাশিত হোত। অনুবাদের প্রথম অংশ যখন উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন যে সম্পাদকীয় মন্তব্যটি সংযোজিত হয়েছিল সেটি এখানে উদ্ধৃত হোল: "শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের হিন্দু আর্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস নামক ইংরেজি পুস্তক, বিলাত-প্রত্যাগত বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত মহাশয় অনুবাদ করিতেছেন এবং শ্রীযুক্ত দত্ত মহোদয় সংশোধিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিয়া বর্তমান প্রস্তাব লিখিতেছেন।" এই সংশোধন কাজটিও কম পরিশ্রমসাধ্য ছিল না এবং দেখা যাচ্ছে যে, বাঙালি পাঠক তাঁর এই ইতিহাস পাঠ করে ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হবে, এই আশায় অক্লান্তকর্মা রমেশচন্দ্র অনুবাদ সংশোধনের কর্মে নিজেকে লিপ্ত রাখতে পশ্চাৎপদ হননি। একেই বলে যথার্থ দেশপ্রীতি।

ভূমিকায় দেখা যায় যে, এই বইখানির রচনাকাল ১৮৮৮; এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ সালে। কিন্তু এর প্রস্তুতি চলেছে আরো দশবছর আগে থেকেই। রমেশচন্দ্র তাঁর সংগৃহীত উপাদানরাজিকে ভিত্তি করে তিনখানি ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। সেই পাঠ্যপুস্তক তিনখানির নাম যথাক্রমে, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', *A Brief History of Ancient and Modern Bengal* ও *A Brief History of Ancient and Modern India*; প্রথম বইখানির প্রকাশকাল ১৮৮৯, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বইখানি প্রকাশিত হয় ১৮৯২ ও ১৮৯৩ সালে। রমেশচন্দ্র-কৃত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' বাংলাভাষায় ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ পাঠ্যপুস্তক বলে একদা স্বীকৃতি পেয়েছিল। আঠারো বছরের মধ্যে এই বইটির ষোলটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, দেখা যায়। আখ্যাপত্র থেকে জানা যায় যে 'ভারতবর্ষে আর্যদিগের আগমনকাল হইতে লর্ড রিপোঁর আগমন পর্যন্ত' সময়ের ঘটনাবলী এই পুস্তকে স্থান পেয়েছে। বইটি বাইশটি অধ্যায়ে

বিভক্ত। এর প্রকাশক ছিলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়; তিনি তখন সবেমাত্র ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের (ইনি স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্বনামধন্য পিতা) উৎসাহে এবং অর্থানুকূল্যে পুস্তকপ্রকাশন ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েছেন। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' পুস্তকের ভূমিকায় রমেশচন্দ্র লিখেছেন: "হিন্দু স্বাধীনতাকালের প্রকৃত ইতিহাস নাই—এরূপ একটি কথা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি। কথাটি বড় বিস্ময়কর।...ভারতবর্ষের ইতিহাস ভারতবাসীদিগের অতীত গৌরবের প্রমাণ; ভবিষ্যৎ উন্নতির উপায়।" এই একটিমাত্র উক্তির মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্রের মানসিকতা।

এই পাঠ্যপুস্তকগুলি রচনা করবার সময় রমেশচন্দ্র যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, বৃহত্তর পুস্তকখানি রচনার সময়েও তিনি সেই একই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। অর্থাৎ, একটি জাতির ইতিহাস রচনা করতে হোলে কেবলমাত্র তার রাজনৈতিক পরিচয় লিপিবদ্ধ করলেই যথেষ্ট হয় না, সেইসঙ্গে তার সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, কৃষিকার্য ও বাণিজ্যের পরিচয় দিতে হয় এবং বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে তাদের প্রগতি কি ভাবে সাধিত হয়, তারও ব্যাখ্যা করতে হয়। প্রকৃত ইতিহাসরচনার এই যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, ভারতীয় ইতিহাসলেখকগণের মধ্যে সম্ভবত রমেশচন্দ্র দত্তই সর্বপ্রথম এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি আরো একটি নতুন কথা বলেছিলেন। বক্তিয়ার খিলজির আক্রমণ ও বঙ্গবিজয়ের কাহিনী দিয়ে বাংলার ইতিহাস আরম্ভ হওয়া উচিত নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে মুসলমানদের অভ্যুদয়ের দু'হাজার বছরের কিঞ্চিদধিক কাল পূর্বে যে, আর্যজাতি এই দেশে বাস করতেন ও এই দেশ শাসন করতেন, তাঁদের বিষয়ে হিন্দুছাত্রদিগের কিছুটা জ্ঞান থাকা উচিত। ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকদু'খানিতে পনরটি অধ্যায়ের মাধ্যমে রমেশচন্দ্র হিন্দুযুগ, মুসলমানযুগ ও ইংরেজযুগের ইতিহাস অতি পরিচ্ছন্ন ভাবে এবং প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করেছেন রমেশচন্দ্রের এই পুস্তক দুইখানি এক সময়ে বাংলাদেশের প্রত্যেক স্কুলের পাঠ্যতালিকায় দীর্ঘকাল যাবৎ স্থান পেয়েছিল; যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি এই পাঠ্যপুস্তক দুইখানি রচনা করেছিলেন সেটি তিনি ব্যক্ত করেছেন এইভাবে: "An account of kings

and of wars is useless and barren unless we have also an account of the culture and progress of the people"—ইতিহাস পাঠের ক্ষেত্রে কিশোর-বয়স্ক ছাত্রদের পক্ষে উহা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং সমীচিন। জানি না, কি কারণে পরবর্তিকালে রমেশচন্দ্রের এই সুলিখিত পাঠ্যপুস্তক তিনখানির পঠন-পাঠন বন্ধ হয়ে যায়; বর্তমানে ইহাদের পুনঃপ্রচলন (সংশোধিত আকারে অবশ্য) বাঞ্ছনীয়।

যে কথা বলছিলাম। মৈমনসিংহে এসে রমেশচন্দ্র তাঁর আজীবনের সংকল্পকে রূপায়িত করবার জন্য ব্যস্ত হোলেন। প্রতিদিন দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য পালন করে তাঁর অবকাশ খুবই সামান্য থাকত—তথাপি সেই বিরল অবকাশটুকুও তিনি বৃথা যেতে দিতেন না। ষ্টীমারযোগে যখন তিনি কার্যব্যপদেশে স্থানান্তরে যেতেন তখন তাঁর সঙ্গে থাকত সংস্কৃত পুঁথি আর ইতিহাসের প্রচুর বই। কলকাতা থেকে বিরাট বিরাট বইয়ের প্যাকেট আসতে লাগল, কারণ স্থানীয় গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় Reference গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর জীবনচরিতকার লিখেছেন: "Without a moment to spare during the day he often worked after dinner till past midnight, and sometimes the grey light of the dawn came to him as a surprise, and sent him hastily to bed... The passion of writing a history of his own country, impelled him to his labours, and the book at last appeared in three volumes." এমনি নিষ্ঠা ও পরিশ্রম আমরা আরেকজনকে করতে দেখেছি—তিনি রাসায়নিক প্রফুল্লচন্দ্র রায়। হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস প্রণয়নে এই মনীষিও তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ বৎসরকাল অতিবাহিত করেছিলেন। রমেশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র এই আত্মবিস্মৃত জাতির লুপ্ত গৌরবকে নতুন করে তুলে ধরবার জন্য স্ব স্ব ক্ষেত্রে যে পরিমাণ কৃতিত্ব ও নিষ্ঠা দেখিয়েছেন এজন্য ভারতবাসী চিরকাল তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। প্রসঙ্গত একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য। লণ্ডনে যখন তাঁরা তিন বন্ধুতে সিবিল সার্বিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তখন ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গিবনের সঙ্গে রমেশচন্দ্রের প্রথম পরিচয়। গিবনের বই পাঠ করে যুবক রমেশচন্দ্র শুধু মুগ্ধই হন নি,

মনে মনে তাঁকে তিনি গুরুর পদে বরণও করে নিয়েছিলেন। তারপর রমেশচন্দ্র যখন ঋগ্বেদ সংহিতার বাংলা অনুবাদ কার্যে লিপ্ত হলেন তখন থেকেই তিনি ভারতবর্ষের অতীতের সঙ্গে পরিচিত হলেন—প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন কবতে গিয়ে রমেশচন্দ্র যেন ভারতেব প্রাচীন সভ্যতার মুখোমুখি দাঁডালেন। একদিকে গিবনের ইতিহাস, অন্যদিকে সংস্কৃত সাহিত্য—এই দুইটি বিষয় রমেশচন্দ্রের কল্পনাকে গভীব ভাবেই যে উদ্দীপ্ত করেছিল, ইহা সহজেই অনুমেয়। সেই উদ্দীপনাব সার্থক পরিণতি—'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস'। সংস্কৃত সাহিত্যের উপর ভিত্তি কবে তিনি ভারতবর্ষেব প্রাচীন সভ্যতার একটি প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করবেন, এই উদ্দেশ্যে উপকরণাদি সংগ্রহের প্রাথমিক কার্য তিনি তখন থেকেই শুরু করে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়; এইসব সংগৃহীত উপাদান নিয়ে 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' পত্রিকায় মাঝে মাঝে প্রবন্ধও প্রকাশ করতেন। মৈমনসিংহে এসে সেইসব প্রকাশিত প্রবন্ধ, ও সংগৃহীত বিপুল উপাদানরাজিকে সুবিন্যস্তভাবে সাজিয়ে রমেশচন্দ্র রচনা করেন তাঁব যুগান্তকারী গ্রন্থ—'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস'। তাঁর এই কাজের প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন ভগিনী নিবেদিহা। এই প্রসঙ্গে তিনি তাই বলেছেন: "The writing of *Ciıilization in Ancient Iudia* was one of the turning points in his (Ramcsh Chandra Dutt) career. To have begun such a task at all, shows the marvellous energy and courage that was never contended to give a day's labour for a day's bread, but must for ever be doing more than the bond laid down. The task of writing was a task of self-educatıon." এই আত্মশিক্ষাই সেদিন এই আত্মবিস্মৃত জাতির পক্ষে বড়ো প্রয়োজন ছিল। আমরা কত বড়ো ছিলাম, আমাদের অতীত কতখানি গৌরবমণ্ডিত ছিল, তা আমাদেরই আবিষ্কার করে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে, বিদেশীরা এই কাজ করবে না—এই মহৎ প্রেরণাই ছিল রমেশচন্দ্রের এই সুমহৎ প্রয়াসের পিছনে। এই কথাটি আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার।

পাঁচটি বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করে রমেশচন্দ্র আলোচনা করেছেন ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস। বৈদিক যুগ (খ্রীঃ পূর্ব ২০০০ থেকে ১৪০০ বছর); মহাকাব্যের যুগ (খ্রীঃ পূর্ব ১৪০০ থেকে ১২০০ বছর); দার্শনিক যুগ (খ্রীঃ পূর্ব ১০০০ থেকে ২৪২ বছর); বৌদ্ধযুগ (খ্রীঃ পূর্ব ২৪২ থেকে খ্রীঃ পরবর্তি ৫০০ বছব) এবং পৌরাণিক যুগ (খ্রীঃ পরবর্তি ৫০০ থেকে ১১৯৪ বছর)। বলা বাহুল্য, এই যুগ-বিভাগ কাল্পনিক নয়, ইতিহাস-সম্মতই। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে ভারতীয় সভ্যতার উৎপত্তি, বিকাশ ও বিস্তারের ইতিহাস এবং সেই ইতিহাস-পথে একটি প্রাচীন জাতির পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে এই বিপুলায়তন পুস্তকখানির মধ্যে। গ্রন্থেব ভূমিকাটি অত্যন্ত সুচিন্তিত এবং সারগর্ভ। রমেশচন্দ্র যে এই পুস্তক রচনায় কোনো মৌলিক গবেষণার দাবী করেন নি, সে-কথা তিনি ভূমিকাতেই প্রকাশ করেছেন এবং বিভিন্ন সময়ে তাঁর পূর্বসূরিগণ এই ক্ষেত্রে কি করে গিয়েছেন, তারো একটি কালানুক্রমিক পবিচয় তিনি দিয়েছেন। ভূমিকায় সর্বপ্রথমে তিনি স্যর উইলিয়ম জোনস্-এব উল্লেখ করেছেন। ইনিই সবপ্রথম ১৭৮৯ সালে শকুন্তলাব অনুবাদ প্রকাশ করে সমগ্র যুরোপকে চমকে দিয়েছিলেন। এই মনীষির নিকট আমরা যে কতদূর কৃতজ্ঞ তা বলে শেষ করা যায় না। বাংলা তথা ভারতের নবজাগবণের মূলে যে বিদ্বদ্ প্রতিষ্ঠানটির দান অসামান্য সেই এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্যর উইলিয়ম জোনস্। ইনিই প্রথম মনুসংহিতার অনুবাদ করেন। যদিও তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডারে গবেষণা চালিয়েছিলেন, তথাপি, রমেশচন্দ্র বলেছেন—"he did not live long to find what he sought—a clue to India's ancient history without any mixture of fables." স্যর উইলিয়ম জোনস্ প্রধানত বৌদ্ধ-পরবর্তি যুগের সংস্কৃত সাহিত্য নিয়েই অনুশীলন করেছিলেন। তারপর এলেন কোলব্রুক। ইনি উইলিয়ম জোনস্-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। কোলব্রুকের মতোন এত বড়ো প্রাচ্যবিত্তামহার্ণব ইংলণ্ডে আর কেউ জন্মগ্রহণ করেন নি। ইনি একজন বিশিষ্ট গাণিতিক ছিলেন।

এই মনীষি তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেছিলেন ; প্রচীন হিন্দুদর্শনের প্রথম সঠিক বিবরণ তিনিই লিপিবদ্ধ করেন এবং হিন্দু বীজগণিত ও গণিতশাস্ত্র সম্পর্কেও তাঁর আলোচনাই প্রথম। আর্য জাতির ও হিন্দু জাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদের সঙ্গে য়ুরোপের পরিচয়সাধন সর্বপ্রথম তিনিই করেন। তথাপি কোলব্রুকের প্রাচ্যানুশীলনের মধ্যে একটি ক্রটি ছিল। এই বিষয়ে রমেশচন্দ্র লিখেছেন : 'Colebrooke however failed to grasp the importance of the discovery he had made, and declared that the study of the Vedas would hardly reward the labour of the the reader much less that of the translator." এ অভিযোগ মিথ্যা নয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনা করেছেন অনেকেই, কিন্তু তার মধ্যে যে একটা উন্নত জাতির সভ্যতার ইতিহাস রয়েছে, এ-ধারণা অষ্টাদশ, এমন কি উনবিংশ শতকেরও কোনো পাশ্চাত্য গবেষকের মনে উদয় হয়নি। রমেশ-প্রতিভা এই অসাধ্য-সাধনই করেছে।

এই দুই মনীষির পর এলেন ডাঃ হোরেস হেম্যান উইলসন। ইনি কোলব্রুকের পদাঙ্কই অনুসরণ করেন এবং যদিও তিনি ঋগ্বেদ-সংহিতার অনুবাদ করেছিলেন, তথাপি তাঁর প্রয়াস মুখ্যত পরবর্তিকালের সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তারপর এই ক্ষেত্রে যাঁর অভ্যুদয় ঘটল তিনি হলেন ফরাসী পণ্ডিত বার্ণফ। এঁর কৃতিত্ব সম্পর্কে রমেশচন্দ্র বলেছেন : "Burnheuf elucidated Rig Veda and shewed its true position in the history of Aryan nations" পরবর্তিকালে এই বার্ণফেরই শিষ্য ও ছাত্র রথ এবং ম্যাক্সমুলার শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ পণ্ডিত হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। জার্মানিতে রামমোহনের বন্ধু রোজেন লাতিন ভাষায় ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টকের অনুবাদ প্রকাশ করেন। তারপর বপ্, গ্রীম, হামবোল্ড প্রভৃতি আরো কয়েকজন বিদগ্ধ জার্মান পণ্ডিত এই কার্যে ব্রতী হন। রথ ও হুইটনে অথর্ব বেদ ; লাসন ও বীবর শুক্ল যজুর্বেদ (ব্রাহ্মণ ও সূত্রসমেত) এবং বেনফে সামবেদ অনুবাদ করেন। বেনফের আগে ষ্টিভেনসন ও উইলসন সামবেদ অনুবাদ করেছিলেন। মুয়র (Muir) করেন সংস্কৃত

সাহিত্যের সংকলন। অধ্যাপক বীবর প্রাচীন হিন্দু ইতিহাসের বহু দুর্বোধ্য বিষয়ের উপর আলোকসম্পাত করেছিলেন। কিন্তু এইসব পাশ্চাত্য মনীষির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব শুধু একজনেরই প্রাপ্য। তিনি অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার। এঁর সম্পর্কে রমেশচন্দ্র লিখেছেন: "And lastly Prof. Maxmuller mapped out the whole of the ancient Sanskrit literature chronologically in 1809" আর তাঁর এই গবেষণাকার্যে তিনি ম্যাক্সমুলারের কাছে যে কতখানি কৃতজ্ঞ ছিলেন সেই কথা বলতে গিয়ে রমেশচন্দ্র লিখেছেন: "I am in a special degree indebted to Prof. Max Muller who has, by his life long labours, done more than any living scholar to elucidate ancient Hindu literature, and history. I owe great indebtedness to him—I have freely quoted from Max Muller." এই অনুশীলনকার্যে যে কয়জন ভারতীয় ব্রতী হয়েছিলেন রমেশচন্দ্র তাঁদের মধ্যে এই কয়জনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, যথা—রামমোহন, স্বামী দয়ানন্দ, রাধাকান্ত দেব, ভাওদাজী, ভাণ্ডারকর, রেঃ কে. এম বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও তাঁর সতীর্থ আনন্দরাম বড়ুয়া। প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য গবেষণার ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্র কানিংহাম ও ফার্গুসনের নামও উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়ে রমেশচন্দ্র তাঁর প্রত্যেকটি বক্তব্যকে পরিস্ফুট করেছেন। এইভাবেই একদিকে বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ এবং অন্যদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের ভেতর দিয়ে পথ করে নিয়ে তিনি রচনা করেছেন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার তিন হাজার বছরের ইতিহাস। ভূমিকায় উপসংহারে তিনি লিখেছেন:

"The history of ancient India is a history of thirty centuries of human culture and progress...ancient India has a connected story to tell, and sofar from being interesting, its special feature is its intense attractiveness...The great causes which lead to great social and religions changes are manifest in it and one can trace the gradual revolution of

Hindu civilization through thirty centuries without a break or interruption."

এইভাবেই সেদিন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও একাগ্র নিষ্ঠা নিয়ে, দা|য়িত্বপূর্ণ রাজকার্যের বিরল অবসরের মধ্যে গভীর রাত্রি পর্যন্ত লেখনী চালনা করে রমেশচন্দ্র তাঁর স্বজাতিকে উপহার দিয়ে গেছেন তাদেরই পূর্বপুরুষগণের ইতিহাসের ধারাবাহিক কাহিনী। এইভাবেই তিনি 'spirit and the inner life of the ancient Hindus'-এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় সাধন করিয়ে দিয়েছেন। এইভাবেই তিনি এই দেশে প্রাচীন ইতিহাস-চর্চার পথ সুগম করে দিয়েছেন। এই গবেষণাধর্মী মনীষার তুলনা নেই।

যে পদ্ধতি অবলম্বন করে রমেশচন্দ্র তাঁর এই গ্রন্থখানি রচনা করেছেন তার একটা আভাস আছে ভূমিকাটির প্রারম্ভে। এই বই তিনি সাধারণ পাঠকদের জন্যেই লিখেছেন, বিশেষজ্ঞদের জন্য নয়। এইরকম একখানি বই লেখা যে নিতান্ত প্রয়োজন,—অন্ততঃ হিন্দুজাতির অতীত গৌরব আমাদের সামনে তুলে ধরবার জন্য, সে-কথাও লেখক বিশেষ প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন। গজনীর সুলতানের ভারত আক্রমণের তিনহাজার বছর আগে যে আর্য সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল, সে-বিষয়ে আমাদের সঠিক ধ্যান-ধারণা থাকা উচিত। হিন্দুযুগ বলতে সাধারণত যে একটি কিম্বদন্তীমূলক ইতিহাস বা পৌরাণিক কাহিনীমাত্র বুঝায়, রমেশচন্দ্র সেই ধারণার মূলে আঘাত করে লিখলেন: "For the Hindu student, the history of the Hindu period should not be a blank, nor a confused jumble of historic and legendary names, religious parables, and Epic and Puranic myths. No study has so patent an influence in forming a nation's mind, a nation's character, as a critical and careful study of its past history." প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস রচনাকালে এই ছিল তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি যে এই গ্রন্থে কোনো মৌলিকতা বা অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করেছেন, এমন দাবী তিনি করেন নি। পুরাতত্ত্বের গবেষণা তিনি এখানে করেন নি, কোনো নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন—এমন দাবীও তিনি করেন নি। এই গ্রন্থে তার অবকাশও ছিল না। তিনি তাই মুক্তকণ্ঠেই

বলেছেন : 'I have simply tried to string together, in a methodical order, the results of the abler scholars, in order to produce a readable work for the general reader." রমেশচন্দ্রের সামনে ছিল সাধারণ পাঠক এবং মুখ্যত তাদের পাঠোপযোগী করেই তিনি এই বইখানির পরিকল্পনা করেছিলেন। পূর্বতন পণ্ডিতদের গবেষণালব্ধ ফলকে একটি মাত্র সূত্রে বিধৃত করা—এই কাজটাই কী সহজ? একটি দূর মফঃস্বল শহরে হাজার রকম অসুবিধার মধ্যে থেকে, এই জাতীয় একটি গ্রন্থ রচনা যে কী পরিমাণ দুরূহ কার্য ছিল তা আজ আমরা কিছুমাত্র অনুমান করতে পারব না।

যথাসময়ে প্রকাশিত হোল প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস। সমসাময়িক সুধীবৃন্দ জানালেন অভিনন্দন। মানবসভ্যতার ইতিহাসে ভারতবর্ষ যে কত বড়ো একটা গৌরবের স্থান অধিকার করে, ভারতীয় মনীষার প্রভাব যে ভারতের সীমা অতিক্রম করে একদা বৃহত্তর ভারতে এবং চীন, জাপান ও সাইবেরিয়া পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল, রমেশচন্দ্রের ইতিহাস থেকে এই তথ্যটি যখন সকলের দৃষ্টিগোচর হোল, তখন এই প্রাচীন ভূখণ্ড সম্পর্কে য়ুরোপের বিশেষজ্ঞমহলে নতুন অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি হোল। তিনি যে কৈবলমাত্র একটি ক্যাটালগ রচনা করেন নি, পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম জাতির সভ্যতার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করেছেন, রমেশচন্দ্রের বইখানি প্রকাশিত হওয়ামাত্র সেই তথ্য অবগত হয়ে য়ুরোপের তৎকালীন বিশিষ্ট ভারতপ্রেমিক মনীষিবৃন্দ একবাক্যে রমেশচন্দ্রকে জানালেন তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে অতঃপর তাঁরা যেন নতুন করে চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তিমলগ্নের তখন আর মাত্র দশ বছর বাকী। ইংরেজ অধিকারে ভারতবর্ষ তখন একশত বত্রিশ বছর অতিক্রম করেছে। ভারতবর্ষের যে একটা বিরাট অতীত ছিল এবং এই দেশ যে একদা জ্ঞান-গরিমায় বিশেষ উন্নত ছিল—এই কথা প্রথম বলেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তারপর অর্ধশতাব্দীকাল ধরে বাংলার একাধিক চিন্তানায়কের রচনার ভেতর দিয়ে চললো ভারতের অতীত গৌরবের প্রাথমিক অনুশীলন পর্ব। সেই অনুশীলনকেই পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রদান করলেন রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর তিনবৎসর ব্যাপী নিরলস পরিশ্রমের ফল *A*

History of Civilization in Ancient India গ্রন্থে। প্রাচীন ভারতের সম্পূর্ণ মানচিত্রখানি রঙে ও রূপে রেখান্বিত হোয়ে উঠল সেই প্রথম। জাতির একটি বড়ো অভাব মোচন হোল এতদিনে। একজনের পক্ষে এই কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে অসাধারণ।

লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ কার্ন, পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমুলার এবং তাঁব সহকারী ডাঃ উইনটার্নিজ, ফরাসী মনীষি মঁসিয়ে বার্থ, জার্মান মনীষি ডাঃ ওল্ডেনবার্গ, ডাঃ পিসেল, ভিয়েনার ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিট্যুটের অধ্যাপক বুলার প্রভৃতি য়ুরোপের বিদগ্ধজন যেমন, এথিনিয়ম, গ্লাসগো হেরাল্ড, মর্নিং পোষ্ট প্রভৃতি বিশিষ্ট সংবাদপত্রগুলিও তেমনি একবাক্যে রমেশচন্দ্রের এই গ্রন্থখানির প্রশংসা করলেন। প্রশংসা করলেন বললে ঠিক বলা হয় না—তাঁদের সকলের চিন্তায় এই বইখানি নিয়ে এলো একটি আলোড়ন। এর আগে আধুনিক-কালের আর কোনো ভারতীয় লেখকের কোনো গ্রন্থ সম্পর্কে এমন আগ্রহ ওদেশে দেখা যায় নি। ম্যাক্সমুলার লিখলেন, "অতীব আনন্দের সঙ্গে এই বই পাঠ করলাম—ভারতীয় মানসের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাসের একটি চমৎকাব চিত্র পেলাম।" ডাঃ উইণ্টার্নিজ লিখলেন, "যদিও প্রধানতঃ ইহা হিন্দুদিগের জন্য লেখা, তথাপি এ বই পড়ে ইংরেজি ভাষাভাষী পাঠকরাও উপকৃত হবেন।" অধ্যাপক বার্থ লিখলেন: "I know of no work which gives you a better idea of ancient India," য়ুরোপের গবেষকদের ভারত-গবেষণাকে এইভাবে স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির জারকরসে জারিত করে রমেশচন্দ্র যে পুস্তক রচনা করেছেন, পরবর্তিকালে তার গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে এবং এই একখানি পুস্তক রচনা দ্বারা তিনি ভারত ও য়ুরোপের সাংস্কৃতিক বন্ধনকে যে কতখানি দৃঢ় করেছেন, আজ আমবা তা উপলব্ধি করতে পেরেছি। স্বজাতির প্রতি মমতাবোধ ভিন্ন এমন একটি প্রয়াস সম্ভবপর নয়। তারপর গ্রন্থের ভাষার কথা। রমেশচন্দ্র বাঙালি, ইংরেজি তাঁর মাতৃভাষা নয়। তথাপি গ্লাসগো হেরাল্ড লিখল: "The style is not only clear and picturesque, but also correct and elegent to a degree which reflects the greatest credit on a writer whose mother tongue is presumably not English." তাঁর পরিশ্রম যে বৃথা হয় নি,

তা বিদেশের বিশিষ্ট সমালোচকদের অভিমত থেকেই রমেশচন্দ্র বুঝতে পারলেন। পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য এই বই পাঠ করে একখানি পত্রে রমেশচন্দ্রকে লিখেছিলেন :

পরম কল্যাণবরেষু,

রমেশচন্দ্র, এইমাত্র তোমার বইখানির প্রথমখণ্ড পড়িয়া শেষ করিলাম। বলা বাহুল্য, গভীর আগ্রহ লইয়াই আমি ইহা পাঠ করিয়াছি। ম্যাকসমুলার, বীবর ও উইলিয়ামস-এর সমতুল্য খ্যাতি তুমি অর্জন করিয়াছ। ইহা অত্যুক্তি হইবে না যদি আমি বলি যে এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে তোমার আশ্চর্য প্রতিভা প্রতিফলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থরচনায় তুমি যুগপৎ সহৃদয়তা, নির্ভীকতা ও নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়াছ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমার এই ইতিহাস সর্বজনীন অভিনন্দন লাভ করিবে। ইতি : ৩০শে জুন, ১৮৮৯।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য

ভারতবর্ষে এই গ্রন্থের বিরূপ সমালোচনাও প্রকাশিত হয়েছিল 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায়। জাতিভেদ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি হিন্দুজাতির কতকগুলি সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের পুস্তকে যেসব অভিমত লিপিবদ্ধ হয়েছিল, 'পেট্রিয়ট' ও 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার বিরূপতার তাই ছিল কারণ। এর জবাব দিয়েছিলেন মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকার সম্পাদক ও রমেশচন্দ্রের অনুরাগী সুব্রহ্মণ্য আয়ার। তিনিই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তামিল ভাষায় এই বইখানির একটি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৯৩ সালে যখন তিনি দীর্ঘকালের ছুটি গ্রহণ করেন, তখন রমেশচন্দ্র এর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৯৪ সালে তিনি এর একটি সংশোধিত নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন। এইভাবে নবীন ভারতের সম্মুখে প্রাচীন ভারতের মহামহিম রূপটিকে তুলে ধরে ভারতপ্রেমিক রমেশচন্দ্র পরবর্তিয়দের জন্য স্বাজাত্যবোধের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। এই একটিমাত্র কার্যদ্বারা তিনি ভারতবাসীর অশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র হয়ে আছেন।

॥ আট ॥

এইবার পরিব্রাজক রমেশচন্দ্রের কথা বলব।

রমেশ-প্রতিভা দেশের মৃত্তিকা থেকে প্রাণরস আহরণ করে কিভাবে সার্থক এবং সম্পূর্ণ হয়েছিল তার পরিচয় আছে তাঁর *Rambles in India* নামক চিত্তাকর্ষক ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে। বাল্যকাল থেকেই ভারতবর্ষ তাঁর কল্পনায় একটা বড়ো স্থান অধিকার করেছিল। পরিণত বয়সে, কর্মজীবনের মধ্যাহ্ন-কালে তিনি যখন সপরিবারে ভারতভ্রমণে বেরিয়েছিলেন তখন তাঁর কল্পনায় ভারতবর্ষের শুধু ভৌগোলিক চিত্রই ছিল না, সেইসঙ্গে তিনি হৃদয়-মন দিয়ে এই সত্যটাই অনুধাবন করেছিলেন যে, বহু শতাব্দী ধরে এইখানেই ইতিহাসের বিপুল পটভূমিকায় বহু সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন এবং নবনব ঐশ্বর্যের বিকাশ ও বিলয় আপন বিচিত্র বর্ণের ছবির দ্বারা অঙ্কিত করে চলেছে। পর্যটক রমেশচন্দ্র সত্যই ভারতবর্ষের বিরাট বিক্ষুব্ধ অতীতযুগের স্পর্শলাভ করেছিলেন তাঁর মনের মধ্যে। তিনি দেখেছিলেন মহিমান্বিত প্রাচীন ইতিহাসের স্বাক্ষর ভারতের মৃত্তিকায়, মহাকালের স্থূল হস্তাবলেপ যা আজো মুছে ফেলতে পারেনি। কর্মজীবনের আবেষ্টন থেকে মাঝে মাঝে বেরিয়ে যখন তিনি ভারতভ্রমণে বহির্গত হতেন, তারই বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁর 'র‍্যামবল্‌স্' পুস্তকখানির মধ্যে। ইংরেজিতে রচিত হলেও ভ্রমণসাহিত্য হিসাবে এই বইখানি খুবই উপভোগ্য এবং শিক্ষাপ্রদ। বাংলায় এর একটি অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া উচিত।

দেশভ্রমণ না করলে দেশের পরিচয় লাভ সম্পূর্ণ হয় না, সার্থক হয় না। আমরা দেখেছি, সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দেবার সময়ে তিনি যখন ইংলণ্ডে ছিলেন তখন তিনি যতদূর সম্ভব য়ুরোপের বিভিন্ন দেশগুলি ভ্রমণ করে সেখানকার সমাজজীবনের পরিচয় লাভ করেছিলেন এবং পরবর্তিকালে দ্বিতীয়বার যখন বিলাত যান তখনও তিনি য়ুরোপের অন্যান্য দেশগুলি ভ্রমণ করেছিলেন। কর্মজীবনের প্রথম দশ বৎসরকালের মধ্যে রমেশচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে 'প্রিভিলেজ লিভ'-এর সুযোগ নিয়ে ভারতবর্ষের কয়েকটি শহর ভ্রমণ করেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানগুলির প্রতিই ছিল তাঁর বিশেষ আকর্ষণ। প্রাচীন

ধ্বংসাবশেষগুলি পর্যবেক্ষণ করতে তিনি যেমন আনন্দ ও উত্তেজনা বোধ করতেন, তেমনি আনন্দ বোধ করতেন আধুনিক কালের কর্মব্যস্ত শহরগুলি দেখতে। পরবর্তিকালে রমেশচন্দ্র বলতেন: "আমাদের দেশের অল্পলোকই যখন তাঁরা অন্য প্রদেশে ভ্রমণে যান তখন তাঁরা ভারতীয় জীবনধারা ও সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে যে কবিতা আছে, তা উপলব্ধি করেন; অথবা এর মন্দির-মসজিদের সৌন্দর্য, গ্রাম্য পাল-পার্বন ও জমায়েতের বৈশিষ্ট্য, কিম্বা যে গভীর বিশ্বাস ভারতবাসীর অন্তরে বিদ্যমান, খুব অল্প লোককেই তার পরিচয় গ্রহণ করতে ব্যগ্র দেখা যায়। যে শিক্ষা নিতান্তই ভাসা ভাসা এবং যে জীবন পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণে অতিবাহিত হয়, তা আমাদের এমনই অন্ধ করে তুলেছে যে, তার ফলে আমাদের নিজেদের দেশে নিজেদের রীতিনীতি ও জীবনধারার মধ্যে যা কিছু আকর্ষণীয় আছে, তার পরিচয় আমাদের অগোচরেই থেকে যায়। ভারতের প্রত্যেকটি স্থলই আকর্ষণীয়—অবশ্য এ-কথা তাঁদের পক্ষেই সত্য যাঁদের দৃষ্টি ও বোধশক্তি আছে।"

এই ভারতচেতনা রমেশ-চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য। পরিব্রাজক বিবেকানন্দকে রমেশচন্দ্রের এই ভারতচেতনা যে কিছুটা উদ্বুদ্ধ করেছিল তা অনায়াসেই বলা যায়। ভ্রমণপ্রিয় রমেশচন্দ্র তাঁর কর্মজীবনের প্রথমেই ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর উত্তরপ্রদেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তাঁর অভিমত ছিল যে, যে কোন হিন্দুর পক্ষে উত্তরভারত ভ্রমণ করে তবে ভারতের অন্য প্রদেশ ভ্রমণ করা উচিত। এর কারণ হিসেবে তিনি বলতেন: "স্কুলে যে শিক্ষালাভ হয় না, উত্তরপ্রদেশ (তখন একে পশ্চিম ভারত বলা হোত) ভ্রমণ করতে পারলেই সেই শিক্ষা অতি সহজেই লাভ করা যেতে পারে—এখানে যে-ইতিহাসের সন্ধান মিলবে পাঠ্যপুস্তকে তা পাওয়া যায় না।"

তিনি সপরিবারেই ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তাঁর কাশী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে রমেশচন্দ্র লিখেছেন: "কাশীর সংকীর্ণ ও জনসমাকীর্ণ রাস্তাগুলির ভেতর দিয়ে আমরা যখন যাচ্ছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল আমরা বুঝি ক্ষণকালের জন্য আধুনিক জীবনের বাইরে চলে গিয়েছি এবং আমরা যেন অতীত দিনের সহস্র স্মৃতির মধ্যে, সহস্র ঘটনার মধ্যে চলে এলাম। প্রাচীন সংস্কৃতবিদ্যার অনুশীলন এখনো এখানকার বহু মন্দিরের চত্বরের মধ্যে পরিদৃষ্ট

হয়। যে বৈদিকমন্ত্র একদা আর্যগণের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে পঞ্চনদের কূলে কূলে প্রতিধ্বনিত হোত, বারাণসীক্ষেত্রেও অবিরাম সেই পবিত্র বেদমন্ত্র ঝঙ্কৃত হয়ে এখানকার আকাশ-বাতাসকে আজো পবিত্র করে রেখেছে—ভারতবর্ষের নানা দেশ থেকেই এখানে বেদশিক্ষা করবার জন্ম ছাত্রদের সমাগম হয়ে থাকে। কাশীর প্রাধান্ত এইখানেই।"

কাশী থেকে রমেশচন্দ্র ইতিহাসপ্রসিদ্ধ লক্ষ্ণৌ নগরী দর্শন করতে এলেন। সিপাহী বিদ্রোহের বহু স্মৃতিপূত এই শহরটি দেখবার আগ্রহ তাঁর বিশেষ ছিল। কারণ এই বিদ্রোহ যখন সংঘটিত হয়, তখন তিনি ন' বছরের বালক। এখানকার রেসিডেন্সী ও বিদ্রোহের অন্যান্য স্মৃতিচিহ্নগুলি তিনি খুব আগ্রহের সঙ্গেই দেখলেন; দেখে ভারত-ইতিহাসের একটি অতীত পৃষ্ঠার সঙ্গে পরিচয় লাভ করলেন। লক্ষ্ণৌভ্রমণ শেষ করে তিনি আর্যাবর্তের কেন্দ্রস্থল ও প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ নগরী দিল্লীতে এলেন। অতীত দিনের দিল্লীর কতো স্মৃতি তাঁর মনের মধ্যে একে একে জেগে উঠল—উদ্বেলিত চিত্তে রমেশচন্দ্র তাঁর দিল্লীভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন: "যমুনার তীরে দাঁড়িয়ে যে কোনো চিন্তাশীল হিন্দুর প্রাণে এই স্মৃতি না জেগে পারে না যে, এইখানেই প্রাচীনকালে হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থে কুরু ও পাণ্ডবগণ রাজত্ব করতেন। তার মানসপটে অমনি জেগে ওঠে মহাকাব্যের মধ্যে সেই কাহিনী কি ভাবে বিধৃত আছে আর জেগে ওঠে ভারতের প্রাচীন সভ্যতার চিত্র, ভারতবাসীর শৌর্যবীর্যের কথা, তাদের ধর্মাচরণের কথা।" রমেশচন্দ্র একজন ঐতিহাসিকের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে পুরাতন দিল্লীর ধ্বংসাবশেষগুলি নিরীক্ষণ করলেন এবং আধুনিক কালের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভগুলিও দেখলেন—কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের লীলাক্ষেত্র এই প্রাচীনতম শহরটি তার অতীত দিনের সকল গৌরব ও গরিমা নিয়েই তাঁর কাছে প্রতিভাত হলো যেন। দিল্লী থেকে তিনি এলেন আগ্রায়। এখানে মোগল স্থাপত্যরীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন তাজমহলের শিল্পনৈপুণ্য ও সৌন্দর্য রমেশচন্দ্রের কল্পনাকে যারপর নাই উজ্জীবিত করলো। ফতেপুর সিক্রী ও তার অমর ধ্বংসস্তূপ দেখে তিনি লিখেছিলেন: "মোগলযুগের ভারতবর্ষের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে ফতেপুর সিক্রীর প্রাধান্য আজো বিদ্যমান। সমগ্র মোগলযুগের কীর্তিকলাপ, জাঁকজমক সবই যেন এই ফতেপুরের প্রাসাদের

অভ্যন্তরে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। এখানকার আমদরবার, প্রশস্ত কক্ষগুলি, বাদশাহী দপ্তরসমূহ, বেগমদের অন্তঃপুর—সবই আজ পরিত্যক্ত ও নির্জন। এ যেন মৃতদের শহর যার কথা আমরা আরব্য উপন্যাসে পড়েছি—রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, বিপণি সবই রয়েছে, কিন্তু এগুলি আজ জনমানবশূন্য—জীবনের চিহ্নমাত্র কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তাজমহল, সিকান্দ্রার সমাধিমন্দির, ফতেপুর সিক্রীর পরিত্যক্ত অথচ অসাধারণ প্রাসাদটি আগ্রার পরিবেশকে এমনই আকর্ষণীয় করে রেখেছে যে, পর্যটক ও পরিব্রাজকেরা এখানে একবার না এসে পারেন না। হিন্দু পর্যটকগণ কিন্তু আগ্রার প্রতি ততখানি আকর্ষণ বোধ করেন না, যতখানি তাঁরা করেন এর চেয়েও প্রাচীন এবং রমণীয় স্থান মথুরা ও বৃন্দাবন সম্পর্কে। আগ্রা দেখবার অনেক বছর পরে আমি এই দুইটি স্থানও পরিদর্শন করেছিলাম।"

১৮৮২ সালে রমেশচন্দ্র উড়িষ্যাভ্রমণে গিয়েছিলেন। এখানে তিনি যাজপুর, কটক, উদয়পুর, খণ্ডগিরি ও ভুবনেশ্বর প্রভৃতি দর্শন করেন। সর্ববিষয়ে অনুন্নত এই প্রদেশটির যে একটি দেড়হাজার বছরের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে, ছেলেবেলায় ইতিহাসপুস্তক পাঠ করবার সময়ে তিনি তা আদৌ ধারণা করতে পারেন নি, বলেছেন। হিন্দু স্থাপত্যরীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে উড়িষ্যার দেব-দেউলগুলির গঠন-পারিপাট্য দেখে রমেশচন্দ্র মুগ্ধ হলেন। দু'হাজার বছর আগে উড়িষ্যা যে আর্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সংস্পর্শে এসেছিল, সে-বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন। তাঁর দৃষ্টিতে এইখানকার বৌদ্ধগুহাগুলিই ভারতবর্ষের মধ্যে প্রাচীনতম। উড়িষ্যাভ্রমণে এসে তাঁর মনে এই ধারণা দৃঢ়তর হোল যে, আধুনিক ভারতবর্ষের যে কোনো প্রদেশের উপর থেকে যদি অতীতের অন্ধকারাচ্ছন্ন যবনিকাটি তুলে ধরা যায়, তা হোলে অতীতের গৌরবময় দৃশ্যাবলী আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে—সে অতীত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শান্তির সময়ের বহু সাফল্যের দ্বারা চিহ্নিত। হিন্দুর যে একটা অতীত আছে, এবং সে অতীত যে যথার্থ গৌরবপূর্ণ, প্রত্যেক আধুনিক হিন্দুসন্তানকে তা বিশ্বাস করতে হবে, আর সেই বিশ্বাসের জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শনগুলি আজও বিদ্যমান—এই ধারণাই যেন উড়িষ্যাভ্রমণে এসে রমেশচন্দ্রের মনে সুদৃঢ় হোল। প্রথমে তিনি এলেন যাজপুরে; এখানে নীল ক্লোরাইট পাথরের তৈরি হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তিগুলি

দেখে তিনি বিস্মিত হলেন, বিশেষ করে চামুণ্ডাদেবীর বিশাল মূর্তিটি তাঁর চক্ষে হিন্দু ভাস্কর্যশিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে প্রতীয়মান হোল। অনুপম শিল্প-সুষমামণ্ডিত এই মূর্তিটি সম্পর্কে রমেশচন্দ্রের বর্ণনা এইরকম :

"It is a colossal naked skeleton, with the skin hanging to the bones, and the veins and muscles standing out in ghastly fidelity. The figure attests the boldness of Hindu sculptor of ancient days."

ভুবনেশ্বর দর্শন করে তিনি লিখলেন : "কেশরী রাজাদের প্রাচীন রাজধানী এই ভুবনেশ্বর বর্তমানে পরিত্যক্ত অথচ গরিমামণ্ডিত মন্দিরসমূহে পরিণত হয়েছে। কথিত আছে যে, একদা ভুবনেশ্বর হ্রদের চারপাশ ঘিরে সাত হাজার দেব-দেউল নির্মিত হয়েছিল, তার মধ্যে এখন পাঁচশত মাত্র অবশিষ্ট আছে। এর প্রত্যেকটিতেই উড়িষ্যার নিজস্ব স্থাপত্য ও ভাস্কর্যরীতি পরিস্ফুট। ষষ্ঠ শতাব্দীর স্থূল ধ্যান-ধারণা থেকে আরম্ভ করে দ্বাদশ শতাব্দীতে এসে এই রীতি সূক্ষ্ম সুকুমার শিল্পকলার রূপ ধারণ করে ; তারপর শুরু হয় এর অবনতি। তাই দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তিকালের উড়িষ্যায় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যরীতির মধ্যে আমরা যা দেখতে পাই তা হোল hurried stucco imitation of the present day."

রমেশচন্দ্র তাঁর উড়িষ্যাভ্রমণপ্রসঙ্গে উপসংহারে যে কথা বলেছেন তা এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি লিখেছেন : "ভারতবর্ষ অসংখ্য স্মৃতিচিহ্নের দেশ। এমন একটি প্রাচীন স্থান এদেশে বিরল অথবা এমন একটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ এদেশে দেখতে পাওয়া যাবে না, যার ভেতর দিয়ে আমরা প্রাচীন ইতিহাস বা প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষাৎ না পাই। এই ঐতিহ্যের মধ্যেই হিন্দুজাতি বেঁচে আছে। সে আজো এই ঐতিহ্যের রোমন্থন করে।"

১৮৮৫ সালে রমেশচন্দ্রের চাকরি-জীবনের চৌদ্দ বছর পূর্ণ হয়। এইবার তিনি দু' বছরের ফার্লো নিলেন। এই অবকাশে তিনি সাহিত্যকর্ম ব্যতীত বেদের অনুবাদ ও সামাজিক উপন্যাসরচনা এই সময়কারই ঘটনা) ভারতবর্ষের

আরও কয়েকটি অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। ১৮৮৫-র শরৎকালে তিনি রাজপুতানা ও মধ্যভারত ভ্রমণে বহির্গত হলেন। জয়পুরের বর্ণাঢ্য দশেরা উৎসব দেখে মুগ্ধচিত্তে রমেশচন্দ্র তার বর্ণনা এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন :

"অম্বর থেকে জয়পুরে এলাম। আজ পর্যন্ত যেখানে যত কিছু আমি দেখেছি, জয়পুরের শরৎকালীন দশেরা উৎসবের কাছে সেসব কিছু নয়। এই উপলক্ষ্যে রাজপুতেরা তরবারীর পূজা করে। আধুনিক হিন্দু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রাজপুতের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের যেসব বর্ণনা আছে, তা এই দশেরা উৎসবের পর আরম্ভ হোত। আমি দেখলাম প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুসরণে জয়পুরের মহারাজা, পুরোহিত ও মন্ত্রিদের সহায়তায় দশেরা পূজার অনুষ্ঠান করলেন; তারপর দেখলাম উৎফুল্ল ও আবেগচঞ্চল জনতার ভেতর দিয়ে শোভাযাত্রাসহকারে মহারাজা বেরুলেন। সমস্ত শহরটাই এই সময়ে উৎসবের আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। আতসবাজী ও আলোকসজ্জায় সমগ্র জয়পুর নগরী যেন এক বিচিত্র উৎসবময় শহরের সৌন্দর্য ধারণ করে।

জয়পুর, আজমির, যোধপুর ও আবু ভ্রমণ শেষ করে, তিনি রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধ চিতোরের পার্বত্য দুর্গটি দেখতে এলেন। রাজপুতের অপরিসীম বীরত্বের শত স্মৃতিমণ্ডিত এই চিতোর ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্রের স্মৃতিকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে তুলল; উদ্বুদ্ধচিত্তে তিনি লিখলেন : "History loves to dwell on the great deeds which have sanctified this spot; legends and songs cling round this ancient capital of the Ranas of the Solar race." আর উজ্জয়িনী দেখে রমেশচন্দ্র লিখলেন : "আধুনিক ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধতম স্থান যদি চিতোর হয়, তা হোলে আমি বলব প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ স্থান এই উজ্জয়িনী। যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবের হাজার হাজার বছর আগে, মালওয়ার রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। সম্রাট অশোকের পিতা যখন উত্তরভারতে পাটলীপুত্রের রাজধানীতে রাজত্ব করছিলেন, তখন অশোক এই অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। তারপর সম্রাট বিক্রমাদিত্যের সময়ে উজ্জয়িনী রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে এবং এখান থেকেই কাব্যের আলোকচ্ছটা, পাণ্ডিত্যের দীপ্তি সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়। বর্তমানের এই অতি বাস্তবের দিনেও যে কোনো হিন্দুর পক্ষে বিক্রমাদিত্যের

রাজসভা বা কালিদাসের প্রতিভা স্মরণ না করে উজ্জয়িনীর বাজার, প্রস্তরময় পথ অথবা এর অন্ধকারাচ্ছন্ন গলি পরিক্রম করা অসম্ভব।

ভারতবর্ষে রমেশচন্দ্রের তৃতীয় পর্যায়ের ভ্রমণকাল হোল ১৮৯২ সাল। এই সময় তিনি এক বছর দু'মাসের ফার্লো নিয়ে তার বেশির ভাগ সময়ই দেশভ্রমণে অতিবাহিত করেন। এই ভ্রমণ ছিল তাঁর passion—তিনি ভ্রমণ করতেন কেবলমাত্র ভ্রমণের আনন্দ পাবার জন্য নয় বা দেশ-দেশান্তরের সৌন্দর্য দেখবার জন্য নয়, শিক্ষালাভের জন্য। এই বিষয়ে তাঁর নিজস্ব অভিমতটি এখানে উদ্ধৃত করলাম। ভ্রমণ যাঁদের নেশা, বিশেষ করে ভারত-ভ্রমণে যাঁদের আগ্রহ আছে, তাঁদের আমি ভ্রমণ সম্পর্কে রমেশচন্দ্রের মনোভাবটি একবার অনুধাবন করতে বলি। রমেশচন্দ্র লিখেছেন: "প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির সাধ্যমত দেশভ্রমণ করা উচিত। ভ্রমণের দ্বারা আমাদের মনের দ্বার উন্মুক্ত হয়, চিন্তার প্রসারতা ঘটে, সহানুভূতি বৃদ্ধি পায় আর এর ফলে মন বাইরের জিনিস গ্রহণে সমর্থ হয় এবং কর্তব্যে নতুন প্রেরণা বোধ করে। আমরা, যারা ভারতবর্ষে জন্মেছি এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছি, তাদের পক্ষে বর্তমান য়ুরোপ ও আমেরিকার সভ্যতার পরিণতি স্বচক্ষে দেখা, যত্নের সঙ্গে তা পর্যবেক্ষণ করা এবং আমাদের জাতীয় উন্নতির পক্ষে তার যা ভালো তা মুক্তচিত্তে গ্রহণ করা, যথার্থই হিতকর।" একমাত্র ভ্রমণের দ্বারাই এই জিনিস সম্ভব—এই ধারণায় রমেশচন্দ্র বিশ্বাসী ছিলেন বলেই না তিনি একাধিকবার য়ুরোপ ভ্রমণে বহির্গত হয়েছিলেন এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার নিবিড় সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁর য়ুরোপভ্রমণের কথা পরে হবে, আপাততঃ ভারতভ্রমণের কথাই বলি।

১৮৯২ সালের শরৎ ও শীতঋতুর মনোরম সময়ে বন্ধু বিহারীলাল গুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে রমেশচন্দ্র ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর, মুসৌরী ও উত্তরভারতের অন্যান্য অঞ্চল ভ্রমণ করতে বেরুলেন। তাঁর 'র‍্যামবলস্ ইন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে এই ভ্রমণের বিশদ বিবরণ রমেশচন্দ্র লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই বিবরণের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম। কাশ্মীরভ্রমণ প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন: "একটি নৌকা করে আমরা বারামুলা পরিত্যাগ করে ঝিলমের ওপর দিয়ে চললাম। এই উপত্যকার ভেতর দিয়ে ঝিলম নদী প্রবাহিত এবং সমস্ত জলপথই নৌকাযোগে ভ্রমণ করা যায়। রাত্রিবেলায় আমরা সুপুর

নামক একস্থানে থামলাম এবং পরের দিন সকালবেলায় মাছ ধরতে এবং শিকার করতে প্রয়াস পেলাম; কিন্তু কোনটাতেই আমরা কৃতকার্য হলাম না। কারণ শীতের সমাগমে বহু-আকাঙ্ক্ষিত মহাশের মাছেরা উপত্যকার উচ্চ প্রদেশ ত্যাগ করে সমতলভূমির দিকে চলে যেতে আরম্ভ করেছে এবং হাঁসের দল তখনো পর্যন্ত এখানে ভীড় জমাতে শুরু করেনি। বেলা দশটায় সুপুর ত্যাগ করে আমরা যখন কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে পৌছলাম তখন অপরাহ্ন। শ্রীনগরে আমরা এক সপ্তাহকাল অবস্থান করেছিলাম। শহর, শহরের দোকানপাট, বাজার ও স্থানীয় অধিবাসীদের কর্মব্যস্ত জীবন-সবই আমাদের চক্ষে মনোরম লাগল। চীনার বৃক্ষশ্রেণীর ছায়াশোভিত শ্রীনগরের পথগুলি সত্যই চিত্তাকর্ষক। গিরিশ্রেণী-পরিবেষ্টিত শ্রীনগরের ডাল হ্রদ পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত। মহারাজা তখন শ্রীনগরে অবস্থান করছিলেন, তাই তাঁর প্রাসাদ পরিদর্শনে আমাদের কোনো অসুবিধাই হোল না। এখানে কয়েকটি সুপরিচিত মন্দির ও মসজিদও দেখলাম।···ভেনিসে যেমন গণ্ডোলায় চড়ে সর্বত্র যাওয়া যায়, এখানেও তেমনি সর্বত্র বোটে করে স্বচ্ছন্দে যাওয়া যায়। ডাল হ্রদে সান্ধ্যভ্রমণ অতি রমণীয় মনে হোল—হ্রদের নিস্তরঙ্গ স্বচ্ছ জলের ওপর পার্শ্ববর্তি পর্বতমালার ছায়া প্রতিবিম্বিত।"

কাশ্মীর থেকে রমেশচন্দ্র এলেন পঞ্চনদ-বিধৌত পাঞ্জাবে। "অবশেষে এলাম প্রাচীন ঋষিদের স্মৃতি-বিজড়িত, ঋগ্বেদের জন্মভূমি পাঞ্জাব। এই সেই পবিত্র স্থান যেখানে মানুষ তার সভ্যতার শৈশবকে লালন-পালন করেছে, যেখানে সে শিল্পকলা, কাব্য ও বিজ্ঞান প্রভৃতির অনুশীলন করেছে। আধুনিক জাতিসমূহের অতি সাধারণ উত্তরাধিকার হোল তার সভ্যতা এবং আজকের দিনে ধারণা করা অসম্ভব যে, দেড়শত পুরুষ আগে এই সভ্যতা পৃথিবীর মধ্যে চারিটি নদীর তীরে অবস্থিত মাত্র চারিটি জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সেমেটিক জাতিসমূহ তাদের সভ্যতা গড়ে তুলেছিল ইউফ্রেটিস নদীর তীরে। এই সভ্যতার বিশেষ অবদান বিজ্ঞান আর গ্রহ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আবিষ্কার এবং আধুনিক য়ুরোপের ইহাই উত্তরাধিকার। ইথিওপিয়ান জাতি-সমূহ তাদের সভ্যতা গড়ে তুলেছিল নীল নদীর তটে। সেই সভ্যতার স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ তারা যেসব কীর্তি স্থাপন করে গিয়েছে, তা শুধু কালজয়ী নয়, তাদের সাদৃশ্যও বিরল। তুরানী জাতিসমূহ তাদের সভ্যতা গড়ে তুলেছিল হোয়াং হো

নদীর তীরে এবং তাঁরা সভ্যতার যে বর্তিকা একদা জ্বালিয়েছিলেন, চার হাজার বছর ধরে তা অনির্বাণ রয়েছে। আর্যজাতিরা অধ্যাত্মজ্ঞানের সাধনায় সিন্ধুনদীর তীরেই প্রথম সাফল্যলাভ করেছিলেন এবং কাব্যে ও দর্শনে তাঁদের সেই সফলতার স্থায়ী নিদর্শন রেখে গিয়েছেন, যা আধুনিকদের নিকট পরম বিস্ময়ের বিষয়। সমস্ত পৃথিবীই বলতে গেলে অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত ছিল যখন এই চারিটি মহান সভ্যতা পৃথিবীতে জ্ঞান-রশ্মি বিকীরণ করেছিল। এই চারিটি মহানজাতি ভিন্ন আর সবাই ছিল যাযাবর ও বর্বর, পশুপালন ছিল তাদের ধর্ম, তাঁবুতে বাস ছিল তাদের জীবন। মানবসভ্যতার ইতিহাসে বা অগ্রগতির ইতিহাসে এরা কোনো স্থায়ী চিহ্ন না রেখেই পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।"

পাঞ্জাব থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় রমেশচন্দ্র উত্তরভারতের দুইটি তীর্থস্থান —হরিদ্বার ও হৃষীকেশ, পরিদর্শন করলেন। হরিদ্বারে স্বচ্ছসলিলা গঙ্গা তীরের দৃশ্যাবলী দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। এরপর তাঁর শেষ পর্যায়ের ভারতভ্রমণের তারিখ ১৯০৩ সালের গোড়ার দিক। এবার তিনি ব্যাপকভাবে দক্ষিণভারত ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন; এই ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দাক্ষিণাত্যের বিশিষ্ট ব্যক্তি-বর্গের সঙ্গে পরিচিত হওয়া আর ভারতবর্ষের এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক রূপ এবং চাষীদের অবস্থা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করা। কোকনদের কয়েকটি গ্রামে গিয়ে তিনি সেখানকার রায়তদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। এ ছাড়া, এখানে তিনি একটি বিদ্বৎসমাজে প্রাচীন ভারতের মহাকাব্য ও আধুনিক জীবনে তাদের প্রভাব সম্পর্কে একটি বক্তৃতাও প্রদান করেন। সে-বক্তৃতা সকলকে চমৎকৃত করে। রাজমহেন্দ্রীতেও তিনি ঐ বিষয়ে আর একটি বক্তৃতা করেন। ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি হায়দ্রাবাদ এলেন। এখানে সাপুরবাদী হলে 'প্রাচীন ভারত' সম্পর্কে তিনি একটি বক্তৃতা করেন। এখানে রমেশচন্দ্র রাজকীয় সম্বর্ধনা লাভ করেন। দেখা যায় যে, শুধু ভারত সরকারের একজন উচ্চপদস্থ সিবিলিয়ান হিসাবে নয়, ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যে বিশ্বাসী একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবেই তিনি সর্বত্র সম্বর্ধিত হন। নিজামের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী স্যর কিষেণ প্রসাদের মতোন সুপণ্ডিত ব্যক্তি রমেশচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হলেন। তারপর গুর্জরাতে আমেদাবাদ, ব্রোচ ও সুরাটের কয়েকটি গ্রামে কৃষকদের

অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন তিনি। এইখানে কৃষিকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে তাঁকে একখানি মানপত্র দেওয়া হয়। উক্ত মানপত্রে বলা হয়েছিল যে একজন রাজভক্ত ইংরেজের প্রজা হিসাবে তাঁর যে খ্যাতি, তেমনি খ্যাতি তিনি অর্জন করতে পেরেছেন একজন দেশভক্ত ভারতীয় হিসাবে। কথাটি মিথ্যা নয়। রমেশ-চরিত্রের ইহাই বৈশিষ্ট্য, একাধারে তিনি ছিলেন দেশভক্ত ও রাজভক্ত। কিন্তু তাঁর রাজভক্তিকে অতিক্রম করে গিয়েছে তাঁর নির্ভেজাল ও নিরুচ্ছ্বসিত দেশপ্রেম। এই অভিনন্দনের উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন তা বিশেষভাবেই স্মর্তব্য। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের চাষীদের জীবনের সঙ্গে তিনি যে একাত্মীয়তা বোধ করতেন, তার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি আছে এই উত্তরের মধ্যে ; এর জন্য দারুণ গ্রীষ্মের দিনে গরুর গাড়ি চড়ে পল্লীর মেঠো পথের উপর দিয়ে যেতে তিনি বিন্দুমাত্র কষ্টবোধ করেন নি। গুজরাতের পল্লীদৃশ্য দিল্লী দরবারের চেয়েও তাঁর কাছে উপভোগ্য মনে হয়েছে। সাতারায় তিনি আর একটি অভিনন্দন লাভ করলেন। তাতে বলা হোল: "আপনার সমগ্র জীবনে আপনি একটিমাত্র উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন—তা হোল শাসক ও শাসিতকে একত্র করা।" বস্তুতঃ রমেশচন্দ্রের সরকারী জীবন ও বে-সরকারী জীবনের বহুমুখী কার্যধারা বিশ্লেষণ করলে পরে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, the rulers and the ruled—বিপরীতধর্মী এই দুইটি সত্তাকে তিনি মেলাতে সক্ষম হয়েছিলেন; এ-ক্ষেত্রে তাঁর প্রয়াস সত্যই অতুলনীয়। এর বিস্তারিত আলোচনা পরে করব। সমকালীন বাঙালিদের মধ্যে রমেশ-চন্দ্রের ন্যায় এমন তথ্যানুসন্ধানী পর্যটক আমরা দ্বিতীয় আর কাউকে পাই না। তাঁর ভারতভ্রমণ সংক্রান্ত বইখানি (*Rambles in India*) পাঠ করে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ যে পরিব্রাজক বিবেকানন্দ হয়েছিলেন, এমন অনুমান অসঙ্গত নাও হোতে পারে। বিবেকানন্দ রমেশ-মনীষার একজন বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। সৌখিন ভ্রমণকারী তিনি ছিলেন না, তাই দেখা যায় যে, কি এদেশে, কি ওদেশে, যখন যেখানেই তিনি গিয়েছেন, সেই দেশের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থনীতিক পরিচয় গ্রহণে রমেশচন্দ্রের উৎসাহের সীমা ছিল না।

১৮৯৭ সালে রমেশচন্দ্রের চাকরিজীবনের ছাব্বিশ বছর পূর্ণ হোল; ইচ্ছে করলে তিনি আরো পাঁচ বছর চাকরি করতে পারতেন। তবে পেন্সনের

মেয়াদ পূর্ণ হোল দেখে তিনি এইবার সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করবেন সিদ্ধান্ত করলেন। চাকরির শেষ অধ্যায়ে দেখা যায় যে, তিনি তিন বছরের জন্য অস্থায়ী বিভাগীয় কমিশনারের পদ লাভ করেছিলেন, প্রথমে বর্ধমান বিভাগের, পরে উড়িষ্যা বিভাগের। বিভাগীয় কমিশনারের পদে একজন ভারতীয়ের নিয়োগ সেই প্রথম। কর্তৃপক্ষ তাঁর যোগ্যতা দেখেই তাঁকে এই দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ-সমাজের মুখপত্র 'ইংলিশম্যান' তাঁর এই নিয়োগে খুশি হতে পারেনি, বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছিল এই কাগজে। তবে তৎকালীন লেফটেনেণ্ট গভর্ণর স্তর চার্লস ইলিয়ট রমেশচন্দ্রের একজন অনুরাগী ছিলেন। রমেশচন্দ্রের নিয়োগে তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়ে স্তর চার্লস ইলিয়ট এক পত্রে লিখেছিলেন: "I wish to say how much pleasure it gives me to make this promotion in your case which is the first instance of the appointment of a native of India to a Commissionership." এই উচ্চতম পদে যে স্বল্পকাল তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন সেইসময়ে বাংলা প্রদেশের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে রমেশচন্দ্র যে মূল্যবান রিপোর্ট প্রণয়ন করেছিলেন তা আজো তার মূল্য হারায় নি। ১৮৯৫ সালে সরকার তাঁকে শাসন পরিষদের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করেন। এই ধরণের নিয়োগও সেই প্রথম।

রমেশচন্দ্র যখন বর্ধমান বিভাগের কমিশনার তখন বাংলার সাহিত্যজগতে একটি ইন্দ্রপতন ঘটল—সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হোল। ১৮৯৪ সালের ৮ই মার্চ মাত্র ছাপ্পান্ন বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের অকালমৃত্যুতে রমেশচন্দ্র যারপর নাই বেদনা বোধ করলেন। পিতৃবন্ধু এবং তাঁর সাহিত্যগুরুর মৃত্যুতে শোকার্ত চিত্তে রমেশচন্দ্র বর্ধমানেই একটি শোকসভার আয়োজন করলেন। উক্ত সভায় বর্ধমানের মহারাজা সভাপতিত্ব করেছিলেন এবং শহরের সরকারী ও বে-সরকারী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ সভায় যোগদান করেছিলেন। প্রধান বক্তা একজনই ছিলেন—তিনি রমেশচন্দ্র। পরে 'নব্যভারত' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রসম্পর্কে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। উক্ত প্রবন্ধের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হোল:

"গত ত্রিশ বৎসরের বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস বঙ্কিম-ময়। তীব্রগামী পর্বত-নদীর ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত বজ্রনাদে বহিয়াছে—

বঙ্গবাসীদিগের হৃদয় উত্তেজিত করিয়াছে—জাতীয় শরীর গঠিত ও বলিষ্ঠ করিয়াছে। অদ্য আমরা যে বঙ্গসাহিত্যের স্পর্ধা করি, সেটি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ও জীবনব্যাপিনী চেষ্টার ফল…বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্বদিন আমি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তিনি তখন প্রায় অজ্ঞান, কিন্তু আমার গলার স্বর বুঝিতে পারিলেন,—আমার দিকে চাহিয়া সস্নেহে আমার সহিত কথা কহিলেন।"

রমেশচন্দ্রের সাহিত্যজীবনে বঙ্কিমের প্রত্যক্ষ প্রেরণার কথা পূর্বেই বলেছি। তিনি নিজেই বলেছেন: "আমি যখন যে উদ্যমে লিপ্ত হইয়াছি, তাহাতেই আমি বঙ্কিমবাবুর নিকট উৎসাহ পাইয়াছি।" তাই বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুতে তিনি যারপর নাই ব্যথিত ও শোকার্ত হলেন। বিশ্বের সাহিত্যদরবারে বঙ্কিমের প্রতিভা ও মহত্ব যাতে প্রচারিত হয় সেজন্য 'এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা' নামক বিশ্ব-বিখ্যাত কোষ-গ্রন্থের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে রমেশচন্দ্র একটি সুন্দর ও নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ রচনা করে দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর বৎসরে প্রধানত তাঁর স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করবার উদ্দেশ্যে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের অর্থানুকূল্যে যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ স্থাপিত হয়, তখন রমেশচন্দ্রকে এর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত করা হয়; নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ হন সহ-সভাপতি। ১৮৯৮ সালে পরিষদ রমেশচন্দ্রকে একজন বিশিষ্ট সদস্য হিসাবে গ্রহণ করেন এবং ১৯০২-০৩ সালে দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি সভাপতির পদে বৃত হয়েছিলেন। স্বদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি রমেশচন্দ্রের যে প্রবল অনুরাগ ছিল তারই পুরস্কারস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতির পদ সর্বাংশে তাঁর প্রাপ্য ছিল। রমেশচন্দ্র বহু অর্থব্যয়ে তাঁর নিজস্ব একটি গ্রন্থাগার তৈরি করেছিলেন; তাঁর সংগ্রহের বেশির ভাগই ছিল সংস্কৃত বই। পরিষদকে তিনি সেই মূল্যবান সংগ্রহটি দান করেন।

উড়িষ্যার কমিশনার হিসাবে রমেশচন্দ্র এই অনুন্নত অঞ্চলটির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছিলেন, সরকারী রিপোর্টেই এ-কথা স্বীকৃত হয়েছে। উড়িষ্যায় যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করদ মহল আছে, তখন কমিশনারকেও ঐগুলির দেখাশুনা করতে হোত। কমিশনারই ছিলেন এই করদ মহলগুলির তত্ত্বাবধায়ক। ১৮৯৫-৯৬ সালের এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্টে দেখা যায় যে: "The lieute-

mant Governor thanks the Commissioner for his efficient administration of the division and for his careful supervision of the Tributary states under his change." করদ মহলের রাজকুমারদের সরকারী কলেজে শিক্ষার ব্যবস্থা এই সময়কারই ঘটনা এবং প্রধানত রমেশচন্দ্রের উদ্যোগেই ইহা সম্ভব হয়েছিল। নাবালক রাজকুমারদের জন্য ঘোড়ায় চড়া, টেনিস খেলা প্রভৃতির ব্যবস্থা তাঁরই চেষ্টায় হয়েছিল। এই সময়কার একটী ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় নরসিংপুর ও পাল লাহেরার দুজন নাবালক রাজকুমার ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। তাঁরা সরকারী স্কুলের ছাত্র ছিলেন। কটক কলেজের অধ্যক্ষ হেলওয়ার্ড সাহেব তখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তিনি ভেবেছিলেন যে রাজকুমারেরা নিশ্চয়ই তাঁকে দেখতে পেয়েছেন, কিন্তু তাঁরা তাঁকে অভিবাদন করলেন না। অধ্যক্ষ এটাকে অপরাধ বলে গণ্য করেন এবং পরের দিন প্রকাশ্যে তিনি রাজকুমারদের বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করেন। রমেশচন্দ্র ছিলেন ঐ রাজকুমারদের অভিভাবক। বিষয়টি যখন তাঁর কর্ণগোচর হোল, তিনি অধ্যক্ষের এই কাজের নিন্দা করেন এবং সরকারের দৃষ্টিতে বিষয়টি নিয়ে আসেন। শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা এবং সরকার উভয়েই রমেশচন্দ্রের অভিযোগ শুধু সমর্থনই করলেন না, তাঁরা সেই উদ্ধত অধ্যক্ষের এই অশিষ্ট আচরণের কঠোর নিন্দাও করেন। এইভাবে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হবার পর হেলওয়ার্ড সাহেব এইরকম ঔদ্ধত্য আর কখনো প্রকাশ করেন নি। রমেশচন্দ্র এই ঘটনায় এতদূর বিচলিত হন যে তিনি রাজকুমারদের ঐ স্কুলে আর পড়তে দেন নি। রাজভক্ত রমেশচন্দ্রের এই মূর্তি শাসকশ্রেণীর কল্পনার অগোচর ছিল। উর্দ্ধতন মহলে এই ঘটনাটি নিয়ে সেদিন বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। রমেশচন্দ্র কিন্তু অবিচল ছিলেন। রাজভক্তি কোনোদিনই এই স্বদেশপ্রেমিকের কর্তব্যবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি।

১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতীয় সিবিল সার্বিস থেকে রমেশচন্দ্র অবসর নিলেন, যদিও তখনো চাকরির নির্দিষ্ট কাল উত্তীর্ণ হতে বেশ কয়েক বছর বাকী ছিল। কিন্তু বছরে একহাজার পাউণ্ড পেন্সন নিয়ে, কার্যকাল পূর্ণ হবার আগেই তিনি সিবিলিয়ানি খোলস ত্যাগ করলেন। এর নয়

বছর আগে থেকেই তিনি যে মনে মনে স্বদেশসেবার উন্নততর আদর্শ আর ব্যাপকতর ক্ষেত্র খুঁজছিলেন তা এই সময়ে তাঁর অগ্রজকে লেখা একখানি পত্রে জানা যায়। পত্রখানি গুরুত্বপূর্ণ। এর তারিখ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮। রমেশচন্দ্র লিখছেন: "ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে চাকরি আমার এখন অভিপ্রেত নয়। কেমব্রিজ, অক্সফোর্ড অথবা লণ্ডন বিশ্ববিছালয়ে যদি একটি রীডারসিপের চাকরি পাই তাই-ই আমার কাম্য—যদি অবশ্য আমার 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'-ই এ-বিষয়ে আমার যোগ্যতার একমাত্র নিদর্শন বলে বিবেচিত হয়। পেন্সনের অতিরিক্ত সামান্য একটু আয় আর সম্মান, এর বেশি আমার আর আকাঙ্ক্ষা নেই। ইংলণ্ডে এবং বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টে ভারতের দাবী তুলে ধরবার উদ্দেশ্যে একটি ভারতীয় দল গঠন করা—ইংলণ্ডে অবস্থানকালে এই-ই হবে আমার কাজ।"

কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ছিল না যে তিনি অবসর গ্রহণ করেন, কারণ বাংলা-প্রদেশের শাসনকার্য সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলী সম্পর্কে তখন তাঁর মতোন অভিজ্ঞ সিবিলিয়ান দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন না। তাই দেখা যায় যে, সিমলা থেকে চীফ সেক্রেটারি স্যার হেনরি কটন এই সময়ে এক পত্রে রমেশচন্দ্রকে লিখছেন: "You hold a very special position in the Service, and we can't afford to lose you"; আর ইণ্ডিয়া অফিস থেকে আণ্ডার-সেক্রেটারি তাঁকে লিখছেন: "Your voluntary retirement will be a great loss to Bengal." যাই হোক, শেষপর্যন্ত তিনি তাঁর সিদ্ধান্তেই অটল রইলেন। তাঁর বন্ধুজনও তাঁকে অবসরগ্রহণ থেকে বিরত হোতে কম প্রয়াস পান নি। রাজকার্যে এত সম্মান, এত প্রতিপত্তি কেউ ত্যাগ করে? শিক্ষিত জনসাধারণ ভাবলেন, তাঁর উপর সুবিচার করা হয়নি বলেই বুঝি রমেশচন্দ্র অসময়ে অবসর গ্রহণ করছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, সরকারী চাকরি তাঁর আর ভালো লাগছিল না। অবসর গ্রহণের দুটি কারণ অনুমান করা যেতে পারে। তাঁর জীবনীকার লিখেছেন: "An official career had always been his second love only; other ambitions, literary and national, had always exercised a far stronger attraction over him." সুতরাং তাঁর প্রথম অনুরাগ

ছিল সাহিত্যের প্রতি। কালজয়ী কিছু সাহিত্য-সম্পদ রেখে যাবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষাই রমেশচন্দ্রকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে টেনে এনেছিল। তখন তিনি পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ করেছেন; পেন্সন অবধারিত, কাজেই জীবনের অবশিষ্টকাল তিনি লক্ষ্মী অপেক্ষা সরস্বতীর আরাধনাতেই কাটিয়ে দেবেন ঠিক করলেন। কিন্তু এইটাই একমাত্র কারণ ছিল না। দেশ ক্রমশই স্বায়ত্তশাসনের পথে এগিয়ে চলেছে, এবং শাসনকার্যে বহুবিধ উদারনৈতিক সংস্কারের পক্ষে তখনকার সময়টা ছিল বিশেষভাবেই উপযুক্ত। শাসনকার্যের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে রমেশচন্দ্র এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন যে, শাসনকার্য পরিচালনায় ভারতীয়দিগকে যত বেশি সুযোগ দেওয়া হবে, ভারতে ইংরেজশাসন ততই ফলপ্রসূ ও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। তাঁর দেশবাসীর হয়ে এই অধিকার অর্জনের জন্য তিনি এই সময়ে মনের মধ্যে একটা প্রবল প্রেরণা বোধ করলেন। এই দুইটি কারণেই রমেশচন্দ্র অবসরগ্রহণে কৃতসংকল্প হলেন। তৃতীয় কারণ হিসাবে তাঁর স্বাস্থ্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত হবার পর থেকেই তাঁর স্বাস্থ্যের কিছুটা অবনতি ঘটতে আরম্ভ করে। তিনি অবসর গ্রহণ করার পর তৎকালীন লেফটেনেণ্ট গভর্ণর স্যর স্টুয়ার্ট বেলি একবার বলেছিলেন 'রমেশচন্দ্র দত্ত সিবিল সার্বিসের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন; তাঁর সময়ে তিনিই ছিলেন যোগ্যতম।"

॥ নয় ॥

রমেশচন্দ্রের সমগ্র জীবনে এইবার আরম্ভ হোল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আর একটি অধ্যায়।

"To educate the British public on Indian questions," তাঁর জীবনের এই পর্বে এই-ই ছিল তাঁর 'মিশন'।

এইবার সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্রের আধার থেকে বেরিয়ে এলেন মনীষি রমেশচন্দ্র, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র, অর্থনীতিবিদ্ রমেশচন্দ্র এবং সর্বোপরি, দেশপ্রেমিক রমেশচন্দ্র। তাঁর এইসময়কার চিন্তাধারা ও বহুবিধ কর্মপ্রয়াস সমকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে। বস্তুতঃ ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত—এই ছয় বৎসরকালেই রমেশচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা নানা দিক দিয়ে আমাদের জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টি সাধন করেছে এবং এই ক্ষেত্রে তাঁর দান সত্যই অতুলনীয় এবং অনেক বিষয়েই অনন্যপূর্ব। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের এই পর্বটি একটু বিস্তারিতভাবেই বলব, কেন না রমেশচন্দ্রের প্রতিভার প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করবার পক্ষে তাঁর জীবনের এই কয়েক বৎসরের ঘটনাবলী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করবার পরই রমেশচন্দ্র ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং সেখানে তাঁর অবস্থানকাল সুদীর্ঘ হয়েছিল। এইবার তাঁর য়ুরোপ যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। ভারতবর্ষে অধিকতর উন্নত শাসনব্যবস্থার অনুকূলে তিনি ইংলণ্ডের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সামনে ভারতবর্ষের সমস্যাগুলি তুলে ধরবেন ঠিক করলেন; এজন্য তাঁকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয় এবং বক্তৃতা দিতে হয়। তিনি শুধু ইংলণ্ডের জনমত গঠন করেই ক্ষান্ত ছিলেন না; হাউস অব কমন্স-এর বিশিষ্ট সভ্যদিগের মাধ্যমে তিনি বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টকে প্রভাবিতও করেছিলেন। সেইসঙ্গে সাহিত্য এবং ইতিহাসের ভেতর দিয়ে

য়ুরোপের বৃহত্তর জগতকে তিনি আবেদন জানিয়েছিলেন। পরিণত বয়সে মনীষি রমেশচন্দ্রের জীবনের এই ছিল সুমহৎ ব্রত এবং এই ব্রত উদ্‌যাপনে রমেশ-প্রতিভা কি ভাবে সার্থক হয়েছিল, আজ, এই সুদূরকালের ব্যবধানে, তার মূল্যায়ন করা সম্ভব। মোট কথা, ভারতের অনুকূলে ইংলণ্ডের জনমত গঠনের প্রয়াস, রমেশচন্দ্রের কর্মজীবনের অন্যতম, এবং আমার মতে, প্রধানতম কীর্তি। তাঁর বহুমুখী কর্মপ্রয়াসের এই অধ্যায়টি আজ পর্যন্ত একরকম অনালোচিতই রয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে আর একজনের নাম স্মরণীয়। তিনি দাদাভাই নৌরজি। সে সময়ে এই ক্ষেত্রে এই দু'জনের লেখনী ছিল অবিশ্রান্ত আর কণ্ঠ ছিল বলিষ্ঠ। *Poverty and the Un-British Rule in India* বইখানিতে নৌরজি ভারতে ইংরেজশাসনের শোচনীয় ব্যর্থতার যে বাস্তব চিত্র এঁকেছেন, তা তখনকার দিনে বহু সহৃদয় ইংরেজকে পর্যন্ত চিন্তার খোরাক জুগিয়েছিল। এইবার ইংলণ্ডের শিক্ষিত জনসাধারণের মনে অনুরূপ প্রভাব বিস্তার করল রমেশচন্দ্রের *England and India* নামক বইখানি। ১৮৯৭ সালের আগস্ট মাসে বিলেত থেকে এই বইখানি প্রকাশিত হয়। নামপত্রটি এইরূপ :

ENGLAND AND INDIA

A Record of Progress during A Hundred Years

1785-1885

By

R. C. Dutt

LONDON

CHATTO & WINDUS

1897

নানাদিক দিয়ে রমেশচন্দ্রের এই বইখানি উল্লেখযোগ্য। ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় শাসন-সংস্কার সম্পর্কে ভারতবাসীদের পক্ষ থেকে এমন গঠনমূলক প্রস্তাব এর আগে আর কেউ করেন নি। দেখা যায় যে, এ-ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্রই ছিলেন অনন্য এবং পরবর্তিকালে তাঁর এই চিন্তার সূত্র ধরেই ভারতশাসন

ব্যবস্থায় ব্রিটিশ পার্লামেন্ট থেকে একাধিক সংস্কার প্রবর্তিত হয়। সিপাহীযুদ্ধের পর ভারতশাসনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করেন মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং ১৮৯৭ সালে তাঁর রাজত্বের হীরক-জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হোল। ভারতশাসনের ইতিহাসে এবং নতুন ভারত গঠনের ইতিহাসে ১৮৫৮ থেকে ১৯০৫, এই সাতচল্লিশ বছর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রমেশচন্দ্রের সিবিলিয়ানি জীবনের সময়টা ছিল আরো গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই সময়ে শাসনযন্ত্রের কাঠামোর তিনি ছিলেন একটি উন্নত স্তম্ভস্বরূপ। ভারতশাসন সম্পর্কিত সমগ্র সমস্যাটি ছিল তাঁর নখদর্পণে। ভারতে ইংরেজশাসনের গতি ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে তিনি স্পষ্টতই বুঝেছিলেন যে, আজ হোক আর কাল হোক, এর নিয়তি-নির্দিষ্ট পরিণতি—স্বায়ত্তশাসন বা Self-government. ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারত সভার মঞ্চ থেকে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ অনুরূপ কথাই ঘোষণা করেছিলেন। এর ঠিক ন'বছর পরে অবসরপ্রাপ্ত শ্বেতাঙ্গ সিবিলিয়ান হিউম সাহেবের উদ্যোগে যখন ভারতের জাতীয় মহাসভা বা Indian National Congress প্রতিষ্ঠিত হোল, তখন থেকে ভারতবাসীর রাষ্ট্রনৈতিক চেতনায় এক নতুন দিগন্ত দেখা দিতে থাকে। রমেশচন্দ্র তখনো পর্যন্ত সরকারী চাকরিতে রয়েছেন, কিন্তু তখন থেকেই আমরা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করি রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ। সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেতনা থেকে তাঁর মতন দেশপ্রেমিকের দূরে সরে থাকা আদৌ সম্ভব ছিল না। রাজকার্যে তিনি যে নিষ্ঠা, যে আন্তরিকতা আর যে যোগ্যতা প্রদর্শন করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন, তার মোহ থেকে রমেশচন্দ্র সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন বলেই না, চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর দেশের কাজে, দেশের রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক উন্নতিসাধনের কাজে তিনি তেমনি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখাতে পেরেছিলেন। দেশভক্ত রমেশচন্দ্র এবার রাজভক্ত রমেশচন্দ্রকে অতিক্রম করে আত্মপ্রকাশ করলেন এক নতুন ভূমিকায়।

১৮৯৭ সাল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক-জয়ন্তী উৎসব নিঃসন্দেহে একটা বড়ো ঘটনা, অন্তত: ইংরেজদের কাছে। এই বছর ভারতে প্রত্যক্ষ ইংরেজ-

াসনের চল্লিশ বৎসরকাল পূর্ণ হোল। রমেশচন্দ্র তাই এই উপলক্ষ্যে শিক্ষিত
ংরেজদের সামনে ভারত ও ইংলণ্ডের সম্পর্কটা নতুন করে তুলে ধরলেন
াঁর *England and India* বইটিতে। ভূমিকায় তিনি লিখলেন:

"As an Indian who has carefully studied the history f his country during the present century, who has itnessed the great events which have taken place in India uring the last forty years, and who has taken his humble ıare in working the Indian administration during a uarter of a century, the writer of these pages ɔnestly endeavoured to place the real needs of his ɔuntry and the views ot his countrymen before the ritish public. It is a review of reforms and popular rogress in India in the past and a forecast of the reforms ɔnceded in the future.... The history of progress in ngland and the history of progress in India have flowed ı parallel streams."

"ইংলণ্ডের উন্নতি ভারতবর্ষের উন্নতি দুই-ই সমান্তরাল রেখায় চলেছে,"
মশচন্দ্রের এই সিদ্ধান্তটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। "Criticism of Govern-
ent action when rightly understood is a help to good
overnment"—এই মতবাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন বলেই রমেশচন্দ্রের
ক্ষে শাসনসংস্কার সম্পর্কে গঠনমূলক উপায় নির্দেশ করা সম্ভবপর হয়েছিল।
াচটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই বইখানি প্রকাশিত হওয়া মাত্র ইংলণ্ডের শিক্ষিত
মাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। রমেশচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে,
ই দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল পরে এমন সময় এসেছে যখন ভারতে ইংরেজ-
াসন সম্পর্কে একটি তদন্ত হওয়া উচিত। তাঁর এই নির্ভীক মতবাদ 'দি
ম্যান', 'দি টাইমস' প্রভৃতি সংবাদপত্রে সমর্থিত হয়েছিল। অতীতের
াসনসংস্কার সম্পর্কে তিনি যেমন আলোচনা করেছেন, তেমনি বর্তমানে কি
রণের সংস্কার প্রয়োজন তারও একটি খসড়া নির্দেশ তিনি এই প্রসঙ্গে

দিয়েছেন। রমেশচন্দ্রের মতে ভারতে ইংরেজশাসনের সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি যেট সেটা হোল, তাঁর নিজের কথায়, "the lack of representative Govern ment and the comparatively small share given to native of the country in the higher offices of the public service রমেশচন্দ্র সেদিন স্পষ্টতই একটি মৌল প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং তাঁর যুক্তি সারবত্তা অনুধাবন করে, বইখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে 'টাইমস'-এর মতে সংরক্ষণশীল সংবাদপত্র লিখল: "Mr. Dutt's book is suggestive in a high degree. He believes the time has come for a genera inquiry into British rule in India; he *demands* for th Indian races some form of representation in addition t what has been already conceded to them." ' এখানে 'demand কথাটি লক্ষ্য করবার মতোন। ভারতে ইংরেজশাসনের ঐতিহাসিক ভূমিক সম্পর্কে রাজা রামমোহন রায়ের মনে যেমন কোনো সংশয় ছিল না, তেমনি সংশয় ছিল না রমেশচন্দ্রের মনে। আবার রামমোহন যেমন ভারতবাসী সর্বাঙ্গীন কল্যাণের স্বার্থে শাসনব্যবস্থায় সংস্কারের দাবী তুলেছিলেন, তা প্রতিধ্বনি আমরা পরবর্তিকালে শুনেছি কেশবচন্দ্র সেনের কণ্ঠে, দাদাভা নৌরজির কণ্ঠে আর উনবিংশ শতাব্দের শেষ পাদে দাঁড়িয়ে রমেশচন্দ্রও সে দাবী তুললেন। এ দেশের শাসনব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রবর্তনে, শাসনয আরো ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তা স্বীকারের পক্ষে, সেদিন রমেশচ দত্তের এই একখানি বই-ই যথেষ্ট ছিল। আয়তনে ক্ষুদ্র হোলেও, বিষয়বস্ত গুরুত্বে এর মূল্য সেদিন বড়ো কম ছিল না। সেইজন্যই বোধ হয় ব্রিটি পার্লিয়ামেণ্টে হাউস অব কমন্স-এর ভারত-হিতৈষী সদস্যবৃন্দের কাছে *Englan and India* পুস্তকখানি যথোচিত মর্যাদা এবং স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

১৮৯৮ সাল। নববর্ষের প্রারম্ভে আমরা দেখতে পাই যে রমেশচন্দ্র লণ্ড য়ুনিভার্সিটিতে ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হোলেন। ইতিপূর্বে লণ্ডনের বিদগ্ধসমাজে তাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় ই

ও সংস্কৃতির একজন গবেষক হিসাবে। তাই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ মেশচন্দ্রের বিলাতে উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাঁকে তিন বছরের জন্য ধ্যাপকপদে নিযুক্ত করেন। একমাত্র দাদাভাই নৌরজি ব্যতীত আর কোনো রতীয়ের ভাগ্যে তখন এই সম্মানলাভ ঘটে নি। এই পদের জন্য কোনো বেতন ছল না; বক্তৃতায় উপস্থিত ছাত্রদের নিকট থেকে নির্দিষ্ট হারে এককালীন কটি ফী গ্রহণ করা হোত। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল: ভারতের প্রাচীন তিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও কাব্য। এই বক্তৃতাগুলি প্রস্তুত করবার সময়ে তনি গভীরভাবে গবেষণাকার্যে মনোনিবেশ করলেন। এরই ফল ভারতীয় াহিত্য-সংস্কৃতি মূলক কয়েকখানি ইংরেজি গ্রন্থ। প্রাচীন ভারতের বিবিধ ন্তাধারার সঙ্গে, আমরা দেখতে পাই যে, সমসাময়িককালে দু'জন ভারতীয় নীষি ইংরেজ সমাজকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাদের পূর্ব-সংস্কার যাচাই করে নিতে হায়তা করলেন—এঁদের একজন রমেশচন্দ্র, অন্যজন বিবেকানন্দ। এ যে ত বড়ো হিতসাধন তা আজ আমরা সহজে উপলব্ধি করতে পারব না। রতবর্ষ সম্পর্কে ইংরেজদের মনে তখন একটা অদম্য কৌতূহলের সৃষ্টি য়েছে। হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ এর কিছু আগে লণ্ডনে এসে প্রচুর ালোড়নের সৃষ্টি করে গিয়েছেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে অক্লান্তকর্মা ভারত-হৈতৈষী দাদাভাই নৌরজির প্রয়াসও এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এমন

রমেশচন্দ্র দত্ত যে লণ্ডনকে তাঁর কর্মস্থল বলে গণ্য করবেন, সেদিন এটা বই স্বাভাবিক ও সঙ্গত ছিল। ২০শে জানুয়ারি য়ুনিভার্সিটি কলেজে তাঁর *The Study of Indian History* সম্পর্কিত বক্তৃতামালা আরম্ভ হয়। এই বিষয়ের ওপর তিনি সর্বসমেত ত্রিশটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং তাঁর দ্বিতীয় র্যায়ের বক্তৃতাগুলি শুরু হয় ঐ বছরের অক্টোবর মাসে। প্রাচীন গ্রীস ও রামের ইতিহাস সম্পর্কে য়ুরোপের বিদ্যালয়গুলিতে যে রকম আগ্রহের সঙ্গে ঠন-পাঠন হয়, রমেশচন্দ্র অনুযোগ করে বললেন, ঠিক সেইরকম আগ্রহ িলক্ষিত হয় না প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের পঠন-পাঠন সম্পর্কে। এই নুযোগের একটা প্রত্যক্ষ ফল এই দেখা দিয়েছিল যে, এর কিছুকাল পরেই রতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে ওদেশের শিক্ষায়তনগুলিতে রীতিমত অনুশীলন আরম্ভ হোতে থাকে।

১৮৯৮ সাল শেষ হবার পূর্বে ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত চব্বিশ সভায় তিনি বক্তৃতা করেন ; নতুন সিডিশন বিল, নতুন কলিকাতা মিউনিসি প্যাল বিল এবং ভারত সরকারের সীমান্ত নীতি—প্রধানতঃ ইহাই ছিল তাঁ বক্তৃতার বিষয়। এইসময়ে লণ্ডনে উপস্থিত থেকে আর যে দু'জন বরেণ্য ভারতী রমেশচন্দ্রের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন হোলে দাদাভাই নৌরজি অন্যজন আনন্দমোহন বসু। ভারতসম্পর্কে ইংলণ্ডের জনমত গঠনে এই তিনজনের প্রয়াস ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হোয়ে আছে। ১৮৯৮, ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে গভর্ণর-জেনারেলের বিধান পরিষদে (Legislativ Council) নতুন সিডিশন বিল যখন আইনে পরিণত হোল, রমেশচন্দ্র তখ তার প্রতিবাদ করে ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকায় একখানি পত্র প্রকা করলেন। সেই পত্রে তিনি বলেছিলেন যে, বিলটি আইনে রূপান্তরিত হবা পর হাউস অব কমন্স-এ আলোচিত হওয়ার কোনো সার্থকতাই ছিল না ভারতবর্ষের জনমত প্রকাশে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করাই ছিল এই নতুন আইনের প্রধান লক্ষ্য। শ্বেতাঙ্গসমাজ-পরিচালিত সংবাদপত্রগুলিতেও সরকারী নীতির সমালোচনা বড়ো কম প্রকাশিত হোত না। রমেশচন্দ্র তাই তাঁর পত্রে বললেন, এই আইন তাদের সম্পর্কেই বা কেন না প্রযুক্ত হবে ? আইন সকলের পক্ষেই সমানভাবে প্রযুক্ত হবে, এই চিরাচরিত নীতির কেন ব্যতিক্রম হবে ? রমেশচন্দ্র অভিজ্ঞ সিবিলিয়ান। দেশীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত মন্তব্য-গুলি সাধারণতঃ অধস্তন সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা বিকৃত হোয়ে ঊর্ধ্বতন মহলের গোচরীভূত হোত, তা তাঁর বিশেষভাবে জানা ছিল। তাই দেশীয় সংবাদপত্রের পক্ষ সমর্থন করে তিনি সেদিন বলেছিলেন, "The Indian Government is often misled by extracts made by subordinates into thinking the vernacular papers far worse than they are." বর্ধমান বিভাগের কমিশনার থাকাকালীন ভারতীয় সংবাদপত্র সম্পর্কে রমেশচন্দ্র যে রিপোর্ট রচনা করেছিলেন এই প্রসঙ্গে সেটিও স্মরণীয়।

২০শে জুন, ১৮৯৮। স্থান : সেণ্ট মার্টিন টাউন হল।

আজ এখানে ভারতীয়দের একটি সভা হবে। সভাপতি দাদাভাই নৌরজি। এই সভায় আলোচনার বিষয়ঃ নতুন সিডিশন আইন, কলিকাতা পৌরসভাকে স্বায়ত্ত-শাসনের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করার প্রস্তাব এবং সীমান্ত-যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয় ভারতবর্ষের উপর চাপানর জন্য ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের সিদ্ধান্ত। বিষয় তিনটিই ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন সভাপতি স্বয়ং, তৃতীয়টি সম্পর্কে আনন্দমোহন বসু আর দ্বিতীয় প্রস্তাবটি আলোচনা করলেন রমেশচন্দ্র। ভারত সরকার সম্প্রতি আইন প্রণয়ন সম্পর্কে যেরকম বেপরোয়া ও কাণ্ডজ্ঞানরহিত মনোভাব প্রদর্শন করেছেন (রমেশচন্দ্রের নিজের কথায়ঃ "The disastrously reckless and unwise legislation of the Government of India."), কর্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হোয়েই রমেশচন্দ্র তার প্রতিবাদ করতে কিছুমাত্র কুন্ঠিত করলেন না। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ন্যায়বিচারের ওপর ভারতের জনসাধারণ বরাবরই বিশ্বাসপোষণ করে এসেছে, এই কথা বলে রমেশচন্দ্র যখন বললেন, "কিন্তু গত দুই বৎসরকালের মধ্যে এই বিশ্বাসের ভিত্তিমূল শিথিল হয়ে পড়েছে," তখন সভায় তুমুল চাঞ্চল্য দেখা দেয়। উচ্ছ্বাস বা আবেগের দ্বারা পরিচালিত হবার মানুষ তিনি ছিলেন না। জীবনের দীর্ঘকাল তিনি সরকারী শাসনব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, কাজেই তাঁর মতোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি যখন এমন কথা উচ্চারণ করেন, তখন তার গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন সবচেয়ে বিতর্কমূলক বিষয় ছিল 'দি বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল য়্যাক্ট' এবং এই আইনের বলেই কলিকাতা পৌরসভার শাসনতন্ত্র আমূল সংশোধন করে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় (তখনকার নাম বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল) একটি বিল ('দি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল বিল') উত্থাপিত হয়। সমকালীন কলিকাতার ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই বিলের প্রতিবাদে রমেশচন্দ্র সেদিন ইংলণ্ডে বসে যে বিপুল প্রয়াস পায়েছিলেন, তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য। এই প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার আত্মচরিতে লিখেছেন:

"The Calcutta Municipal Bill was a local measure, but it had an all-India interest as it affected the principle of

Local self-government, in the growth and development of which all India felt a concern ..My esteemed friend, Mr. R. C. Dutt was in England when we started the agitation against the Bill. I placed myself in communication with him. It was chiefly through his efforts that the great debate on the Bill was organised."*

কলিকাতা পৌরসভার পক্ষ থেকে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব এক পত্রে রমেশ-চন্দ্রকে জানালেন যে, পার্লিয়ামেন্টে এই বিলের প্রতিবাদ করবার জন্য তাঁকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হোল। ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান, ইণ্ডিয়া ও টাইমস প্রভৃতি পত্রিকায় বিলের বিরুদ্ধে একাধিক পত্র প্রকাশ করে তিনি ইংলণ্ডের জনমতকে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করলেন। ওয়েস্টমিনিস্টার টাউন হলে এবং ম্যাঞ্চেস্টারে দুইটি প্রকাশ্য সভায় এই সম্পর্কে তিনি বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। ম্যাঞ্চেস্টারের বক্তৃতায় বিশপ হিয়ারফোর্ড সভাপতিত্ব করেন। তারপর লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটির বার্ষিক সম্মেলনে রমেশচন্দ্র এই বিষয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন: "That this Conference deplores all legislation restricting self-government in India, and urges the Government to withdraw the Calcutta Municipal Bill."

সুরেন্দ্রনাথ তখন কাউন্সিলের সদস্য। আইনসভায় তিনি বিলের প্রবল বিরোধিতা করলেন; কলকাতার টাউন হলে একাধিক জনসভায় প্রতিবাদ ধ্বনিত হোল। মিঃ এন এন ঘোষ এই বিলের ওপর এইসময়ে যে পুস্তিকাটি রচনা করেন, ইংলণ্ডে রমেশচন্দ্রের মারফৎ তা ব্যাপকভাবে বিতরিত হয়। এই-সময়ে লণ্ডন থেকে প্রেরিত এক পত্রে (এই চিঠির তারিখ ৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯) রমেশচন্দ্র রাজা বিনয়কৃষ্ণকে লিখছেন: "My repeated speeches and letters to the *Guardian* and the *Times* have had some effect on the public opinion in this country; not a voice is raised to defend the Bill." কিন্তু বিলের বিরুদ্ধে এত আন্দোলন, এ-দেশে ও-দেশে এত প্রতিবাদ সবই নিষ্ফল হয়। লর্ড কার্জনের প্রতিক্রিয়াশীল

* *A Nation in Making*: S. N. Banerjea

নীতিরই জয় হয়। বিলটি আইনে পরিণত হয়। ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৯৮ তারিখের ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে একখানি সুদীর্ঘ পত্রে রমেশচন্দ্র লিখলেন: "The death of self-government will be the dcath of good administration in India. You can not govern India well except with the co-operation of the people, you cannot secure their co-operation without trusting them with some powers."

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কলিকাতা পৌরসভার ক্ষমতা সঙ্কুচিত করে যখন এই কুখ্যাত বিলটি পার্শ হয়, তখন এর প্রতিবাদে ১৮৯৯ সালে আটাশজন দেশীয় কাউন্সিলর একযোগে পদত্যাগ করেছিলেন। সেদিনের সেই ঘটনাটিকে রসরাজ অমৃতলাল বসু তাঁর 'সাবাস আটাশ' শীর্ষক কবিতায় স্মরণীয় করে গেছেন। এইভাবেই এই ঘটনাটির ওপর যবনিকা নেমে এসেছিল। কলিকাতা পৌরসভার ইতিহাসে ইহাই কুখ্যাত 'ম্যাকেঞ্জি আইন'; স্যর আলেকজান্দার ম্যাকেঞ্জি তখন বাংলার ছোটলাট ছিলেন।

যে দু'বছর তিনি এইরকম বিবিধ রাজনৈতিক কার্যকলাপে ব্যস্ত ছিলেন, সেইসময় কিন্তু রমেশচন্দ্রের সাহিত্যকর্ম কিছুমাত্র ব্যাহত হয় নি। 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত', এই মহাকাব্য দুইখানির কাহিনীর সারাংশ নিয়ে তিনি এইসময়েই ইংরেজিতে কাব্যানুবাদ রচনা ও প্রকাশ করেন। ইংরেজি গদ্যরচনায় রমেশচন্দ্র সুদক্ষ ছিলেন, কিন্তু ইংরেজিতে কাব্যরচনার উপযোগী প্রতিভা তাঁর তেমন ছিল না, এ তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। মহাভারতের কাব্যানুবাদ যখন সম্পূর্ণ হয় তখন তিনি প্রথমে তা অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারকে দেখালেন। সেই অনুবাদ পাঠ করে অধ্যাপক এমনই মুগ্ধ এবং বিস্মিত হন যে, তিনি এর একটি ভূমিকা লিখে দিতে সম্মত হন। ১৮৯৮ সালের আগস্ট মাসে 'মহাভারত' প্রকাশিত হয় এবং এর এক বছর পরে বেরুল 'রামায়ণ'। য়ুরোপ গর্ব করে তার 'ইলিয়ড' আর 'ওডিসি নিয়ে, কিন্তু এই দুইখানি য়ুরোপীয় মহাকাব্য একত্র করলে যা হয় ভারতীয় মহাকাব্য মহাভারতের আয়তন তার সাতগুণ।

কী এই মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য, কী এর বাণী, ইংরেজি পাঠকদের সামনে রমেশচন্দ্র তাই তুলে ধরতে চাইলেন। 'মহাভারত' কাব্যানুবাদের ভূমিকার একাংশে তিনি লিখেছেন: "Though vast portions of the original are skipped over, those which are presented are the portions which narrate the main incidents of the Epic, and they describe those incidents as told by the poet himself." আর কেন তিনি পদ্যে এর অনুবাদ করলেন ভূমিকায় তার কারণ উল্লেখ করে রমেশচন্দ্র লিখেছেন: "মূলের অন্তর্নিহিত যে মাধুর্য, সংস্কৃত শ্লোকগুলির যে সঙ্গীতময় ঝঙ্কার, অনুবাদে তা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয় নি। মূল কাব্যে সংস্কৃতের একটি বিশেষ ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে আর প্রতিটি পঙক্তি ষোল অক্ষর সমন্বিত। ইংরেজ পাঠকরা ঠিক যে রকম ছন্দের সঙ্গে অভ্যস্ত, আমি এই অনুবাদে ঠিক অনুরূপ একটি ছন্দ ব্যবহার করেছি। আমার বন্ধু অধ্যাপক এডমণ্ড রাসেল, এই অনুবাদ কার্যে আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন।" এই অনুবাদ-গ্রন্থের ভূমিকাটি সুদীর্ঘ এবং মূল্যবান। কাব্যানুরাগী পাঠককে আমি তাই রমেশচন্দ্রের এই ভূমিকাটি একবার পাঠ করতে অনুরোধ করি। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উজ্জ্বলতম নিদর্শন মহাভারত মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি চমৎকার বিশ্লেষণ আছে এই ভূমিকাটির মধ্যে। মহাভারতের গৌরব চরিত্রচিত্রণে; তাই রমেশচন্দ্র লিখেছেন: "No work of the imagination that could be named is so rich and true as the *Mahabharata* in the portrature of the human character... It is an encylopaedia of the life and knowledge of ancient India." কিন্তু মহাভারত সম্পর্কে রমেশচন্দ্র এর চেয়েও বড়ো কথা বলেছেন। ভারতের কোটি কোটি হিন্দুর কাছে যুগ যুগ ধরে এই মহাকাব্যখানি একটি জাতীয় সম্পদরূপে পরিগণিত হয়ে এসেছে, মহাভারতের প্রকৃত গৌরব তো এইখানেই। রমেশচন্দ্র তাই লিখেছেন: "No work in Europe, not Homer in Greece, or Virgil in Italy, not Shakespeare or Milton in English-speaking lands, is the national property of the nations to the same extent as the Epics of India are

of the Hindus." জাতীয় মহত্ত্বে কতখানি বিশ্বাসী হোলে পরে, এমন ভাবে চিন্তা করা যায় এবং এমন কথা প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা যায়, রমেশচন্দ্রের এই উদ্ধৃতিটি তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। রমেশ-মনীষার স্বাতন্ত্র্য এইখানেই।

রমেশচন্দ্র-কৃত অনুবাদের একটু নিদর্শন এখানে তুলে দিলাম। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় তাঁর পাণিপ্রার্থী হয়ে একে একে বহু রাজন্যের সমাগম হয়েছে। সভায় অঙ্গদরাজ কর্ণের প্রবেশের চিত্রটি রমেশচন্দ্রের অনুবাদে এইরকম ফুটেছে :

"Now the feats of arms are ended, and the closing hour draws nigh.
Music's voice is hushed in silence, slow disperse the passers-by,
Hark! like welkin-shaking thunder makes a deep and deadly sound,
Clank and din of warlike weapons burst upon the tented ground!
Are the solid mountains spliting? Is it bursting of the earth?
Is it tempest's pealing accent whence the lightning takes its birth?
Thoughts like these alarm the people, for the sound is dread and high,
And upon the lofty gateway turns the crowd with anxious eye!"

রামায়ণের ভূমিকাটিও অনুরূপ সারগর্ভ ও সুদীর্ঘ। ভূমিকার প্রারম্ভে রমেশচন্দ্র মহাভারত ও রামায়ণ মহাকাব্য দুইখানির একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে রামায়ণই শ্রেষ্ঠ, কারণ, "The *Ramayana*

is immeasurably superior in its delineation of those softer and perhaps deeper emotions which enter into our everyday life, and hold the world together." এই মহাকাব্যের নায়ক লোকোত্তরচরিত্র রামচন্দ্র সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, প্রজাদের জন্য রামচন্দ্রের ভালবাসা, রামচন্দ্রের প্রতি প্রজাদের আনুগত্য, মহাকবি বাল্মীকির লেখনীতে এক আশ্চর্য রূপ পরিগ্রহ করেছে। যুগে যুগে রামচন্দ্রের চরিত্র হিন্দুদের অনুপ্রাণিত করেছে এবং এ-কথা বলা যেতে পারে যে, এই আদর্শচরিত্রের মধ্যেই সমগ্রভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সর্বকালের হিন্দুজাতির চরিত্র। রামচন্দ্রের কর্তব্যপরায়ণতা, তাঁর পিতৃভক্তি, তাঁর ভ্রাতৃবাৎসল্য, পৃথিবীর আর কোনো কবির কল্পনায় আমরা পাই না। যুদ্ধ-বিগ্রহেব লোমহর্ষক ঘটনার বর্ণনার জন্য নয়, গার্হস্থ্যজীবনের সুখদুঃখের চিরন্তন মধুর চিত্রই রামায়ণ মহাকাব্যকে একটি স্বতন্ত্র মহিমা দিয়েছে। এইজন্যই ভারতবর্ষের সর্বশ্রেণীর হিন্দুর কাছে ইহা এত প্রিয়। সীতা হিন্দুনারীর নিকট একটি আদর্শ চরিত্র হিসাবে সম্পূজিতা। রমেশচন্দ্র তাঁর ভূমিকায় সীতাসম্পর্কে লিখেছেন: "Sita holds a place in the hearts of women in India which no other creation of a poet's imagination holds among any other nation on earth." এই প্রসঙ্গে তিনি প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন ভারতের জীবনাদর্শের তুলনামূলক আলোচনা করে একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন: "The ideal of life was joy and beauty and gladness in ancient Greece; the ideal of life was piety and endurance and devotion in ancient India. The tale of Helen was a tale of womanly beauty and loveliness which charmed the western world. The tale of Sita was a tale of womanly faith and self-abnegation which charmed and fascinated the Hindu world." মনস্বী রমেশচন্দ্রের দৃষ্টিতে প্রাচীন হিন্দুভারতের এই মহাকাব্য দুইখানির গৌরব ও গুরুত্ব সেদিন এইভাবে উপলব্ধ হয়েছিল বলেই না ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তিনি অতখানি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। শিক্ষায় এবং আচরণে তিনি 'পাকা সাহেব' ছিলেন, আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম না

হয়েও তিনি ব্রাহ্মধর্মের সংস্কারমুক্ত উদার ভাবধারার অনুসারী ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, সেযুগে তাঁর মতন সত্যকার হিন্দু খুব বেশি ছিলেন না।

পৃথিবীতে কোনো মহৎ কবির সৃষ্টি কালজয়ী হতে পারে না, যদি না তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কিছু চিরন্তন সত্য নিহিত থাকে। কবির সৃষ্টির সার্থকতা এইখানেই। ভারতের কালজয়ী মহাকাব্য দুইখানি অনুশীলন করে রমেশচন্দ্র এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে: "No work of the imagniation abides long unless it truly embodies some portion of our human feeling and human life," এবং তাঁর এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। প্রাচীন হিন্দুভারতকে জানতে হোলে, প্রাচীন হিন্দুজাতির জীবনাদর্শকে বুঝতে হোলে, মহাভারত এবং রামায়ণ এই দুইখানি মহাকাব্যের অনুশীলন অপরিহার্য। এই দুই মহাকাব্যের ভাবধারার মধ্যেই আছে হিন্দুজাতির সমগ্র পরিচয়। রমেশচন্দ্র তাই লিখেছেন: "মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক জীবন, তার শৌর্য, বীর্য ও আকাঙ্ক্ষার কথা; আর রামায়ণে প্রাচীন ভারতের অনুপম গার্হস্থ্যজীবনের যত কিছু মাধুর্য, ধৈর্য, ভক্তি এবং ধর্মাচরণ। একটি চিত্রকে বাদ দিলে অন্য চিত্রটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।" সবশেষে তিনি লিখেছেন: "The two together gives us a true and graphic picture of ancient Indian life and civilization and no nation on earth has presented a more faithful picture of its glorious past. To trace the influence of the Indian Epics on the life and civilization of the nation, and on the development of their modern languages, literatures, and religious reforms, is to comprehend the real history of the people during three thousand years."

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের পুরোধা যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে আমরা এমন কাউকে পাইনি যিনি প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শের অনুশীলনে এমনভাবে মহাভারত ও রামায়ণের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। রমেশচন্দ্রের মহাভারত ও রামায়ণ কাব্যের অনুবাদ হয়ত কাব্যবিচারে উচ্চাঙ্গের হয়নি,

কিন্তু তাঁর সমগ্র প্রয়াসের ভেতর দিয়ে যে শ্রদ্ধা এবং জাতীয় মহত্ত্বে বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে, তার মূল্য বড়ো কম নয়। ইংলণ্ডের বিদগ্ধ সমাজে তাঁর এই কাব্যানুবাদ দুখানি যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল এবং অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার মহাভারত কাব্যানুবাদের একটি ভূমিকা লিখে দিয়ে শুধু রমেশচন্দ্রের প্রতিভাকে সম্মানিত করেন নি, সেইসঙ্গে সমগ্র ভারতবাসীকে তিনি সম্মান জানিয়েছেন। ইংলণ্ডের একাধিক পত্রিকায় এই কাব্যানুবাদ দুখানি সমালোচিত হয়। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে, দুইখণ্ড পুস্তক অতি সুদৃশ্যভাবে বাঁধিয়ে রমেশচন্দ্র মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উপহার-স্বরূপ প্রদান করেন। কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে এই কাব্যানুবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল : "As literary effort, it is certainly a very great success" রমেশচন্দ্র মূলতঃ এই অনুবাদকার্যে হাত দিয়েছিলেন ইংরেজ পাঠকদের সামনে ভারতীয় মহাকাব্য দুখানির পরিচয় তুলে ধরবার জন্য। তাঁর সমকালীন বিশিষ্ট ভারতীয়দের মধ্যে এই কাব্যানুবাদ সম্পর্কে কে কি মত প্রকাশ করেছিলেন তা জানা যায় না, যদিও দেখা যায় যে, তাঁর জীবনচরিতকার লর্ড কার্জন, লর্ড রিপন প্রভৃতি খ্যাতনামা ইংরেজ রাজপুরুষদের প্রচুর মতামত উদ্ধৃত করেছেন।

রামায়ণ ও মহাভারতের আদর্শে রমেশচন্দ্র কতখানি বিশ্বাসী ছিলেন, তার প্রমাণ শুধু এই অনুবাদ নয়, এই সম্পর্কে তিনি পরবর্তিকালে দুটি উল্লেখযোগ্য লিখিত প্রবন্ধও পাঠ করেছিলেন। মহাভারত সম্পর্কে প্রবন্ধটি পাঠ করেন ১৪ই জুন, ১৮৯৯ আর রামায়ণ সম্পর্কে প্রবন্ধটি ১৪ই অক্টোবর, ১৯০০। প্রবন্ধ দুটিই রয়্যাল সোসাইটি অব লিটারেচার নামক বিদগ্ধ সমিতিতে পঠিত হয়। ১৮৯৯ সালে তিনি উক্ত সোসাইটির একজন 'ফেলো (Fellow) নির্বাচিত হন। তখন হ্যানোভার স্কোয়ারে সোসাইটির নিজস্ব ভবন ছিল এবং রমেশচন্দ্র রামায়ণ ও মহাভারত সম্পর্কে প্রবন্ধ দুটি ঐখানেই পাঠ করেছিলেন। তাঁর পূর্বে এই সম্মান লাভ আর কোনো ভারতীয় লেখকের ভাগ্যে ঘটেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রমেশচন্দ্রের সমসাময়িককালে অরবিন্দ ঘোষ বরোদায় থাকাকালীন ইংরেজি ভাষায় রামায়ণ-মহাভারতের অনুরূপ কাব্যানুবাদ করেন এবং রমেশচন্দ্র ঐ পাণ্ডুলিপি দেখে লেখকের কবিত্বপ্রতিভার প্রশংসা করেছিলেন। রমেশচন্দ্র কবি ছিলেন না, অরবিন্দ কবি ছিলেন; তাই তাঁর

অনুবাদ অপেক্ষাকৃত কবিত্বসুষমামণ্ডিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু রমেশচন্দ্রের কাব্যানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে জেনে, অরবিন্দ তাঁর অনুবাদ প্রকাশে সে সময়ে বিরত ছিলেন। রমেশচন্দ্রের রামায়ণ-মহাভারত প্রীতি তাঁর 'ধর্মকন্যা' নিবেদিতার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, এ-কথাটাও এখানে উল্লেখ করা দরকার।

এইসময়ে রমেশচন্দ্র আরো একটা প্রয়োজনীয় বিষয়ে মনোনিবেশ করে-ছিলেন। স্বর্ণকে ভারত সাম্রাজ্যের প্রচলিত মুদ্রার (currency) মান (standard) হিসেবে ধার্য করা এবং কৃত্রিমভাবে রৌপ্যের বিনিময় মূল্য (exchange value) ধার্য করার জন্য ভারত সরকার একটি প্রস্তাব করেন। রমেশচন্দ্র এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে একখানি পত্র প্রকাশ করলেন। ১৮৯৮ সালের নভেম্বর মাসে ঐ পত্রখানি 'গার্ডিয়ানে' প্রকাশিত হয়। সেই পত্রের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হোল। রমেশচন্দ্র লিখেছিলেন: "With regard to the currency question, the educated people of India are practically unanimous against the closing of mints and the raising of the value of the rupee artificially." এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তি এই রকম ছিল, যথা: (১) রৌপ্য ভারতবাসীর জাতীয় সম্পদ; কারণ ভারতীয় স্ত্রীলোকদের জন্য প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য অলঙ্কার তৈরি হয়ে থাকে; ইহাই ভারতীয়দের এক প্রকার সঞ্চয়। কৃত্রিম উপায়ে টাকার দাম বৃদ্ধি করলে জাতীয় সম্পদের শতকরা বিশ-ত্রিশ ভাগই আত্মসাৎ করা হবে। সুতরাং "It is an act of confiscation all the more cruel because it touches the poor millions of India;" (২) ভারতের চাষীরা (ভারতীয় জনসংখ্যার পাঁচ ভাগের চার ভাগই চাষী) টাকায় খাজনা দেয়। কৃত্রিম উপায়ে টাকার দাম বৃদ্ধি করা আর তাদের খাজনা বৃদ্ধি করা একই কথা। এদেশের চাষীদের দারিদ্র্য অবর্ণনীয়, এই ব্যবস্থার ফলে তারা আরো দরিদ্র হয়ে পড়বে; (৩) মহাজনদের কাছে চাষীরা ঋণভারে জর্জরিত; টাকার

হিসাবেই এই ঋণ ধার্য হয়ে থাকে। টাকার দাম বৃদ্ধি করার অর্থ মহাজনদের কাছে চাষীদের ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। এর ফলে সম্পত্তিসম্পন্ন মহাজনদের উপকার হবে আর অন্যদিকে ঋণভারে জর্জরিত চাষীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে; (৪) ধনী ও দরিদ্র নির্বিশেষে ভারতীয়রা যে কর প্রদান করে তা তারা টাকা দিয়েই করে থাকে। সুতরাং টাকার মূল্য বৃদ্ধি করা আর দেশের করভার বৃদ্ধি করা একই কথা; এবং (৫) ভারতের সরকারী ঋণের (public debts) বেশির ভাগই ভারতীয় মুদ্রায় (Rupee) নির্ধারিত হয়ে থাকে। সুতরাং টাকার মূল্য বৃদ্ধি করা আর সরকারী ঋণের মাত্রা বৃদ্ধি করা একই কথা। যাদের কাছে গভর্ণমেন্টের বণ্ড (Bond) আছে, একমাত্র তারাই এর দ্বারা উপকৃত হবে। তাঁর এই যুক্তির মধ্যে রমেশচন্দ্র এক জায়গায় 'Government' কথাটির অর্থ করেছেন 'The Indian Nation'; তখনকার দিনে এই চিন্তা বা concept একজন সিবিলিয়ানের পক্ষে কম সাহসের পরিচায়ক ছিল না। সমগ্র প্রস্তাবটি একান্তভাবেই জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী—এই সাবধানবাণীই সেদিন তাঁর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল।

ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে মাত্র একখানি পত্র প্রকাশ করে রমেশচন্দ্র নিরস্ত হোলেন না। কারেন্সী কমিটির সামনে এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন (৩০ নভেম্বর, ১৮৯৮)। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন স্যর হেনরি ফাউলার। উক্ত কমিটির সামনে প্রদত্ত রমেশচন্দ্রের সাক্ষ্যকে ফাউলার সাহেব প্রশংসনীয় বা 'splendid' বলে অভিহিত করেছিলেন। এই কমিটির সামনে রমেশচন্দ্রকে একশো বাইশ দফা প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং এর প্রত্যেকটার তিনি সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছিলেন। শেষ তিনটি প্রশ্ন ও তার উত্তর এখানে তুলে দেওয়া হোল:

প্রশ্ন: For all these reasons that you have very clearly put before us, you are opposed to the proposals of the Government of India ?

উত্তর: I am strongly opposed to them.

প্রশ্ন: Do you upon this (currency) question represent the views of the Indian National Congress ?

উত্তর : No, I do not belong either to the Indian National Congress or to its British Committee.

প্রশ্ন : But do you represent a mass of native opinion that you feel justified in bringing before us ?

উত্তর : Yes.

এই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন লণ্ডনের তৎকালীন প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি স্যর জন মুয়র। রমেশচন্দ্রের সুযুক্তিপূর্ণ উত্তর তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। এমন একটি জটিল বিষয় সম্পর্কে একজন ভারতীয় সিবিলিয়ান যে এমন সুন্দর-ভাবে আলোচনা করতে পারেন, এ ধারণা তাঁর ছিল না। রমেশচন্দ্র একমাত্র ভারতীয় যাঁকে এই কমিটিতে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। তাই স্যর জনের মনে হোল হয়ত রমেশচন্দ্রের অনুরূপ যোগ্য ভারতীয় আরো দুই-একজন থাকতে পারেন যাঁদের এই কমিটিতে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আহ্বান করা যেতে পারে। তাই প্রশ্নোত্তরের শেষে তিনি রমেশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন : "আপনি এইমাত্র কমিটির সামনে যেসব সাক্ষ্য দিলেন আমার বিবেচনায় সেগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপর কোনো ভারতীয়ের কাছ থেকে আমরা কী অনুরূপ সাক্ষ্য আশা করতে পারি ? ভারতীয়দের নিকট থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি, কিন্তু এখন দেখছি যে, এই ধরণের আরো সাক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তা আছে।" এর উত্তরে রমেশচন্দ্র কমিটির কাছে যাঁদের নাম প্রস্তাব করেছিলেন, তাঁরা হোলেন রজনীনাথ রায়, সিরাজুল ইসলাম, বিহারীলাল গুপ্ত, সীতানাথ রায়, আনন্দমোহন বসু, আর ডি মেটা এবং ফিরোজ শা মেটা। কিন্তু এঁদের ডাকা হয়নি বা এঁদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ডের আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত সম্পর্ক (Financial relations) নির্ধারণ করবার জন্য এবং ভারত সরকারের ব্যয় (Expenditure) সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্য ১৮৯৭ সালের মে মাসে বিলাতে একটি কমিশন বসেছিল। এর নাম ওয়েলবি কমিশন। লর্ড ওয়েলবি ছিলেন এই কমিশনের সভাপতি আর সদস্যদের মধ্যে ছিলেন তিনজন, যথা, স্যর উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ, ডাব্লিউ. এস কেইন আর দাদাভাই

নৌরজি। বাংলাদেশ থেকে সুরেন্দ্রনাথকে উক্ত কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য দেবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল; বোম্বাই থেকে গোখলে ও স্যর দীন শ ওয়াচা আর মাদ্রাজ থেকে সুব্রমণিয়া আয়ার নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। আয়-ব্যয় বা ফিনান্সের মত জটিল বিষয়টি সুরেন্দ্রনাথ অল্প সময়ের মধ্যে এমন সুন্দর ভাবে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন যে, ওয়েলবি কমিশনের সামনে প্রায় বার ঘণ্টা দাঁড়িয়ে তিনি অতি দক্ষতার সঙ্গে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। গোখলের মতো বিচক্ষণ ব্যক্তিকে পর্যন্ত বলতে হয়েছিল, "It was brilliant." রমেশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন বসুর প্রতিভার উত্তরাধিকারী বাঙালিকে অতীতের এই গৌরবময় ইতিহাস আজ একবার স্মরণ করতে বলি।

ভারতের শাসনব্যবস্থার তিনি যেমন একজন সমালোচক ছিলেন, তেমনি ভারতীয় স্বার্থের অনুকূলে যখনি কোন হিতকর নীতি বা ব্যবস্থা অনুসৃত হয়েছে, রমেশচন্দ্র তার সমর্থন করতে কুণ্ঠিত হন নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৮৯৯ সালে ভারতসরকার যখন চিনি সম্পর্কে একটি আইন পাশ করেন, তখন এই ব্যবস্থার প্রবল সমর্থন জানিয়ে তিনি লণ্ডনের 'টাইমস্' ও 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় দুইটি পত্র প্রকাশ করেছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন: "In passing this Sugar Bill Lord Curzon has protected an extensive and important industry from ruin by unfair competition, and has acted with strict consonance with educated Indian opinion...The area of sugar cultivation in India was becoming contracted by unfair and bounty-fed imports, and the growers of Indian sugar were losing a legitimate means of subsistence. Lord Curzon has saved them and their industry."—ইহা রাজভক্ত রমেশচন্দ্রের কথা নয়, দেশভক্ত রমেশচন্দ্রের কথা। ভারতীয়দের আর্থনীতিক জীবনের সকল দিক সম্পর্কে এই মনীষি যে কতদূর সচেতন এবং ওয়াকেবহাল ছিলেন, এ তারই একটা দৃষ্টান্ত মাত্র।

এই বছরের (১৮৯৯) গোড়াতে রমেশচন্দ্র সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ভারতবর্ষের দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ এবং আনুষঙ্গিক আর্থনীতিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর স্মরণীয়

অভিযান আরম্ভ করেন। এইসময় 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় রমেশচন্দ্রের দুইটি বিখ্যাত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যথা: 'Land Legislation in India' এবং 'Land Settlements and Famines in India' এবং এই দুইটি প্রবন্ধই লণ্ডনের রাজপুরুষ মহলে সেদিন বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয় নিয়েই লণ্ডনে রমেশচন্দ্রের দিনগুলি অতিবাহিত হয় নি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও তিনি একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এলিজাবেথান স্টেজ সোসাইটি নামে তখনকার দিনে লণ্ডনে একটি প্রসিদ্ধ নাট্যসমিতি ছিল। এই সোসাইটি ৩রা জুলাই, ১৮৯৯, রয়্যাল বোটানিক সোসাইটির কনজারভেটরিতে মহাকবি কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকখানি অভিনয় করার একটি আয়োজন করলেন। ইংরেজিতে কালিদাসের নাটকের সেই প্রথম অভিনয়। এই অভিনয় উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠান-সূচী রচিত হয় এবং তাতে নাটক সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ লিখে দেবার জন্য রমেশচন্দ্র অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন। সেই নিবন্ধটি অতি মনোজ্ঞ হয়েছিল। নাটকের আখ্যানভাগ এবং জার্মানীর মহাকবি গ্যেটে ও অন্যান্য জার্মান পণ্ডিত ও কবিদের উপর কালিদাসের এই অবিস্মরণীয় নাটকখানির কী গভীর প্রভাব, এই সবই তিনি সুনিপুণভাবে ঐ নিবন্ধটিতে আলোচনা করেছিলেন।

এইসময়ে বিলেতে থাকতে রমেশচন্দ্র কিছুদিনের জন্য সাংবাদিকতার কার্যেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন, দেখা যায়। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' তখন বাংলা তথা ভারতবর্ষের একখানি প্রসিদ্ধ দৈনিকপত্রিকা; নরেন্দ্রনাথ সেন তখন এর সম্পাদক। আদিতে এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন এবং তিনি দীর্ঘকাল এর সম্পাদনাও করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ সেন তখন তাঁর 'মিরর'-এর জন্য লণ্ডনে একজন উপযুক্ত সংবাদদাতার অভাব বোধ করছিলেন। রমেশচন্দ্রের অগ্রজ যোগেশচন্দ্রকে তিনি এই বিষয়ে বলেন এবং প্রধানত অগ্রজের অনুরোধেই নামমাত্র পারিশ্রমিকে রমেশচন্দ্র ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা হোতে সম্মত হয়েছিলেন। প্রতি প্রবন্ধের জন্য তিনি দুই গিনি করে পারিশ্রমিক নিতেন। ১৮৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে

'মিরর'-এর স্তম্ভে তাঁর প্রেরিত সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশিত হোতে আরম্ভ হয় এবং তাঁর স্বদেশবাসী খুব আগ্রহসহকারেই তখন ঐগুলি পাঠ করতেন। ১৮৯৯-এর মে মাস পর্যন্ত তিনি এই কার্যে ব্রতী ছিলেন এবং পরে ১৯০০ সালের এপ্রিল থেকে ১৯০১-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঐ কাজ করেছিলেন। সাময়িকপত্রের জন্য সাময়িক বিষয় নিয়ে লেখা হোলেও, 'মিররে'-এ প্রকাশিত রমেশচন্দ্রের মন্তব্যগুলির একটি স্থায়ী মূল্য আছে। একদিকে ইংলণ্ডের সমকালীন রাজনীতির ধারা, অন্যদিকে ভারতীয় সমস্যা, এই উভয়বিধ বিষয়ই তাঁর আলোচনায় স্থান পেতো। তিনি বিলাতে থাকতেই লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হন। ভারতে ইংরেজশাসনের ইতিহাসে লর্ড কার্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। হাউস অব কমন্স-এ রমেশচন্দ্র বহুবার কার্জনের বক্তৃতা শুনেছিলেন, বিশেষ করে সীমান্ত নীতির (Frontier policy) সমর্থনে তিনি যে স্মরণীয় বক্তৃতাটি করেছিলেন, রমেশচন্দ্র তাও শুনেছিলেন এবং সেইসময়ে কার্জনের এই বক্তৃতাসম্পর্কে তিনি এই মন্তব্যটি করেছিলেন : "I do not think Mr. Curzon's (কার্জন তখনো পর্যন্ত 'লর্ড' উপাধিতে ভূষিত হন নি) ideas on the Indian Frontier question are sound." তথাপি তিনি কার্জনের নিয়োগ সমর্থন করেছিলেন এবং মিররে লিখেছিলেন: "That he has ability and talent, and great confidence in himself, his bitterest enemies will not deny, and I think it is far better for India to have as her Viceroy one who has conviction, and the courage of his conviction than to have one who has none.... I believe his administration will be a pleasant change after that of Lord Elgin. কার্জনের শাশনকালের ইতিহাস প্রমাণ করেছিল যে, তাঁর এই ধারণা ভ্রান্ত ছিল না।

সেই সময়ে লণ্ডনে একটী রাজনৈতিক সংস্থা ছিল—ন্যাশনাল রিফর্ম য়ুনিয়ন। ১৮৯৮ সালের মে মাসে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্লাডস্টোনের মৃত্যু হোল। উক্ত য়ুনিয়নের উদ্যোগে ২০শে মে তারিখে টেমপারেন্স হলে এই উপলক্ষ্যে একটী সভার আয়োজন হয়। ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে ঐ সভায়

কিছু বলবার জন্য রমেশচন্দ্রের কাছে অনুরোধ এলো। ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের দুইজন সদস্যের বক্তৃতার পর রমেশচন্দ্র ঐ সভায় একটি চমৎকার বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি গ্লাডস্টোনকে "the greatest statesman of this century" বলে অভিহিত করেছিলেন। তিনি আরো বলেছিলেন: "For the last fifty years Mr. Gladstone's name had been identified not only in this country and in Europe but all over the world, with all that was free, noble and generous; and wherever there was a battle to be fought for the cause of liberty and humanity, or the amelioration of the condition of the people, Mr. Gladstone's voice was heard." তাঁর এই বক্তৃতাটির খুব সমাদর হয়েছিল এবং বক্তৃতা প্রদানকালে তিনি শ্রোতাদের উচ্ছ্বসিত করতালি দ্বারা সম্বর্ধিত হয়েছিলেন। ইণ্ডিয়ান মিররে তাঁর আর একটি স্মরণীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল 'বিসমার্ক' সম্বন্ধে। বিসমার্কের মৃত্যুর পর তিনি এটি লিখেছিলেন। বাংলার তৎকালীন ছোটলাট স্যর আলেকজান্দারের অবসর গ্রহণকালে তাঁর শাসনকার্যের তীব্র সমালোচনা করে রমেশচন্দ্র ইণ্ডিয়ান মিররে লিখেছিলেন: "Sir A. Mackenzie spoilt his chances by his want of sympathy with the people...by his unworthy endeavour to rob the people of Calcutta of their valued rights. He retires amidst the deep groans of the entire Indian nation." স্পষ্টতই এ রাজভক্ত রমেশচন্দ্রের কথা নয়, একজন যথার্থ ভারত-প্রেমিকের উক্তি। দাদাভাই নৌরজি এবং সুরেন্দ্রনাথের পর ভারতে ইংরেজ-শাসনের এমন নির্ভীক সমালোচক তখন আর কেউ ছিলেন না।

বহু ঘটনাপূর্ণ ঊনবিংশ শতাব্দীর অবসানে আরম্ভ হোল বিংশ শতাব্দী।

এই বছরের (১৯০০) জুলাই মাসে প্রকাশিত হোল রমেশচন্দ্রের বিখ্যাত গ্রন্থ *Famines in India* এবং ইংলণ্ডের জনসমাজের পুরোভাগে তখন যাঁরা ছিলেন, তাঁদের রাজনৈতিক মতনির্বিচারে তাঁদের সকলকেই তিনি একখানি

করে এই গ্রন্থ পাঠিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে একখানি ছোট্ট চিঠিও ছিল। সেই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "It is in the hope of indicating the real causes of poverty and wretchedness of the Indian cultivator and labour, and of suggesting means to improve their condition and making them more resourceful and self-relying that I have published this work in the present year. And I trust that the present century will not expire without some steps being taken, as was done in the last century, to improve the condition of the people of India." এই বইখানির প্রকাশ সেদিন খুব সময়োপযোগী হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে তিনি লর্ড কার্জনকে কয়েকখানি চিঠি লিখেছিলেন; সেইগুলি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। ডেইলি ক্রনিকল, টাইমস্, ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান ডেইলি নিউজ প্রভৃতি বিলেতের সকল শ্রেণীর সংবাদপত্রে এবং পাইওনিয়ার, সিবিল য়্যাণ্ড মিলিটারি গেজেট প্রভৃতি ভারতীয় সংবাদপত্রে রমেশচন্দ্রের এই মূল্যবান বইখানি সম্পর্কে সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতের দুর্ভিক্ষ ইংরেজ আমলের একটি কলঙ্কপূর্ণ বিষয় এবং এই বিষয়টি আয়ত্ত করবার জন্য সেদিন রমেশচন্দ্র তাঁর প্রতিভা ও পরিশ্রম যে পরিমাণে নিয়োগ করেছিলেন তা ভাবলে পরে বিস্মিত হতে হয়। একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আমরা বিষয়টি আলোচনা করব।

য়ুরোপে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমুলারের মৃত্যু। ২৯ অক্টোবর, ১৯০০, তারিখে ম্যাক্সমুলারের মৃত্যু হয়। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ২৩শে নভেম্বর ইংলিশ গ্যেটে সোসাইটির উদ্যোগে একটি শোকসভার আয়োজন হয়। রমেশচন্দ্র সেই সভায় বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন: "I do not exaggerate facts when I state that, for a period of half a century, my countrymen have looked upon Professor Max Muller not only as the best interpreter of ancient Indian literature and philosophy and religious thought in Europe.

but also the truest friend of the people of modern India. And the few of my countrymen who had the privilege of approaching and knowing him personally, have found in him a true and devoted friend."

ইংরেজি নববর্ষ ১৯০১ সালের প্রথমভাগে ডেভনসায়ার ও এক্সমাউথ, এই দুইটি স্থানে রমেশচন্দ্র 'ভারতে দুর্ভিক্ষ, ইহার কারণ ও প্রতিকার' সম্পর্কে দুইটি বক্তৃতা করেন। সভা দুইটি উদারনৈতিক দলের নেতা স্যর জন ফিয়ারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এবং একটি সভায় তিনি স্বয়ং সভাপতিত্ব করেন। রমেশ-চন্দ্র তখন স্যর জনের আতিথ্য গ্রহণ করে কিছুদিনের জন্য ডেভনসায়ারে অবস্থান করছিলেন। ন্যাশনাল লিবারেল ফেডারেশনের সাধারণ সভায় র‍্যাডিক্যাল ক্লাবের পক্ষ থেকে রমেশচন্দ্র প্রতিনিধি নির্বাচিত হন এবং ফেডা-রেশনের এক অধিবেশনে ভারতের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে তিনি একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং সেটি সর্ববাদীসম্মতিক্রমে সমর্থিত হয়। অতঃপর রমেশ-চন্দ্র ইংলণ্ডে থেকে কি কি কাজ করেছিলেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা এখানে দিলাম। ১৯০১, ২৪শে মে, ওয়েস্টমিনিস্টার প্যালেস হোটেলে ইংলণ্ডস্থ ভারতীয় অধিবাসীগণের এক সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন এবং বক্তৃতা করেন; দাদাভাই নৌরজি এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। বক্তৃতার বিষয়: The Financial and Agrarian poverty in India." ২৪শে জুন পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব অর্থসচিব পাঞ্জাবের ভূমি হস্তান্তর আইন সম্পর্কে (Punjab Land Alienation Act) যে আলোচনা করেন, রমেশচন্দ্র তাতে যোগদান করেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই আলোচনাসভায় যোগদান করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতায় রমেশচন্দ্র বলেছিলেন, "The extension of this Act to the rest of India will be a calamity." ২৯শে জুন ক্লিফোর্ড ইনে (Clifford's Inn) ফেবিয়ান সোসাইটিতে ভারতের চাষী-সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র একটি বক্তৃতা করেন। এই সময়ে তিনি শ্রমসাধ্য আর একটি কাজে হাত দিয়েছিলেন;—তখন থেকেই তিনি *The*

Economic History of India' রচনা করবার জন্য উপকরণ সংগ্রহে নিযু
ছিলেন, দেখা যায়। এই সম্পর্কে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব
১৬ই আগস্ট পার্লিয়ামেণ্টে ইণ্ডিয়া বাজেট নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হোল, রমেশ
চন্দ্র উপস্থিত থেকে সেই আলোচনার ধারা পর্যবেক্ষণ করেন। সেপ্টেম্ব
তিনি গ্লাসগো এলেন। এখানে তখন একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হচ্ছিল
গ্লাসগোর ইণ্টারন্যাশনাল এসেমব্লি এই উপলক্ষ্যে কয়েকটি বক্তৃতার আয়োজ
করেন। দ্বিতীয় বক্তৃতা ছিল রমেশচন্দ্রের; তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিলঃ "India
Industries, Trade and Agriculture, Railways and Irrigatio
Land Revenue Administration and Finance"—সেদিন এই একটি
মাত্র বক্তৃতার মাধ্যমে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ রমেশচন্দ্রের প্রতিভার বহুমুখী নিদর্শ
পেয়ে চমৎকৃত হয়েছিলেন। ইংলণ্ডে থাকাকালীন তাঁর বহু বক্তৃতার মধ্
এইটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১২ই অক্টোবর লিভারপুলের টাউন হ
রমেশচন্দ্র বিদগ্ধমণ্ডলীর সামনে আর একটি বক্তৃতা করেন; উপস্থিত ব্যক্তিদে
মধ্যে ছিলেন ডাব্লিউ সি ব্যানার্জি ও তাঁর স্ত্রী। সেখানেও দাঁড়িয়ে রমেশচ
বললেন, "Indian affairs do not receive the attention to whic
their magnitude entitle them." বস্তুতঃ গ্লাসগো ও লিভারপুলে
বক্তৃতা দুইটিই ইংলণ্ডে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাবলীর মধ্যে প্রধান; ভারতে
অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁর যা কিছু ধ্যান-ধারণা তার সবই প্রতিফলিত হয়েছে এ
দুইটি বক্তৃতায়। ডাবলিনের কৃষি ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগের স্যর হোরে
প্লাঙ্কেট রমেশচন্দ্রের গ্লাসগো বক্তৃতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেনঃ "I learne
more about Indian economics from your interesting Glasgo
lecture than I ever knew before." তাঁর লিভারপুলের বক্তৃতাটি পা
করে ইংলণ্ডের উদারনৈতিক দল এবং ভারতের উচ্চপদস্থ রাজপুরুষরা পর্য
বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিলেন। তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হলে
যে, "The land tax in India is oppressively severe, and caus
poverty and famines." সেদিন তাঁদের এই স্বীকৃতিটুকুর প্রয়োজ
ছিল। তাইতো দেখতে পাই রমেশচন্দ্র এইসময়ে তাঁর অগ্রজকে এক প
লিখে জানালেনঃ "I have succeeded in doing one thing."

২৪শে নভেম্বর, ওয়েস্টমিনিস্টারে প্যালেস চেম্বারে অনুষ্ঠিত সভার উদ্দেশ্য ছিল বোম্বাইয়ের ভূমি-রাজস্ব আইনের সংশোধন সম্পর্কে ভারতসচিবের নিকট একটি আবেদন উপস্থাপিত করা। এই সভায় প্রথম প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন রমেশচন্দ্র। ১৯০২, জানুয়ারি, লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান ফেমিন য়ুনিয়ন সংগঠিত হোল। ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে তদন্ত করা আর দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য উপায় নির্ধারণ করা, এই ছিল য়ুনিয়নের লক্ষ্য। তারপর এই য়ুনিয়নের পক্ষ থেকে ভারতসচিবের নিকট যে মেমোরিয়াল দাখিল করা হয় তার মুসাবিদা করলেন রমেশচন্দ্র। এই মেমোরিয়ালে ক্যাণ্টারবারির আর্চবিশপ, লিভারপুলের বিশপ আর ম্যাঞ্চেস্টারের ডীনের স্বাক্ষর ছিল। লর্ড জর্জ হ্যামিলটন তখন ভারতসচিব; তাঁর সঙ্গে বোম্বাইয়ের ভূমি-রাজস্ব বিল নিয়ে রমেশচন্দ্রের প্রবল বিতর্ক এই বছরের ঘটনা। আবার এই বছরের গোড়ার দিকেই তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ—*Economic History of India* প্রকাশিত হোল। এ-বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

এইভাবে একাদিক্রমে ভারতের স্বার্থে ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় এইসব অশেষ পরিশ্রমসাধ্য বিবিধ কর্মপ্রয়াসের পর, ৯ই জানুয়ারি 'মোম্বাসা' জাহাজযোগে রমেশচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন।

॥ দশ ॥

রাজনীতিবিদ্ রমেশচন্দ্রের কথা এইবার বলব।

যে সময়ে তিনি সুদীর্ঘকালের জন্য ইংলণ্ডে অবস্থান করে ভারতবর্ষের আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থের অনুকূলে বিবিধ কর্মপ্রয়াসে নিযুক্ত ছিলেন, তখনই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চদশ অধিবেশনের তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। এই ঘটনা ১৮৯৯ সালের শেষ-ভাগের কথা। কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধায়ের (W. C. Bonnerjee) মারফৎ রমেশচন্দ্রের নিকট এই প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। এটা তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। তবে এ গৌরবের আসন তাঁর প্রাপ্য ছিল। প্রস্তাবটি তিনি গ্রহণ করেন। সেই সময়ে দেখা যায় যে, এই উপলক্ষে রমেশচন্দ্র ডিসেম্বরের প্রথমভাগে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মার্চ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত এদেশে অবস্থান করে পুনরায় তাঁর আরব্ধ কার্য সম্পন্ন করবার উদ্দেশ্যে বিলাত যাত্রা করেন। কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে রমেশচন্দ্রের ভাষণটি সমসাময়িক পত্রিকার মন্তব্য অনুসারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়েছিল। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা তাই এ বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করব। ভারতে ইংরেজশাসনের তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ অধিবেশন দুইটি-ই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই দুইটি অধিবেশনে আনন্দমোহন বসু ও রমেশচন্দ্রের ন্যায় দূরদর্শিতাসম্পন্ন রাজনীতিবিদের সভাপতির পদে নির্বাচন বিশেষ সমীচিন হয়েছিল। এর চার বছর আগে (১৮৯৫) কংগ্রেসের পুণা অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন রমেশচন্দ্রের সুহৃদ ও সতীর্থ সুরেন্দ্রনাথ। বিলাতে রমেশচন্দ্রের কার্যাবলী সম্পর্কে মাদ্রাজের তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকা 'মাদ্রাজ স্ট্যাণ্ডার্ড'-এ একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই মন্তব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল : "Mr. Romesh Ch. Dutt has been doing yeoman service to his country in England. He has done much, in concert with Mr. A. M. Bose, to educate the British public on Indian

questions." এবং এরই পুরস্কারস্বরূপ তাঁকে জাতীয় মহাসভার সভাপতি পদে নির্বাচিত করা হোল। এ পুরস্কার সর্বতোভাবেই তাঁর প্রাপ্য ছিল।

কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে রমেশচন্দ্র যে ভাষণটি দিয়েছিলেন সে বিষয়ে আলোচনা করবার আগে এখানে পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত সিডিশন বিল সম্পর্কে আরো কিছু বলা দরকার। ১৮৯৬ ও ১৮৯৭, এই দুই বছরেই বোম্বাই ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্লেগ ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। ভারতের জাতীয় জীবনে তখন নতুন তরঙ্গ তুলেছেন বালগঙ্গাধর টিলক। দেশের এই দুর্দিনে দুর্ভিক্ষের জন্য প্রথমে সরকারের দ্বারস্থ হয়ে ব্যর্থ হবার পর টিলক নিজেই রিলিফ সংগঠন করেন। পুণা শহরে যখন প্লেগ দেখা দিল, তখন টিলক তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে সেই প্লেগ নিবারণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তারপর সরকার স্বয়ং প্লেগ দমনে অগ্রসর হলেন এবং এইজন্য গোরা সৈন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। প্লেগের চেয়ে ভয়াবহ ছিল প্লেগ দমনের জন্য অত্যাচার। পরবর্তি ইতিহাস সুপরিচিত। ভ্রাতা নাটুসর্দারের নির্বাসন এবং ১৮৯৭ সালের জুন মাসে দামোদর ও চাপেকার নামক দুইজন মারাঠী যুবকের গুলির আঘাতে পথিমধ্যে র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টের নিহত হওয়া, সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা। মিঃ র‍্যাণ্ড পুণার প্লেগ অফিসার ছিলেন। আর এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে টিলক তাঁর সম্পাদিত 'মারাঠা' ও 'কেশরী' পত্রিকায় যেসব অগ্নিময়ী মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, ভারতবর্ষের সাংবাদিকতার ইতিহাসে তা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। মিঃ র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্টের হত্যার পর শ্বেতাঙ্গ-পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি রাগে যেন ফেটে পড়ল—তাদের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল একজনের উপর। তিনি টিলক। অতঃপর তাঁর গ্রেপ্তার, বিচার ও কারাদণ্ডের ভেতর দিয়ে একটা বিস্ফোরক অবস্থার সৃষ্টি হোল। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিই গুপ্তহত্যার প্ররোচনা দিয়ে থাকে, এই রকম একটা ধারণা সরকারের মনে দেখা দিল এবং পূর্বোল্লিখিত সিডিশন বিলটি ছিল এরই প্রত্যক্ষ পরিণতি। রমেশচন্দ্র তখন বিলাতে থেকে এই সম্পর্কে যথেষ্ট আন্দোলন করেছিলেন। পুণা শহরে পিউনিটিভ পুলিশের যে ব্যবস্থা হয়েছিল এবং দেশীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করবার জন্য যে ব্যবস্থা হয়েছিল, ডেইলি নিউজ পত্রিকায় একখানা চিঠি লিখে রমেশচন্দ্র তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এই পত্র

দুখানিতে তাঁর নাম ছিল না, 'লয়্যাল ইণ্ডিয়ান' এই স্বাক্ষরে চিঠি দু'খানি প্রকাশিত হয়েছিল; দ্বিতীয় পত্রের শেষে তিনি লিখেছিলেন: "সিঁধেল চোরের সুবিধার জন্য রাস্তার বাতিগুলো নিভিয়ে দেওয়া আর সন্দেহবশত সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা একই কথা।" রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড রমেশচন্দ্র সমর্থন করেন নি, আবার তেমনি তিনি সরকারী সিডিশন বিলও সমর্থন করেন নি। কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে তিনি তাঁর ভাষণে এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ভারতে ইংরেজশাসনের একজন প্রবল সমর্থক তিনি ছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি যে কোনোদিনই সরকারের বশম্বদ ছিলেন না, তার প্রমাণ এইখানেই।

রমেশচন্দ্র তাঁর সভাপতির অভিভাষণে পুণার প্লেগের বিষয় উল্লেখ করে নাটু ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তিবার্তা প্রকাশ করলেন। প্রবীণ সিবিলিয়ানের আইনসঙ্গত বা constitutional বক্তৃতা ছিল রমেশচন্দ্রের সত্য; তার মধ্যে 'blood and fire' না থাকবারই কথা। কিন্তু তথাপি অত্যন্ত সারগর্ভ এই বক্তৃতা এবং কংগ্রেসের আদিপর্বের ইতিহাসে অর্থাৎ সেই 'আবেদন-নিবেদন'-এর যুগে অন্যান্য বহু কংগ্রেস সভাপতির বক্তৃতার তুলনায় কি চিন্তার মৌলিকতায় এবং কি সমসাময়িক অবস্থার ব্যাখ্যান ও বিশ্লেষণের দক্ষতায় রমেশচন্দ্রের এই বক্তৃতা সত্যই স্মরণীয়। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যে কয়টি প্রস্তাব উত্থাপিত ও আলোচিত হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল কলিকাতা মিউনিসিপাল বিল সম্পর্কে। এই প্রস্তাবটি কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে উত্থাপন করেছিলেন রমেশচন্দ্রর সুহৃদ ও সতীর্থ সুরেন্দ্রনাথ। এই অধিবেশনেই সুরেন্দ্রনাথ আর একটি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। সেটি হোল: 'The appointment of an agency in England for the purpose of organising in concert with the British Commitee public meetings for the dessemination of information on Indian subjects, and the creation of a fund for the purpose." দেখা যাচ্ছে যে, কংগ্রেসের জন্মের পনর বছর পরে ইংলণ্ডে ভারতীয় সমস্যা-

সম্পর্কে সংঘবদ্ধ প্রচারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব কিন্তু তখনি কার্যকরী হয়নি। ভারতবাসীর সৌভাগ্যক্রমে রমেশচন্দ্র একাই সে কাজ করেছিলেন এবং ভালভাবেই করেছিলেন। এর বহুকাল পরে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সুভাষচন্দ্র অনুরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন এবং তাঁরই সময় থেকে কংগ্রেসের এই বিভাগটি রীতিমত সংঘবদ্ধ।

মনীষা ভিন্ন দূরদর্শিতা সম্ভবপর হয় না। রমেশচন্দ্র যথার্থ মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। আমরা দেখতে পাই যে, ১৮৯৭ থেকে আরম্ভ করে ইংলণ্ডে থেকে স্বদেশসেবায় তিনি একাদিক্রমে পুরো চার বছর নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর এই নিরলস স্বদেশসেবার পুরস্কারস্বরূপ তাঁর গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসী স্বদেশভক্ত রমেশচন্দ্রকে ১৮৯৯ সালে কংগ্রেসের সভাপতির পদে নির্বাচিত করলেন। তাঁর ই নির্বাচনে উল্লসিত হয়ে 'ইণ্ডিয়ান নেশন' পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথ ঘোষ লিখেছিলেন: "A better selection could not be made." কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তিনি তাঁর ভাষণে ভারতের কৃষকদের দুর্গতির কথা বিশেষভাবে আলোচনা করেন। তাঁর বক্তৃতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহাই। সেইসঙ্গে ভারতে দুর্ভিক্ষের কারণ নির্ণয় করে আমাদের বাণিজ্য ও শিল্পের শোচনীয় ধ্বংসের ইতিহাসও বিবৃত করেন। সর্বশেষে তিনি বলেছিলেন দুটি কথা; প্রথম—বৈধ অর্থাৎ আইনসঙ্গত উপায় ভিন্ন কংগ্রেসের অন্য পথ নেই অর্থাৎ কংগ্রেস কখনই আইনভঙ্গকারী উপায় অবলম্বন করতে পারবে না; দ্বিতীয়, তবে জরুরী বা সঙ্গীন অবস্থায় কংগ্রেস বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করতে পারবে। পরবর্তিকালে গান্ধী-চিত্তরঞ্জনের যুগে এই বিশেষ অধিবেশনের চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। কতকাল আগে রমেশচন্দ্র এটা অনুমান করতে পেরেছিলেন, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

ডিসেম্বর ২৭, ১৮৯৯। কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে রমেশচন্দ্র তাঁর ভাষণ পাঠ করলেন। ভারতের রাজনীতিতে জাতীয় মহাসভার গুরুত্ব নির্ণয় করে তিনি যখন বললেন: "This National Congress is the only

body in India which seeks to represent the views an aspirations of the people of India as a whole in all larg and important questions," তখন সভায় তুমুল হর্ষধ্বনি উঠল। তাঁর এ ভাষণ মামুলি ধরণের ছিল না; ভারতের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সুদীর্ঘকাল সংযুক্ত থেকে তিনি অতি মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। তাঁ সেই অভিজ্ঞতার জারকরসে সিঞ্চিত এই ভাষণের মধ্যে যা ছিল তাকে সর্বাংশে আমরা 'practical wisdom' বলে অভিহিত করতে পারি রমেশচন্দ্র তাঁর বক্তৃতায় প্রধানত এই কয়টি বিষয় আলোচনা করলে যথা: (১) ১৮৯৭ ও ১৮৯৯ সালের দুর্ভিক্ষ; (২) ১৮৯৮ সালের সিভিল আইন; (৩) কলিকাতা মিউনিসিপাল বিল, (৪) সামরিক ব্যয়, জাতী ঋণ, শিল্প এবং প্রচলিত মুদ্রামান; (৫) স্বায়ত্ত শাসন; এবং (৬) প্রাদেশি ব্যবস্থা ও শাসন পরিষদ এবং বড়লাটের শাসন পরিষদ। তা ভারতের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কেই তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করেছিলেন লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেসের এই পঞ্চদশ অধিবেশন যখন হয় ভারতে ইংরেজশাসনে ইতিহাসে তখন কার্জনি যুগ চলেছে আর সেই বছরই ভারতে এ ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। রমেশচন্দ্র তাই তাঁর বক্তৃতায় বললেন: " suggest that the time has come when it is desirable t make some effective measures to improve the conditio of the agricultural population of India. Their povert their distress, their indebtedness, all this is not the fault."—সেদিন তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, ভারতীয় কৃষকের দুঃখ-দুর্দশা দারিদ্র্য শাসনব্যবস্থারই কুফল। "The real cause of the povert of our agricultural population is the land assessment whic is heavy,"—এ রমেশচন্দ্রের অভিজ্ঞতালব্ধ সিদ্ধান্ত, অনুমান মাত্র নয়। গ্রামী শিল্পগুলি ধ্বংস হতে চলেছে, গ্রামের চরকা ও তাঁত বন্ধ হতে চলেছে, কেন রমেশচন্দ্র বললেন, এর কারণ আর কিছুই নয়—"Free competitio with the steam and machinery of England"—এই বিষয়টি তিনি তাঁর 'ইকনমিক হিস্ট্রি' বইতে আরো বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

রাজনীতিতে রমেশচন্দ্র একজন মডারেটপন্থী ছিলেন ; তাই তাঁর বক্তৃতার শেষে তিনি নিজেকে ভারত গভর্ণমেণ্টের একজন পুরাতন ও বিশ্বস্ত সেবক বলে বর্ণনা করেছেন এবং "consolidation of the British rule in India"-র স্বপক্ষে অনেক কথা বলেছেন। শাসক সম্প্রদায়ের নিকট তাই তাঁর বক্তৃতা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল। তাঁর পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক ছিল। তথাপি একথা সত্য যে, ভারতে ইংরেজশাসন শোষণের নামান্তর মাত্র—এই কথা বলবার সাহস সেদিন এই মডারেট রমেশচন্দ্রেরই ছিল, আর কারো নয়। সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র, রাজভক্ত রমেশচন্দ্রের চরিত্রের একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তাঁর স্বজাতির থেকে তিনি কোনোদিনই দূরে ছিলেন না।

রমেশচন্দ্র চিরদিন আশাবাদী মানুষ ছিলেন। ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি সর্বদা একটা প্রকাণ্ড আশা তাঁর মনের মধ্যে পোষণ করতেন। ভাষণের উপসংহারে তিনি তাই বললেন : 'I have been somewhat of an optimist all my life, I have lived in that faith and I should like to die in that faith. The experiment of administration *for the people*, not *by the people* was tried in every country in Europe in the last century. The experiment failed because it is an immutable law of nature that you cannot permanently secure the welfare of a people if you tie up the hands of the people themselves." স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে এমন সুস্পষ্ট কথা কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে এর আগে আর কখনো বলা হয়নি। রমেশচন্দ্র ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন ; ইতিহাসের আলোকেই তিনি সমগ্র বিষয়টি আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, "To associate the people of India more largely in shaping the administration of the country is not only the wisest but the only possible path before us." ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্তব্য সম্পর্কে শাসকজাতিকে রমেশচন্দ্র সেদিন যেভাবে সচেতন করতে চেয়েছিলেন, তা ব্যর্থ হয়নি। ভারতবর্ষের

পরবর্তি রাজনৈতিক ইতিহাস এই সাক্ষ্যই বহন করে যে, যে স্বায়ত্তশাসনের দাবী সেদিন কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে রমেশচন্দ্র তুলেছিলেন, তার দ্বারা কংগ্রেসের নীতি ও শাসকজাতির নীতি, দুই-ই অনেক পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল।

এই সুচিন্তিত ভাষণের প্রশংসা সকল দলের নেতারাই সেদিন করেছিলেন। এর বিষয়বস্তুর আলোচনা এবং আবেগবর্জিত প্রকাশভঙ্গির গুণেই সকল সমালোচকরাই একবাক্যে তাঁর লক্ষ্ণৌ বক্তৃতার গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন। ইংলিশম্যান, স্টেটসম্যান, পাইওনিয়ার, টাইমস অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি প্রত্যেক সংবাদপত্রই তাঁর এই বক্তৃতার সারমর্ম উপলব্ধি করে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। 'টাইমস অন ইণ্ডিয়া'-র সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়েছিল : "We have nothing but praise for the general tone of Mr. Romesh Chunder Dutt's admirable presidential address at the Lucknow session of the Indian National Congress." অত্যন্ত ধীর ও স্থির মস্তিষ্কের মানুষ ছিলেন রমেশচন্দ্র। তাঁর বাস্তবদৃষ্টি ছিল প্রখর আর ছিল দূরদৃষ্টি। শাসনকার্যে অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশেছিল ভারতের জনসাধারণের দুঃখদুর্দশার বাস্তব পরিচয়। দেশের এবং জাতির প্রকৃত অবস্থার তিনি ছিলেন একজন মরমী পর্যবেক্ষক। তাই তাঁর সমগ্র বক্তৃতাটির মধ্যে ঝাঁঝ বা উগ্রতার চেয়ে যে জিনিসটা সবাইকে মুগ্ধ করেছিল সেটা হোল তাঁর temperate spirit বা পরিমিত মনোভাব। রমেশচন্দ্রের পক্ষে তাই চিরাচরিত 'গরম' বক্তৃতা প্রদান করা অসম্ভব ছিল। শিক্ষিত ভারতবাসীর সমস্যা তাঁর বক্তৃতায় স্থান পায়নি—তাঁর কাছে কৃষকদের দুঃখদুর্দশার কথাটাই প্রধান বক্তব্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। এই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করবার যোগ্যতা সেদিন রমেশচন্দ্র দত্ত ভিন্ন আর কারো ছিল না। সেইজন্যই কি তাঁর এই বক্তৃতার প্রসঙ্গে বিলাতের একটি পত্রিকা মন্তব্য করেছিল : "ভারতবর্ষে যতদিন এই শ্রেণীর নেতা আছেন, ততদিন তার পক্ষে নৈরাশ্যের কিছু নেই।" কংগ্রেস সভাপতির ভাষণে সেদিন তিনি যে সংযম ও শান্তভাব এনে দিয়েছিলেন, কংগ্রেসের পরবর্তি সভাপতিদের উপর তার যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল।

মোটকথা, তাঁর এই বক্তৃতা উত্তরকালে কংগ্রেসের রাজনীতিতে একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছিল।

কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হয়ে যাবার পর স্থানীয় প্রিন্স অব ওয়েলস হোটেলে রমেশচন্দ্রকে এবং কংগ্রেসের অন্যান্য প্রতিনিধিদের এক ভোজসভায় সম্বর্ধিত করলেন নবাব মেহদী হাসান ফতে নওয়াজ জং। যে সময়ে লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, সেই সময়ে কংগ্রেস-বিরোধীদলের একটি সভাব আয়োজনও হয়েছিল। নবাব সাহেব উক্ত সভার একজন বক্তা ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, লক্ষ্ণৌ মুসলমানপ্রধান শহর; সেখানে কংগ্রেসেব অধিবেশনে আপত্তি জানিয়ে এই সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে লেফটেনেণ্ট গভর্ণরের কাছে আবেদন পর্যন্ত করা হয়েছিল; নবাব সাহেব অবশ্য এই আবেদনে স্বাক্ষর দেন নি। কংগ্রেসের এই পঞ্চদশ অধিবেশনেই সর্বপ্রথম জাতীয় মহাসভার জন্য একটি গঠনতন্ত্র বা constitution গৃহীত হয়। অনেকেরই হয়ত জানা নেই যে, এই গঠনতন্ত্র রচনায় রমেশচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথের অনেকখানি হাত ছিল। কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাসে এই তথ্যটি উল্লিখিত হয়নি।

কংগ্রেসের অধিবেশন-শেষে রমেশচন্দ্র কলকাতায় ফিরলেন। পৌরসভার অধিকার রক্ষা করবার জন্য সেদিন বিলাতে থেকে তিনি একাকী যে আন্দোলন চালিয়েছিলেন তার জন্য কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁকে সম্বর্ধিত করতে চাইলেন। জানুয়ারি ৬, ১৯০০, তারিখে শোভাবাজারের রাজবাটির সুসজ্জিত প্রাঙ্গণে এই সম্বর্ধনা-সভার আয়োজন হয়েছিল; এর উদ্যোক্তা ছিলেন রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর। সংবাদপত্রের বিবরণে প্রকাশ যে, 'leading citizens of Calcutta' বলতে যাঁদের বুঝায় তাঁদের সকলেই এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেই গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় আর বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস রমেশচন্দ্রের শিক্ষক ছিলেন। সেদিন ছাত্রের গৌরবে তাঁর শিক্ষক যে মনে মনে গৌরব বোধ করেছিলেন, এ অনুমান অসঙ্গত নয়।

কলকাতায় ফিরে রমেশচন্দ্র আরো একটি কাজ করেছিলেন। সেটি হোল লর্ড কার্জনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার। কার্জনের সঙ্গে এইসময় তাঁর যে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল তার মধ্যে প্রধান বিষয় ছিল দুটি, যথা—প্রথম, রাজস্ব আর দ্বিতীয়, শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের অংশগ্রহণ; বড়লাটের শাসন পরিষদে এবং প্রাদেশিক শাসন পরিষদে আরো অধিকসংখ্যক ভারতীয়ের নিয়োগ সম্পর্কে রমেশচন্দ্র বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেছিলেন। এই আলোচনা বৈঠকেই কার্জন তাঁর সেই সুপরিচিত উক্তিটি সর্বপ্রথম করেছিলেন: "After all, is not the rule of one man the best form of rule for India?" অতঃপর এই মৌখিক আলোচনার জের টেনে রমেশচন্দ্র কার্জনকে পাঁচখানি পত্র লিখেছিলেন। কংগ্রেস সভাপতির ভাষণে যেমন, তেমনি এই পত্রালাপের মূল বক্তব্য ছিল, দুইটি, যথা—Land Settlement আর কৃষকদের দারিদ্র্য। এই দুটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে চিন্তা করবার এবং বলবার মানুষ সেদিন এ দেশে একজনই ছিলেন। তিনি রমেশচন্দ্র দত্ত। বিবেকানন্দের দরিদ্র-নারায়ণ তখনো সন্ন্যাসীর ধ্যান-ধারণায় রূপ পরিগ্রহ করেনি।

২৩শে জানুয়ারি। টাউন হলে কলকাতার পৌরজনের পক্ষ থেকে রমেশচন্দ্রকে ঐদিন সম্বর্ধিত করে তাঁকে একটি মানপত্র উপহারস্বরূপ দেওয়া হোল। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মানপত্রের একস্থানে বলা হয়েছিল:—"We are aware that one of the principal reasons for your early retirement from the Indian Civil Service was a desire to be more useful to your country and an anxiety to direct the attention of our rulers to the aspirations and grievances of the people of India from a position of greater freedom...You have, within a short time done much, through the press and the platform, to inform the enlightened public opinion in England on some of the most momentous questions of Indian administration." এই সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। তিনি একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় রমেশচন্দ্রের দেশহিতকর কার্যাবলীর উল্লেখ করে বলেছিলেন যে,

একজন মানুষের জীবনে তার স্বজাতির কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা লাভ অপেক্ষা আর অধিকতর উচ্চ সম্মানলাভ কি হতে পারে? সেই সম্বর্ধনা সভায় প্রদত্ত মানপত্রের উত্তরে রমেশচন্দ্রের সুদীর্ঘ বক্তৃতাটি নানাদিক দিয়েই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। তাঁর জীবনের বহু বক্তৃতার মধ্যে এইটির গুরুত্ব উল্লেখ্য। এই বক্তৃতায় তিনি সমকালীন বাংলার অর্ধ শতাব্দীকালের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রয়াসের একটি চমৎকার বিশ্লেষণ দিয়েছেন এবং তাঁর স্বীয় সাহিত্যজীবনের কথাও কিছু উল্লেখ করেছেন। তাঁর পূর্বসূরিদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করে রমেশচন্দ্র সেদিন বলেছিলেন: "All the greatest works of the half century, about to close, centre round the cardinal idea of service to our Mother Land...The venerable Vidyasagar led the van of progress, and explained to us what was great and glorious in our ancient religion and literature. The talented Madhusudan Datta turned away from fruitless compositions in English to his native language, constructed that splendid fabric of Epic poetry which is now the pride of his countrymen. And the inimitable Bankimchandra directed a well-spent life in creating a body of literature which strengthens and inspires us, while it charms and fascinates. These were the pinoeers of our contemporaneous literature, and I know of no truer patriot and truer servant of his country than these gifted men."

এই বক্তৃতায় বিগত চল্লিশ বৎসরের শাসন-ব্যবস্থারও একটি সুন্দর চিত্র তিনি তুলে ধরেছিলেন। ভারতের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার কি শোচনীয় পরিণাম হয়েছে সেই বিষয়টি আলোচনা করে রমেশচন্দ্র বলেছিলেন: "The history of the Land Revenue Administration of India during these forty years is the strongest and saddest in the annals of mankind...All blunders in land administration are mainly responsible for the frequency and intensity of recent famines."

ভারতে ইংরেজশাসনের অধীনে ভারতবাসীর অধিকারের দাবীও তিনি ঐ বক্তৃতায় অত্যন্ত বলিষ্ঠ স্বরে জানিয়েছিলেন। উপসংহারে তিনি বলেছিলেন "There are ties which are stronger than the ties of blood and they are the ties of common country, aims and commo endeavours. These are the ties which bind all castes an creeds in India as one united people, and these are the tie which will nerve our hands and strengthen our heart in our future endeavours." দেখা যাচ্ছে যে, রমেশচন্দ্রের কণ্ঠে ভারতীয় ঐক্যের মূল সুরটি স্পষ্টতই এখানে ঝঙ্কৃত হয়েছে।

ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তনের কালে রমেশচন্দ্র বোম্বাইতেও সম্বর্ধিত হলেন। স্য ফিরোজ শা মেটার সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানটি হয়েছিল ১৪ই মার্চ। এখানে প্রত্যুত্তরে তিনি সেই একই কথা বললেন: "এক উদ্দেশ্য এবং এ অভিপ্রায়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশ ও স্বজাতির সুখ ও সমৃদ্ধিবিধানে আমাদে প্রত্যেকেরই কাজ করা উচিত।" বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একটি উন্নত সর্বসংস্কারমুক্ত বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষের কণ্ঠে এই যে আমরা শুনলাম: "W shall work in a common purpose and a common object, f the happiness and prosperity of the common motherland" এই আবেদন আজো তার মূল্য হারায় নি। তাঁর এই কালজয়ী চিন্তা-ভাবন মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত আজো বেঁচে আছেন।

॥ এগারো ॥

অর্থনীতিবিদ্ রমেশচন্দ্রকে না জানতে পারলে রমেশ-প্রতিভার পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে বোধ হয় তাঁর মতোন আর কোনো ভারতীয় মনীষি মস্তিষ্ক পরিচালনা করেন নি। ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যাকে তিনি সমগ্রভাবে দেখেছিলেন ; ভূমিকর, রাজস্ব, দুর্ভিক্ষ এবং ইংলণ্ডের নিদারুণ শোষণ, এইসব প্রত্যেকটি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে এবং সেইসঙ্গে একটা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই সুপণ্ডিত রমেশচন্দ্র শাসকজাতির সামনে এবং তাঁর স্বজাতির সামনে এই বিষয়টি উপস্থাপিত করেছিলেন। এ-ক্ষেত্রে তিনি শুধু পথিকৃৎ ছিলেন না, তার চেয়েও বেশি। তথ্য এবং প্রমাণ সব কিছুই তাঁকে সংগ্রহ করে অগ্রসর হোতে হয়েছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকে আরম্ভ করে ভারতবর্ষে সমগ্র ভিক্টোরীয় যুগের অর্থনৈতিক সমস্যার এমন বিস্তারিত এবং গভীর আলোচনার সেদিন প্রয়োজন ছিল। নিজে একজন রাজকর্মচারী হোয়েও রমেশচন্দ্র ইংরেজ শাসকের শোষণের প্রকৃত রূপটি নানা তথ্যপ্রমাণসহ উদ্ঘাটিত করতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নি। উনিশ শতকের ইতিহাসে তাঁর প্রকৃত মূল্য এইখানেই।

আমরা প্রথমে ভারতের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা অনুসরণ করব। এই শতাব্দীকে রমেশচন্দ্র অভিনন্দিত করলেন তাঁর *Famines of India* বই দিয়ে। ১৯০০ সালের জুলাই মাসে তাঁর এই স্মরণীয় গ্রন্থখানি লণ্ডনে প্রকাশিত হয়, এ-কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। ইতিপূর্বে ভারতের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে লর্ড কার্জনকে তিনি যেসব পত্র লিখেছিলেন, সেগুলি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থের অন্তর্গত অধিকাংশ বিষয় পূর্বেই (১৮৯৭) *Fortnightly Review* পত্রিকায় কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তি-কালে 'ভারতী' পত্রিকায় এই বিষয়টি নিয়ে তিনি একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন। রমেশচন্দ্র বলেছেন যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে বৎসর সিংহাসনে আরোহণ করেন, সেই বছর (১৮৩৭) ভারতবর্ষে একটি দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ভারতে তখন

কোম্পানির আমল। যদিও এই দুর্ভিক্ষ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মধ্যে
সীমাবদ্ধ ছিল, তথাপি প্রত্যক্ষদর্শীর মতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনসাধারণের অবস্থা
সত্যই হৃদয়-বিদারক হয়েছিল। ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্যের জন্য
তখন কোন সংগঠন ছিল না আর লর্ড অকল্যাণ্ড দুর্ভিক্ষ-জনিত মৃত্যু বা দুর্দশা
কিছুই নিবারণ করতে পারেন নি। এরপর রমেশচন্দ্র উপর্যুপরি দশটি দুর্ভিক্ষের
হিসাব দিয়েছেন। "বিগত চল্লিশ বৎসরে দশবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে এবং
দেড়কোটি মানুষ অনাহারে প্রাণত্যাগ করেছে।"—ইহাই রমেশচন্দ্র প্রদত্ত
হিসাব। এই দশটি দুর্ভিক্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরকম:

(১) ১৮৬০ সালের দুর্ভিক্ষ। স্থান: উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ; মৃত্যুসংখ্যা
দুই লক্ষ। তখন লর্ড ক্যানিং-এর আমল। সেই প্রথম দুর্ভিক্ষ তদন্তের জন্য
একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। (২) ১৮৬৬। স্থান: উড়িষ্যা প্রদেশ। মৃত্যুসংখ্যা
দশ লক্ষ অর্থাৎ সমগ্র প্রদেশের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। রমেশচন্দ্র তখন
আঠারো বৎসরের যুবক। তিনি স্বয়ং এই দুর্ভিক্ষের নগ্ন রূপ কলকাতায়
কিছুটা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই তিনি লিখেছেন: "অনাহারক্লিষ্ট নর-নারী
ও শিশুদের আগমনে কলকাতা শহর পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল··· ধনীদের
গৃহগুলি এক-একটি সংকটত্রাণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল; ব্যবসায়ীগণ দরজায়
দরজায় গিয়ে চাঁদা ভিক্ষা করেছেন উড়িষ্যা থেকে আগত দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট হাজার
হাজার নর-নারীকে অন্ন-বস্ত্র দিয়ে বাঁচাবার জন্যে। যাঁরা এই দৃশ্য সেদিন
প্রত্যক্ষ করেছিলেন, জীবনে তাঁরা তার স্মৃতি ভুলতে পারেন নি।" (৩) ১৮৬৯
সালে উত্তর-ভারতের দুর্ভিক্ষ, অনুমিত মৃত্যুসংখ্যা বারো লাখ। (৪) ১৮৭৪
সালে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ। তখন লর্ড নর্থব্রুকের শাসনকাল। ছেষট্টি সালের
দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা এবার কাজে লাগান হয়েছিল, সরকারী সুব্যবস্থার ফলে
দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু নিবারিত হয়েছিল। (৫) ১৮৭৭ সালে মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষ।
এই বছর মহারাণী ভিক্টোরিয়া 'ভারতেশ্বরী' উপাধি ধারণ করেন এবং সেই
উপলক্ষে লর্ড লিটন যখন দিল্লীতে একটি দরবার বসাবার আয়োজন করছিলেন
তখনই মাদ্রাজ প্রদেশের উপর দুর্ভিক্ষের কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল। তাই
ক্ষ নিবারণের জন্য আগে থেকে কোনো আয়োজন বা রিলিফের ব্যবস্থা
কোনোটাই যথোপযুক্ত হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে ইহাই ভয়াবহতম

দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষের করাল নিশ্বাসে পঞ্চাশ লাখের ওপর লোকের মৃত্যু হয়! রমেশচন্দ্র লিখেছেন: "আধুনিক কালের যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে ক্রিমিয়া যুদ্ধের তুলনা নেই। এই যুদ্ধে আড়াই লাখ মানুষের জীবননাশ ঘটেছিল। মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষে তার বিশগুণ মানুষের মৃত্যু হয়।" (৬) ১৮৭৮ সালে উত্তর ভারতের দুর্ভিক্ষ। মৃত্যুসংখ্যা প্রায় তেরো লাখ। (৭) ১৮৮৯ সালে উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষ। মৃত্যুসংখ্যার কোনো সরকারী তালিকা নেই; প্রজাক্ষয় যথেষ্ট হয়েছিল। (৮) ১৮৯২ সালে মাদ্রাজ, রাজপুতানা, বাংলা ও ব্রহ্মদেশের দুর্ভিক্ষ। (৯) ১৮৯৬ সালে দক্ষিণ অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষে অজন্মা হোল; বোম্বাই, বাংলা, উত্তর-পশ্চিম ও পাঞ্জাব প্রদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষ যখন সংঘটিত হয় রমেশচন্দ্র তখন সরকারী কর্মে নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনি স্বয়ং এই অজন্মার কারণ সম্পর্কে তদন্ত করেছিলেন। (১০) ১৯০০ সালে পাঞ্জাব, রাজপুতানা, বোম্বাই এবং মধ্য-প্রদেশের দুর্ভিক্ষ। এমন সুদূরব্যাপী দুর্ভিক্ষ এর আগে এদেশে কখনো হয়নি। দুর্ভিক্ষপীড়িত ষাট লক্ষ নর-নারীকে সাহায্যদান করতে হয়েছিল। সেই বছর যে দুর্ভিক্ষ কমিশন বসান হয়েছিল তার চেয়ারম্যান ছিলেন স্যর ম্যাকডোনেল। এই দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর বিষয়ে সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, "মাছির মতোন ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ মরেছে।"

রমেশচন্দ্র তাঁর 'ভারতে দুর্ভিক্ষ' গ্রন্থে তথ্য সহকারে বলেছেন: "Famines are a recurring event in India" এবং এর ফলে, উপযুক্ত সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ভারতবাসীর যে কী অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশা হয় আর কত লোক যে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তা য়ুরোপের লোকের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব। রমেশচন্দ্রের আন্দোলনের ফলেই ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টে যখন এই বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছিল তখন স্যর উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণের একটি প্রশ্নের উত্তরে তৎকালীন ভারত-সচিব লর্ড জর্জ হ্যামিলটন বলেছিলেন: "ভারতে দুর্ভিক্ষের প্রশ্নটি সম্পর্কে আমাদের আর উপেক্ষা প্রদর্শন করা চলে না; ভারতবর্ষের জন্যেই আমাদের যা কিছু সমৃদ্ধি, অথচ সেই দেশে আমাদের শাসনকালেই যে এতগুলি দুর্ভিক্ষ ঘটে গেল, এ আমাদের পক্ষে খুব গৌরবের কথা নয়। ভারতীয় সিবিল সার্বিসের একজন বিশিষ্ট সভ্য, যিনি কিছুকাল

পূর্বেও শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং যাঁর অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা সম্পর্কে বহু বিশিষ্ট রাজপুরুষ উচ্চ ধারণা পোষণ করে থাকেন, তিনি সম্প্রতি 'ভারতে দুর্ভিক্ষ' নামে যে মূল্যবান গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছেন, আমি সেই গ্রন্থখানি আগাগোড়া পাঠ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে অবিলম্বে এই বিষয়টির আর একটি তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।" *

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রমেশচন্দ্রের সময়ে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্য তিনটি কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল। প্রথম কমিশন ১৮৮০ সালে; তখন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড লিটন আর এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন জেনারেল স্যর রিচার্ড স্ট্রেচি। এই কমিশনের রিপোর্টের ফলেই ভারত গভর্ণমেণ্ট সর্বপ্রথম দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে ১৮৯৩ সালে Faminine Code প্রবর্তন করেন। দ্বিতীয় কমিশন ১৮৯৬ সালে; স্যর জেমস লায়াল ছিলেন এই কমিশনের সভাপতি আর তৃতীয় কমিশন ১৯০০ সালে; স্যর এ্যানটনি ম্যাকডোনেল ছিলেন এই কমিশনের সভাপতি। এই কমিশনের নিকট রমেশচন্দ্র এই মর্মে একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন যে, যে প্রদেশে দুর্ভিক্ষের ফলে ব্যাপক সংকটত্রাণের কাজ করতে হবে সেই প্রদেশে ঐ কাজের যথাযথ তত্ত্বাবধানের জন্য একজন 'ফেমিন কমিশনার' নিযুক্ত করতে হবে। তাঁর এই প্রস্তাব গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেছিলেন।

রমেশচন্দ্রের 'ফেমিনস ইন্ ইণ্ডিয়া' বইখানি যখন প্রকাশিত হয় তখন বিলেতের 'টাইমস' প্রভৃতি পত্রিকায় অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ইহা সমালোচিত হয়েছিল এবং লর্ড কার্জন থেকে শুরু করে প্রিন্স ক্রোপটকিন পর্যন্ত এর প্রশংসা করে তাঁকে ব্যক্তিগত পত্র লিখেছিলেন। এইসব অভিমতের সারমর্ম এই ছিল যে, তিনি এমন একটি বিষয় উপস্থাপিত করেছেন যার কোনো জবাব নেই। লর্ড কার্জনের জীবনচরিতে এই কথা উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি রমেশচন্দ্র দত্তের এই গ্রন্থখানির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং "it is of great value" বলে তাঁর কাছে স্বীকৃত হয়েছিল।

পরবর্তিকালে 'ভারতী' পত্রিকায় (১৩০৮) রমেশচন্দ্র এই বিষয়টি সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হোল:

* *Proceedings of the British Parliament; Questions on India: 1899-1900.*

"পূর্বে কি ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ হয় নাই? পূর্বেও হইয়াছে। তখন কারণ ছিল। যখন মোগল রাজ্য ক্রমশঃ ভাঙিয়া পড়িল,—যুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলায় দেশ লণ্ডভণ্ড, তখন দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। কিন্তু সেসব কারণ এখন ত অজ্ঞাত। এখন কতকাল ধরিয়া শান্তি বিরাজমান, তথাপি দুর্ভিক্ষ বন্ধ হইতেছে না। ইহার কারণ কি? লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কথা অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষ একমাত্র দেশ নহে যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে এইদেশে ক্রমাগত দুর্ভিক্ষের কারণ বলিয়া কিছুতেই গণ্য করা যায় না। দুর্ভিক্ষের মূল কারণ অবশ্য বৃষ্টির অভাব। কিন্তু অনাবৃষ্টির প্রকোপ ত নিবারণ করা যায়। দুর্ভিক্ষ এবং দারিদ্র্য প্রতিবিধান করিবার তিনটি উপায় দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—(১) ভূমিকরের হ্রাস; (২) জল-প্রণালী ও কূপাদি খনন এবং (৩) বৎসর বৎসর ভারতবর্ষ হইতে যে পরিমাণ টাকা ইংলণ্ডে বাহির হইয়া যাইতেছে তাহা কমাইয়া দেওয়া।"

রমেশচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তার ধারা অনুশীলন করলে পরে দেখা যায় যে, 'ভূমিকর এবং ভূমিরাজস্ব' বিষয়টি বরাবর তাঁর চিন্তাকে আলোড়িত করেছে। এই সম্পর্কে তাঁর একটি বিশিষ্ট মত ছিল; তবে যেকালে তিনি এই মত প্রকাশ করেছিলেন, সেইকালের পটভূমিকাতেই তাঁর অভিমতের বিচার করতে হবে। যে দেশের অধিবাসীদের প্রধানতম অবলম্বন কৃষি, সে দেশে ভূমিরাজস্ব কম এবং চিরস্থায়ী হওয়া উচিত আর ভূমিকর হওয়া উচিত সুনির্দিষ্ট—এই সত্যটি সেদিন রমেশচন্দ্র বিশেষভাবে শাসকদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। এই বিষয়টি নিয়ে পরে এ দেশে যে ভূমিকর আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তারো পুরোভাগে ছিলেন তিনি। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডে ভারত সচিবের কাছে ভারতীয় ভূমিকর সম্বন্ধে একটি আবেদন পত্র বা মেমোরিয়াল প্রেরিত হয়। এর মোবিদা করেছিলেন রমেশচন্দ্র এবং এই স্মরণীয় আবেদন পত্রে তিনি ব্যতীত বাংলার ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি স্যর রিচার্ড গার্থ, বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব বিচারপতি স্যর জন জার্ডিন, মাদ্রাজের রাজস্ব বন্দোবস্তের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর মিঃ পাকল্, বাংলার মিঃ রেনল্ডস এবং আরো বিশিষ্ট রাজপুরুষ স্বাক্ষর

করেছিলেন। তাঁর *Famines in India* গ্রন্থে এই আবেদনপত্রের উল্লেখ আছে। পরবর্তিকালে 'ভারতী' পত্রিকায় (আষাঢ়, ১৩০৯) রমেশচন্দ্র 'ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধটি থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হোল। রমেশচন্দ্র লিখেছেন :

"মাদ্রাজ এবং বোম্বাই প্রদেশের অধিকাংশ স্থলে যেখানে ভূমিকর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৃষকদের নিকট হইতে লওয়া হয়, সেখানে চাষের খরচার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বাদ রাখিয়া গভর্ণমেণ্টের দাবী আসল উৎপন্ন মূল্যের অর্ধাংশের ভিতরে সীমাবদ্ধ রাখা কর্তব্য। এমন কি, ভারতবর্ষের সেই সকল প্রদেশে, যেখানে আনুমানিকরূপে আসলের অর্ধাংশ, তাবৎ-উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি বলিয়া গ্রহণ করা হয়, সেখানেও সাধারণত তাবৎ-উৎপন্নের এক-পঞ্চমাংশকে অতিক্রম করা উচিত নহে।...ভারতবর্ষে যতপ্রকার লোক গভর্ণমেণ্টকে ভূমিকর প্রদান করে তাহাদের মধ্যে মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের কৃষকেরা যে পরিমাণে নিরুপায় ও অসহায় এরূপ আর কেহই নহে।... ...কৃষিজীবী ব্যক্তিদিগের পক্ষে রাজা কতটা চাহিতে পারেন এবং কতটুকু তাহাদের নিজের থাকিবে, ইহা স্পষ্ট জানা ও বুঝিতে পারা ভারতবর্ষে যে পরিমাণে আবশ্যক বোধহয় পৃথিবীর আর কোথাও তত নহে। রাজার দাবীর অনিশ্চয়তা ভারতবর্ষে সকল কৃষিচেষ্টার সর্বনাশ করিতে থাকিবে। যতদিন না এরূপ কোন ভবিষ্যৎ শাসনকর্তার অভ্যুদয় হইতেছে যিনি প্রজাদিগের আরো একটু নিকটভাবে বুঝিতে পারিবেন, তাহাদিগের জন্য আরো একটু যথার্থ সহানুভূতি দেখাইবেন, এবং অনুগ্রহ করিয়া কৃষাণদিগের বোধগম্য ভাষায় তাহাদিগের নিকট ব্যক্ত করিবেন যে জমি উৎপত্তির কতখানি পর্যন্ত মাত্র গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগের নিকট হইতে দাবী করিতে পারেন এবং কতটুকু নিশ্চয়ই তাহাদের নিজের থাকিবে, রাজকর্মচারী বা বন্দোবস্তী কার্যকারকেরা তাহা স্পর্শও করিতে পারিবে না—ততদিন পর্যন্ত আমাদের মঙ্গল নাই।"

বঞ্চিত ও অসহায় চাষীদের সম্পর্কে এই যে সহানুভূতি, এ রমেশচন্দ্রের স্বদেশ-বাৎসল্যেরই একটি পরিচয় মাত্র।

ইংরেজ শাসনকালেই যে ভারতীয় শিল্পের অবনতি ঘটেছিল, এ-বিষয়ে রমেশচন্দ্র তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করে গিয়েছেন। পরবর্তিকালে তাঁরই চিন্তার সূত্র অবলম্বন করে মেজর বি ডি বসু এই বিষয়টি সম্পর্কে যথেষ্ট অনুশীলন করে *The Ruin of the Indian Trade and Industry* নামক একখানি মূল্যবান পুস্তক রচনা করেছিলেন। মেজর বসু তাঁর এই পুস্তকের ভূমিকায় সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করেছেন যে, রমেশচন্দ্রের কাছ থেকেই তিনি এই বিষয়ে প্রেরণা লাভ করেছেন। ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় শিল্পের ক্রমাবনতি শাসন-নীতিরই যে প্রত্যক্ষ ফল, এ-অভিযোগ রমেশচন্দ্র দ্বিধাহীন চিত্তেই করেছিলেন। এই সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম। ১৯০১ সালে তিনি একটি প্রবন্ধে লিখছেন: "ভারতের নূতন রাজা, স্বার্থলোভে ভারতের সম্বন্ধে যে অবিচারপূর্ণ নীতি অবলম্বন করিলেন, তাহা তাহাদের ঈপ্সিত ফলও প্রসব করিল। রেশম ও তুলার বস্ত্র বয়ন ভারতে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। যে জাতি পূর্বে অন্য জাতিকে বস্ত্র পরাইত, সে জাতিকে নিজের লজ্জা নিবারণের জন্য ইংলণ্ডের শরণাপন্ন হইতে হইল। নববিজিত প্রজাগণের মধ্যে স্বীয় শিল্প বিস্তারকল্পে নূতন বণিকরাজের অসাধারণ আগ্রহ দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইংলণ্ডের সংকীর্ণ শাসননীতিই আমাদের এই শিল্পহানির একটি কারণ। ভারতের শাসনভার ব্রিটিশহস্তে ন্যস্ত হইবামাত্র তাঁহারা ভারতীয় শিল্পের অবনতিসাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। ১৭৬৫ সালে বাংলার রাজস্ব সংগ্রহের ভার ইংরাজের হস্তগত হয়। চারি বৎসর পরেই কোম্পানির ডিরেক্টরগণের স্বাক্ষরিত এক আদেশে বলা হইল: 'বঙ্গের রেশম প্রস্তুতের ব্যবসায়কে উৎসাহিত এবং রেশম বয়নশিল্পকে নিরুৎসাহ করা হউক'। আরো আদেশ হইল: 'যাহারা রেশম কাটে, তাহাদের সকলকে কোম্পানির কলকারখানার কার্য করিতে বাধ্য করা হউক'।" রাজস্ব ও শাসন-বিভাগে দায়িত্বপূর্ণপদে সুদীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত থেকে রমেশচন্দ্র যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তা বৃথা হয়নি। তাঁর সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই তিনি ইংরেজ আমলে ভারতীয় শিল্পের অবনতির কারণগুলি একে একে পর্যালোচনা করে তাঁর বক্তব্যকে তথ্য ও প্রমাণসহকারে সেই সময়ে এমন প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন যা একমাত্র তাঁর মতন প্রতিভাবান ও স্বদেশবৎসল

মানুষের পক্ষেই সম্ভব। শুধু তাই নয়। তাঁর বিশ্লেষণ যেমন, বলবার ভঙ্গিও তেমনি নির্ভীক। রমেশচন্দ্র লিখছেন: "বিলাতি মাল ভারতে প্রচলিত করিতে বণিক-রাজ যথাসাধ্য যত্ন করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ড হইতে যেসকল পণ্য ভারতে প্রেরিত হইবে, তাহাতে অতি যৎসামান্য শুল্ক বসান হইল। অপরপক্ষে, ভারতের রপ্তানির উপর বিলক্ষণ শুল্ক চাপান হইল। মারে রাজা রাখে কে,—রাজা যখন এইরকম করিয়া ভারতীয় শিল্পের গলা টিপিয়া ধরিলেন, তখন সে শিল্পকে কে রক্ষা করিবে?" ইংরেজের বাণিজ্যনীতির এমন নির্ভীক এবং কঠিন সমালোচক ভারতবর্ষে সেদিন দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন না।

ভারতীয় শিল্পের অবনতিসাধনে পরোক্ষে রেলপথের দায়িত্ব সম্পর্কেও রমেশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন: "ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, অধিকাংশ প্রাচীন ভারতীয় শিল্পেরই অবনতি দেখা গেল। তাহার পর রেলপথ খুলিতে আরম্ভ হইল। যেমন পৃথিবীর সর্বত্র, সেইরূপ ভারতেও রেলপথ প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে। তাহা হইলেও এই রেলপথ দ্বারা আমাদের অনেক অনিষ্টও ঘটিয়াছে। ইহা রাজকোষে অর্থক্ষতি আনয়ন করিয়াছে। পঞ্চাশ কোটি টাকারও অধিক, এই লোকসান পূরণের জন্য রাজকোষ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ত, মালবহনের ব্যবসায়ে পূর্বে লক্ষ লক্ষ গরুর গাড়িওয়ালা, মাঝি প্রভৃতি প্রতিপালিত হইত, তাহাদের অন্ন গিয়াছে। তৃতীয়ত, এই রেলপথের সাহায্যে ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে বিলাতি পণ্যদ্রব্য গিয়া পৌঁছিতেছে—সুতরাং দেশীয় শিল্পাদির অবনতির পথ খুব প্রশস্ত হইতেছে।"

সবশেষে রমেশচন্দ্র এই সম্পর্কে একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন: "ইংরেজ আমলে ভারতের শিল্পকে কখনো উৎসাহিত করা হয় নাই বা তাহার রক্ষার জন্য কোনো উপায় অবলম্বন করা হয় নাই। বিলাতি মূলধনের লাভের দিকে অতি সাবধান মনোযোগ সর্বদাই দেখা যাইতেছে। অসংখ্য কমিশন বসিয়া তুলা, নীল, কাফি, চা, চিনি সম্বন্ধে রিপোর্ট করিয়াছে,—কি উপায়ে ব্রিটিশ মূলধন নিয়োজিত হইতে পারে। ভারতীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে কখনো কমিশন আহূত হয় নাই।" বিংশ শতকে ভারতীয় শিল্পের

পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা বিশেষভাবে পরিচিত তাঁরা অবগত আছেন যে, রমেশচন্দ্রের এই কঠোর সমালোচনায় ফল ফলতে বিলম্ব হয় নি।

চিন্তানায়ক রমেশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তাঁর আবেগবর্জিত স্বদেশপ্রেম আর কর্তব্যসম্পাদনে ধ্রুপদী নিষ্ঠার মধ্যে। এ-বিষয়ে কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই। স্বদেশেব সকল বকম উন্নতি ছিল তাঁব আন্তরিক কাম্য, কিন্তু সেই স্বদেশপ্রেম ছিল একান্তভাবেই বাস্তবধর্মী এবং যুক্তিনিষ্ঠ। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনা করার পেছনে ছিল তাঁর এই বাস্তবধর্মী স্বদেশপ্রেম। আমরা দেখেছি, স্বদেশের অর্থনীতি ও শিল্পোন্নতির চিন্তা এই মনীষির মনের অনেকখানি জুড়ে ছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে. বমেশচন্দ্রের সমকালে ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যাটি পর্যালোচনা করেছিলেন মাত্র আর আর একজন; তিনি দাদাভাই নৌরজি। নৌরজি সাহেবের আলোচনার পটভূমিকা অবশ্য খুব বিস্তীর্ণ ছিল না। একমাত্র রমেশচন্দ্রই সমগ্র ভিক্টোরীয় যুগের এবং তারো পূর্বেকার অর্থাৎ কোম্পানির শাসনকালের আদি পর্ব থেকে ভারতীয় অর্থনীতির উপর তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, এর একটি তথ্যপূর্ণ ইতিহাস রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অর্থাৎ ১৮৩৭ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯০০ সাল পর্যন্ত এই তেষট্টি বছরকালের অর্থনৈতিক ইতিহাস তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল। এই গ্রন্থ রচনায় তাঁর অমানুষিক পরিশ্রমের কথা চিন্তা করলে পরে বিস্মিত হতে হয়। তাঁর জীবিতকালে বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে। এ পর্যন্ত সর্বসমেত সাতটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে; শেষ এবং সপ্তম সংস্করণ প্রকাশের তারিখ ১৯৫০ সাল। বাংলা ভাষায় এমন একখানি মূল্যবান পুস্তকের অনুবাদ খুবই বাঞ্ছনীয়। কর্মজীবনে প্রবিষ্ট হবার তিন বছর পরে রমেশচন্দ্র বাংলার চাষীদের সম্পর্কে একখানি বই রচনা করেন, *The Peasantry of Bengal*; বাংলার চাষীদের অর্থনৈতিক অবস্থার সেই প্রথম আলোচনা। শুধু আলোচনা নয়, এর মধ্যে তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। এই পুস্তকের মধ্যেই বীজাকারে নিহিত ছিল তাঁর ভাবীকালের অক্ষয় কীর্তি—ভারতের অর্থনৈতিক

ইতিহাস। তখন থেকেই তিনি এইজন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ করতে প্রবৃত্ত হন এবং অন্যান্য সাহিত্যকর্মের অবসরে এর একটা outline বা খসড়া তৈরি করতে থাকেন। মোট পঁচিশ বছরের পরিশ্রম ও চিন্তা আছে তাঁর এই বইখানির পিছনে। কথিত আছে, রমেশচন্দ্র সাধারণত গভীর রাত্রে সাহিত্য-কর্মে রত হতেন এবং রাত্রি তিনটা পর্যন্ত অবিরাম লেখনী চালাতেন বাংলার এই কীর্তিমান নৈশ-চাষী। তাঁর এক আরদালী বলত: "সাহেবের হুকুম ছিল রোজ দুটো করে কুইল পেন কেটে তৈরি রাখবার এবং রোজ রাত বারোটার সময় তিনি লিখতে বসতেন আর ঐ কলম দুটোর অগ্রভাগ ভোঁতা হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি একমনে লিখতেন। কখনো কখনো তিনটা কলম তৈরি করে রাখবার জন্যেও বলতেন।" প্রতিভা যে পরিশ্রম ভিন্ন সার্থক হয় না, রমেশচন্দ্রের সাহিত্যজীবন তার একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের জীবনেও আমরা এই জিনিস প্রত্যক্ষ করেছি।

রমেশচন্দ্রের ভারতীয় অর্থনীতিক ইতিহাস গ্রন্থখানির নামপত্রটি এইরকম:

THE ECONOMIC HISTORY
OF
INDIA
IN THE
VICTORIAN AGE
From The Accession of Queen in 1837
To The Commencement of the Twentieth Century
BY
ROMESH DUTT, C. I. E.
LONDON
ROUTLEDGE & KEGAN PAUL LTD
1902

এই গ্রন্থের উনিশ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকাটি অত্যন্ত মূল্যবান। ভূমিকায় রমেশচন্দ্র লিখেছেন যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের হীরক-জয়ন্তী উৎসব যখন (১৮৯৭) লণ্ডনে সাড়ম্বরে উদ্‌ঘোষিত হয়, তখন দেখা গেল যে, ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যের তাবৎ অংশের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষই দৈন্য, দারিদ্র্য ও দুর্দশার মধ্যে অবস্থান করছে। সাম্রাজ্যের বৃহত্তম ও জনবহুল অংশ এর প্রাচুর্য, সম্পদ অথবা ক্রমোন্নতিশীল শিল্পের ভাগীদার হোর্তে পারেনি। তারপর তিনি লিখছেন :

"১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসে যখন আবার সাড়ম্বরে দিল্লী দরবার অনুষ্ঠিত হোল, তখনো দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হাজার হাজার ভারতবাসী রিলিফ ক্যাম্পে বাস করছিল।···ভারতে ইংরেজশাসন শান্তি এনেছে সত্য, কিন্তু সমৃদ্ধি আনেনি, কিংবা ইংরেজশাসনের ফলে ভারতের ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায়নি বা এ-বিষয়ে কোনো চেষ্টাও করা হয় নি।" তারপর ইংরেজশাসনের প্রথম যুগের বাণিজ্যিক নীতির কথা উল্লেখ করে রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক হোরেস হেম্যান উইলসনের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। মন্তব্যটি এই : "The British manufacturer employed the arm of political injustice to keep down and ultimately strangle a competitor with whom he could not have contended on equal terms." রমেশচন্দ্র বলেছেন যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে যখন ভারত সাম্রাজ্যের শাসনভার এলো তখন দেখা গেল যে, দেশের অর্থনৈতিক সর্বনাশ যা হবার তা হয়ে গেছে। ("The evil had been done...Long before 1858, when the East India Company's rule ended, India had ceased to be a great manufacturing country.")। শিল্পের ধ্বংসসাধন হোল, কিন্তু, রমেশচন্দ্র লিখেছেন, ইংরেজশাসনের আমলে কৃষিকার্যেরও তেমন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। *India Under Early British Rule, 1757-1837*, বইখানিতে রমেশচন্দ্র ইতিপূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারত সম্পর্কে ইংরেজের বাণিজ্যিক নীতির একটা আলোচনা করেছিলেন। ইংরেজ শাসনকালে ভারতের ধনসম্পদ এবং কাঁচামালের অপরিমিত ও অব্যাহত শোষণের শোচনীয় পরিণতির একটি প্রামাণ্য দলিল হিসাবেই রমেশচন্দ্রের 'ইকনমিক হিষ্ট্রি' আজো আমাদের কাছে মূল্যবান। চিরকালই মূল্যবান থাকবে।

ভূমিকার উপসংহারে তিনি লিখছেন : "The Indian Empire will

be judged by History as the most superb of huma institutions in modern times. But it would be a sad stor for future historians to tell that the Empire gave the peopl of India peace but not prosperity, that the manufacturer lost theit industries; that the cultivators were groun down by a heavy and variable taxation which precluded an saving; that the revenues of the country were to a larg extent diverted to England; and that recurring an desolating famines swept away millions of the population. —ভারতে ইংরেজশাসন সম্পর্কে সেদিন রমেশচন্দ্র এই অভিমতই প্রকা করেছিলেন এবং স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, তাঁর রাজভক্তি, তাঁর রাজানুগত কিছুই তাঁর দৃষ্টিকে আবিল বা চিন্তাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তাঁ প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এইখানেই। ভারতে ইংরেজশাসনের এমন বাস্তবনি ইতিহাস, পুঞ্জীকৃত তথ্য-প্রমাণসহকারে এমন বিস্তারিত আলোচনা দ্বার স্বদেশের যে অপরিমিত কল্যাণসাধন তিনি করে গিয়েছেন, আজো কী আমর তার যথার্থ মূল্যায়ন করতে পেরেছি?

অর্থনৈতিক ইতিহাস গ্রন্থখানির আয়তন বড় কম নয়; ছয়শত পৃষ্ঠাব্যাপী এই বইখানি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথমখণ্ডের আলোচনার কাল কোম্পানি আমল, অর্থাৎ ১৮৩৭ থেকে ১৮৫৮ সাল; দ্বিতীয়খণ্ডের আলোচনার কা মহারাণীর আমল অর্থাৎ ১৮৫৮ থেকে ১৮৭৬ সাল আর তৃতীয় খণ্ডে আলোচনার কাল ভারতসম্রাজ্ঞীর আমল (১৮৭৭ সালে ভিক্টোরিয়া 'Empres of India' বা 'ভারত-সম্রাজ্ঞী' উপাধি ধারণ করেন), অর্থাৎ ১৮৭৭ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত। দেখা যাচ্ছে যে, মোট তেষট্টি বছরকালের আর্থনীতিক বিবর্তনের ইতিহাস তিনি আলোচনা করেছেন! শুধু কি আলোচনা সেইসঙ্গে দুর্লভ সূক্ষ্ম দৃষ্টি সহকারে এমন একটি কঠিন বিষয়ের মর্মোদ্ঘাটন - এ কী কম ধীশক্তি আর অধ্যবসায়ের পরিচায়ক? এই দুঃসাধ্য প্রয়া একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। রমেশচন্দ্রের ইংরেজি, খাঁটি ইংরেজে ইংরেজি। সে যুগে ইংরেজি ভাষায় তাঁর সমতুল্য পারদর্শী লেখক ভারতব

দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। তবে তাঁর অন্যান্য ইংরেজি গ্রন্থ অপেক্ষা অর্থনৈতিক ইতিহাসের ইংরেজি, প্রকাশভঙ্গি ও রচনা-শৈলি যেন তাঁর পূর্ববর্তি সকল রচনাকে অতিক্রম করে গিয়েছে। নিঃসন্দেহে এই মূল্যবান গ্রন্থ রমেশচন্দ্রের পরিণত প্রতিভার ফল এবং তাঁর অতুলনীয় কীর্তি। প্রথম খণ্ডে চৌদ্দটি অধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ডে বারোটি অধ্যায় আর তৃতীয় খণ্ডে আছে চৌদ্দটি অধ্যায়। আলোচনার পরিধি যেমন ব্যাপক, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য যেমন সামগ্রিক, বিশ্লেষণও হয়েছে তেমনি সুচিন্তিত, সুযুক্তিপূর্ণ, আর সিদ্ধান্ত অপ্রতিরোধ্য। গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ে এবং প্রতিটি পৃষ্ঠায় লেখকের প্রচুর গবেষণাশক্তি ও বিচারবোধের স্বাক্ষর বিদ্যমান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিন্টো অধ্যাপক, সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্ ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রমেশচন্দ্রের অর্থনৈতিক প্রতিভার আলোচনা প্রসঙ্গে একবার লিখেছিলেন : "আমাদের যৌবনকালে রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত ইকনমিক হিস্ট্রি বইখানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন এ দেশে সরকারী মহলে যে উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল তার স্মৃতি আমি আজো ভুলিনি। অমন রাজভক্ত মানুষ, অমন একনিষ্ঠ সিবিলিয়ান যে ভারতে ইংরেজশাসনের এমন একটি নগ্ন চিত্র আঁকবেন, তাদের শোষণের কথা, রাজস্বের বে-বন্দোবস্তের কথা এমন কঠিন ভাবে আলোচনা করবেন, এ যেন তাঁদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। ভারতে শ্বেতাঙ্গ সমাজের অন্যতম মুখপত্র 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকা এর একটা বিরূপ সমালোচনা করে। ভারতে ইংরেজশাসনকে তিনি condemn করেছেন, এই রকম কথা বোধ হয় 'টাইমস' লিখেছিল। রমেশচন্দ্র তার একটি প্রতিবাদ করেছিলেন। ঐ কাগজেই জনৈক শ্বেতাঙ্গ সিবিলিয়ান একপত্রে রমেশচন্দ্রকে আক্রমণ করে লিখেছিলেন, 'এই বইতে এমন কতকগুলো ভ্রান্তিজনক উক্তি (misleading statement) স্থান পেয়েছে, যা সত্যের খাতিরে প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। বহু অর্ধসত্য এই বইতে স্থান পেয়েছে যার প্রতিবাদ হওয়া দরকার।' দেখা গেল, সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থে আঘাত করেছেন রমেশচন্দ্র। কিন্তু সমগ্র দেশবাসী তাঁর কাছে শুধু কৃতজ্ঞ নয়, চিরঋণী হয়ে থাকবে। শুধু অর্থনীতিতে সুপণ্ডিত ছিলেন না তিনি, তাঁর মধ্যে ছিল একটা দেশপ্রেম—সেই দেশপ্রেমই তাঁকে এই প্রয়োজনীয় কার্যে উদ্বুদ্ধ করে থাকবে।"

রমেশচন্দ্র বলেছেন যে, একটি জাতির সম্পদের উৎস হলো তার কৃষি, বাণিজ্য, শিল্পোৎপাদন এবং আয়-ব্যয় পরিচালনা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য নীতি। ইংরেজশাসন ভারতবর্ষে শান্তি এনেছে সত্য, কিন্তু দেশের জাতীয়সম্পদ বৃদ্ধিকল্পে কিছুই করতে পারে নি। বাণিজ্য ও উৎপাদন সম্পর্কিত সমস্যাবলী তিনি আলোচনা করেছেন তাঁর *India Under Early British Rule* বইখানিতে। ভারতসম্পর্কে ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক নীতির যে বিশ্লেষণ তিনি দিয়েছেন তার মূল বক্তব্যটা এই: "ভারতীয় শিল্পকে দমিয়ে রাখা এবং ইংলণ্ডের শিল্পকে পুরোমাত্রায় সাহায্য করা—এই প্রয়াসের মধ্যেই সার্থক হয়েছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক নীতি।" নিষেধাত্মক শুল্ক চাপিয়ে য়ুরোপে ভারতীয় পণ্যের আমদানী বন্ধ করে দেওয়া হয় আর অন্যদিকে নামমাত্র শুল্ক ধার্য করে ভারতে ইংলণ্ডের পণ্যদ্রব্যের অবাধ রপ্তানীর পথ প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। পলাশি যুদ্ধের পর থেকে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত এই নীতিই অনুসৃত হয়েছে অব্যাহত ভাবে। ইংলণ্ডের শিল্পের জন্য ভারতে কাঁচামালের উৎপাদন আর ভারতে ইংলণ্ডে প্রস্তুত পণ্যের অবাধ প্রচলন—এই ছিল গোড়ার দিকে ইংলণ্ডের দ্বিমুখী নীতি। এর ফল কি দাঁড়াল? ভারতীয় শিল্পের অবলুপ্তি। ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে সেই থেকে ফাটল ধরতে আরম্ভ করল। ১৮৩৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে আরোহণ করলেন, কিন্তু এই নীতির লক্ষ্যণীয় কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না শাসনব্যবস্থায়। কেন? রমেশচন্দ্র এর কারণ নির্ণয় করে লিখেছেন:" …It was not in human nature that they should concern themselves much with the welfare of the Indian manufacturers." অর্থাৎ ভারতীয় শিল্পের উন্নতি শাসক জাতির মোটেই কাম্য ছিল না। মিল ও মার্কসের বইতেও রমেশচন্দ্রের এই উক্তির সমর্থন আছে।

১৮৫৮। ভারতে কোম্পানির শাসনের অবসান হোল। দৃশ্যত শাসনব্যবস্থার পটপরিবর্তন হোল, কিন্তু শোষণের প্রক্রিয়া রইল অব্যাহত। দেশের

বাণিজ্যশুল্কের পূর্ণ কর্তৃত্ব মুষ্টিমেয় ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর হাতেই রয়ে গেল। এর ফল কি দাঁড়াল? রমেশচন্দ্র লিখেছেন: "The miserable clothing of the miserable Indian labourer, earning less then 2½d. a day, was taxed by a jealous Government. The infant mill industry of Bombay, instead of receiving help and encouragement, was repressed by an excise duty unknown in any other part of the civilised world." মহাবাণীর আমলে ভারতীয় অর্থনীতিব এই যে শোচনীয় বিপর্যয়, এরই একটি বিষাদময় বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন রমেশচন্দ্র তাঁর এই গ্রন্থে। সেদিন ইংলণ্ডের শিক্ষিত জনসাধারণের সামনে নির্ভীকভাবে তিনিই বলতে পেরেছিলেন: "গত দেড়শো বছর ধরে তোমাদের বাণিজ্যনীতি তোমাদেব শিল্পের স্বার্থেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে, ভারতেব শিল্পের স্বার্থে নয়।"

শিল্প বিপর্যস্ত হওয়ার প্রত্যক্ষ ফল এই দাঁড়াল যে, ভারতের জাতীয় আয়ের পথ সংকীর্ণ হয়ে এলো। বাকী বইল কৃষি। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও যা দেখা গেল সেটা আদৌ আশাপ্রদ নয়। সম্পদবৃদ্ধি দূরের কথা, দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পেও কৃষি সহায়ক হয়ে উঠতে পারল না। প্রচলিত ভূমিরাজস্বের ব্যবস্থাকেই বমেশচন্দ্র এর জন্য দায়ী করেছেন। দেশের আয় ব্যয়ের চিত্রও তেমনি নৈরাশ্যব্যঞ্জক। ১৮৯১-৯২ থেকে ১৯০০-০১—এই দশ বছরের রাজকরের পরিমাণ দেখা যায় ৬৪৭ মিলিয়ন স্টার্লিং, অর্থাৎ বছরে ৬৫ মিলিয়ন (এর মধ্যে রেলপথ, সেচকার্য ও আয়ের অন্যান্য হিসাব ধরা হয়েছে)। আর এই দশ বছরে ইংলণ্ডের ব্যয়েব পরিমাণ ১৫৯ মিলিয়ন অর্থাৎ বছরে গড়পরতায় ১৬ মিলিয়ন করে। দেখা যাচ্ছে যে, ভারতবর্ষ থেকে প্রাপ্ত রাজকরের এক-চতুর্থাংশ বছরে Home Charges' খাতে চলে যাচ্ছে। এর সঙ্গে ভারতবর্ষে রাজকর্মে নিযুক্ত ইংরেজ কর্মচারীরা বছরে যে পরিমাণ অর্থ ইংলণ্ডে প্রেরণ করে থাকেন তার হিসাব গণ্য করলে পরে দেখা যায় যে, "the total annual drain out of the Indian Revenue to England considerably exceeds 20 millons." শাসনব্যবস্থার পয়ঃপ্রণালী দিয়ে একটি দরিদ্রতম দেশের সম্পদের এই যে শতাব্দীকালব্যাপী প্রবাহ, এই যে "draining of the life-blood

of India in a continuous ceaseless flow,"—রমেশচন্দ্রের গ্রন্থে প্রতিটি অধ্যায়ে উদ্ঘাটিত হয়েছে এরই বাস্তব ও করুণ ইতিহাস।

'Home Charges' বাবদ একটা মোটা টাকা সেখানে চলে যেত প্রতি বছর এবং এটা সেখানে খরচ হত তিনটি দফায়, যথা—(১) ভারতীয় ঋণ বাবদ দেয় সুদ; (২) রেলপথ নির্মাণের বাবদ দেয় সুদ এবং (৩) সামরিক ও বেসামরিক খাতে খরচ।

ভারতীয় ঋণ বা 'Indian debt'—এই বিষয়টির রহস্য প্রথম উদ্ঘাটন করলেন রমেশচন্দ্র। ভারতবর্ষের উন্নয়নের জন্য এ-দেশে ব্রিটিশ মূলধনে নিয়োগ করা হয়েছে, এবং তারই ফল এই ঋণ। এই ধারণা যে কতদূর ভিত্তিহীন সেটা আমরা প্রথম জানলাম। রমেশচন্দ্র দেখিয়ে দিলেন গোটা ব্যাপারটি একটি myth ছাড়া আর কিছু নয়। কোম্পানির আমল থেকে অনেক কিছু খরচ ভারতবর্ষের ওপর চাপিয়ে দিয়ে এই myth-এর সৃষ্টি হয়েছিল, যেমন আফগান যুদ্ধ ও চীনের যুদ্ধের খরচ। ১৮৫৭ সালে এই ঋণের পরিমাণ ছিল ৭০ মিলিয়ন। মহারাণীর শাসনের আঠারো বছরকালের মধ্যে এটা দাঁড়াল দ্বিগুণ। সেই থেকে এই ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির পথেই চলতে থাকে। বিংশ শতকের প্রারম্ভে এই ঋণের পরিমাণ দেখা গেল ২১৪ মিলিয়নে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্ষতিপূরণ করবার শর্তে এ-দেশে রেলপথ নির্মাণ এই ঋণের একটা প্রত্যক্ষ কারণ বলে গণ্য করা হোত। কিন্তু আসল কথা তা নয়। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় রমেশচন্দ্র এই সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে লিখেছেন: "The history of the Indian debt is a distressing record of financial unwisdom and injustice; and every impartial reader can reckon for himself how much of this Indian debt is morally due from India." এই যে অপরিমিত শোষণ, এর অপরিহার্য পরিণতি দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ, সে কথাও তিনি বলেছেন স্পষ্ট করে। কারণ ভিন্ন কোন কার্য হয় না; তাই তো তিনি লিখলেন: "If India is poor today it is through the operation of economic causes" বিংশ শতাব্দীর সূচনায় রমেশচন্দ্র ইংরেজ শাসকদের চোখে যেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন—তোমাদের দেড়শো বছরের শাসন শোষণেরই নামান্তর মাত্র, ইতিহাসের কাছে

াকদিন তোমাদের এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে। রমেশচন্দ্রের অর্থনৈতিক চন্তা শাসকজাতির মত পরিবর্তনে যে অনেকখানি সহায়ক হয়েছিল, ারবর্তি ইতিহাস তার অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর এই অগ্রচারী চন্তার সম্যক অনুশীলন (বর্তমানের পবিবর্তিত বাজনৈতিক অবস্থায়ও) াজো করা যেতে পারে। শাসক, সে যেই হোক, প্রজার হিতসাধন করবে, াকে শোষণ করবে না—রমেশচন্দ্রের অর্থনীতির ইতিহাস গ্রন্থের ইহাই ল বক্তব্য। চল্লিশ বছর পরে সেই একই ধিক্কারবাণী আমরা শুনতে গেলাম বীন্দ্রনাথের কণ্ঠে। কবির 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধটি যেন রমেশচন্দ্রের চিন্তারই ্রতিধ্বনি। ভাগ্যচক্রের বিবর্তনে এই দেশ ত্যাগ করে চলে যাবার সময় পছনে যে লক্ষ্মীছাড়া, রিক্ত ভারতবর্ষকে ইংরেজ রেখে গেল, তারই প্রথম চিত্র সদিন এঁকেছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত।

গ্রন্থের সর্বশেষ অধ্যায়টির নাম: 'বিংশ শতকের ভারতবর্ষ'। এই ধ্যায়ে ভারতবাসীর অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে রমেশচন্দ্র লখেছেন: "সাম্প্রতিক কালে একাধিক দুর্ভিক্ষের ফলে এদেশের অধিবাসীদের ার্থনৈতিক অবস্থার তদন্তের প্রশ্ন যখন ইংলণ্ডে উঠেছিল, তখন (১৮৮৮) লর্ড াফরিনের শাসনকালে একটি তদন্ত হয়। সেই তদন্তের ফলাফল আজ পর্যন্ত ্রকাশিত হয়নি এবং উহা 'গোপনীয়' বলা হয়েছে। কিন্তু জনসাধারণের নকট দেশের অবস্থা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যাদি উদ্ঘাটিত না করা বিচক্ষণতার রিচয় নয়। ভারতবাসীর শোচনীয় দারিদ্র্য সম্পর্কে গোপন করার কি াছে? আর তাতে লাভ কি? "Evil is not remedied by being idden from the eyes,"—এই কথা বলেছিলেন রমেশচন্দ্র। ১৯০১ ালে উইলিয়ম ডিগবির *Prosperous British India* বইখানি যখন ্রকাশিত হয়, তখন ডিগবি উক্ত রিপোর্টের বহু উপকরণ তাঁর এই বইতে ন্নিবেশিত করেছিলেন এবং তারই ভিত্তিতে রমেশচন্দ্র তাঁর গ্রন্থের সর্বশেষ ধ্যায়টি রচনা করেন। রমেশচন্দ্র লিখছেন: "সকল প্রদেশেই খাদ্যাভাব; নাহার, অর্ধাহার এবং অনশন, ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশের, বিশেষ

করে বোম্বাই, পাঞ্জাব, মধ্য প্রদেশ, আগ্রা ও অযোধ্যার অধিবাসীদের নিত্য সঙ্গী। সরকারী স্বীকৃতিতেই বলা হয়েছে: 'The greater portion of the people of India suffer from a daily insufficiency of food...Hunger is very much a matter of habit... As a rule, a very large proportion of the agriculturists in a village are in debt.' এলাহাবাদের কমিশনার লিখছেন: 'I believe, there is very little between the poorer classes of the people, and semi-starvation; but what is the remedy?' আমি জিজ্ঞাসা করি, এই নৈরাশ্যজনক উক্তিই কি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সর্বশেষ কথা? প্রতিকারের পথ নিশ্চয়ই আছে, কারণ ভারতবর্ষের জমি অত্যন্ত উর্বরা, জনসাধারণ অতি শান্তিপ্রিয়, পরিশ্রমী এবং দক্ষ। একটি সুসভ্য গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য তাদের অবস্থার উন্নতিসাধনে যত্নশীল হওয়া।" তারপর রমেশচন্দ্রের নির্ভীক লেখনীতে ফুটে উঠল চরম ধিক্কারের বাণী: "It is the form and method of an absolute Government—not in touch with the people, and not able to secure their well-being—which is responsible for the failure of the administration in its highest wish and object."—এ রাজভক্ত রমেশচন্দ্রের কথা নয়, একজন প্রকৃত দেশ-হিতৈষী নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের উক্তি।. অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল পূর্বে লিখিত এই মন্তব্য বর্তমান স্বাধীন ভারতবর্ষের শাসকদের পক্ষেও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

প্রতিকারের উপায়ও রমেশচন্দ্র চিন্তা করেছিলেন। তিনি লিখেছেন: "The remedy lies in two words—Retrenchment and Representation. Retrenchment would permit a reduction in the imposts on land. Agriculture, virtually the only national industry in India, should be relieved...Other industries also need help. The Government of India should cease to act under mandates from Manchester...Above all, the national expenditure of India should be retrenched. The military

expenditure should be limited to India's requirements...The higher services of India should be opened more freely to qualified Indians, and should not be kept as a preserve for English boys seeking a career in the East. And the Home Charges, the annual expenditure of 17 millions of Indian money in London, should be steadily reduced. It is this annual Economic Drain from the food supply of India which inpoverishes the Indian population more than any other cause"

প্রতিকারের দ্বিতীয় উপায় সম্পর্কে রমেশচন্দ্রের বক্তব্য যেমন যুক্তিপূর্ণ তেমনি সুস্পষ্ট। তিনি লিখছেন: "Administration will not and cannot be successful until the people are admitted to some share in its control...for forty-five years Secretaries of State have ruled India without hearing the voice of an Indian member in his Council Chamber at Whitehall. Such exclusive and distrustful administration is unpopular as it is unsuccessful...we wish to bring the system of adminis-tator more into touch with the lives and interests of the people. The present constitution of the Indian Goverment is not in touch with the lives of the people, does not protect the interests of the people, and has not served the material well-being of the people.... The entire policy of Indian administration, in all its important details, is shaped and controlled and regulated by the oligarchy at Whitehall and the oligarchy at Simla. These is no place in the administrative machinery where the views of the people are represented, where the interests of the tax-payer protected." এই প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র ভারতবর্ষের অতীতের

কথা তুলে বলেছেন যে, পূর্বকালে ঠিক এই রকম ছিল না। হিন্দু এবং মুসলমান শাসকগণ সার্বভৌম রাজা ছিলেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারীও ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁরাও সচিবদের পরামর্শ অনুসারে চলতেন। তাঁদের শাসন অনুন্নত ছিল, সাবেকী ছিল সত্য, কিন্তু উহার ভিত্তি ছিল জনসাধারণের সহযোগিতার উপর। সম্রাট দিল্লীতে বসে শাসনদণ্ড পরিচালনা করতেন; তাঁর রাজ্যপালগণ শাসন করতেন প্রদেশগুলি; জমিদার প্রভৃতি তাদের জমিদারীর সম্পূর্ণ শাসনকর্তা ছিলেন আর গ্রামবাসীরা শাসন করত গ্রামের লোকদের। "The entire population, from the cultivator upwards, had a share in the administration of the country." এই সঙ্গে আধুনিক শাসনপদ্ধতির তুলনা করে রমেশচন্দ্র লিখেছেন: একথা সত্য যে আধুনিক শাসনপদ্ধতি কেন্দ্রানুগ (centralised) হওয়া দরকার, কিন্তু সেইসঙ্গে এ কথাও সত্য যে, ইহা সর্বতোভাবে প্রতিনিধিমূলক শাসন হওয়া চাই—নতুবা মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থার সঙ্গে এর বিশেষ কোন পার্থক্য থাকবে না। পরিশেষে জন স্টুয়ার্ট মিলের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে রমেশচন্দ্র তাঁর সর্বশেষ কথা লিখেছেন: "It is impossible to make Indian administration successful and the Indian people prosperous without admitting the people to a share in the control of their own affairs .. England herself stands to gain and not to lose by a constituontial Government in India...England's destiny hangs on the destiny of India"—পরবর্তিকালে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সুফল ফলতে খুব বেশি বিলম্ব হয়নি। ইংলণ্ড যেদিন বুঝতে পারল, তার ভাগ্য ভারতের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত, তার সমৃদ্ধি ভারতের সমৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত, সেদিন প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করতে এবং অবশেষে ভারতবাসীর হাতে শাসনক্ষমতা তুলে দিতে ইংলণ্ড আর এতটুকু দ্বিধা করে নি। ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস প্রণয়ন রমেশচন্দ্রের বৃথা হয় নি।

কথিত আছে, এন এন ঘোষের মতোন ব্যক্তি তাঁর এই বইখানি আদ্যন্ত পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁর মতোন নিরাশবাদী ও নির্ভীক সমালোচক

বলেছিলেন: "এক গরুর গাড়ি বোঝাই কংগ্রেস বক্তৃতা অপেক্ষা রমেশ দত্তের অর্থনৈতিক প্রবন্ধগুলি বেশি মূল্যবান।" এই গ্রন্থখানি পাঠ করবার ফলে শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে ইংরেজশাসনের প্রতি প্রসন্নভাব বিদূরিত হয়ে একটা বিদ্বেষভাবই জাগরিত হোল। 'এই শাসনের নাম শোষণ'—এই চিন্তাধারার জন্মদাতা রমেশচন্দ্র দত্ত। ভারতবর্ষে এত ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে কেন? রমেশচন্দ্র লর্ড কার্জনের চোখে আঙুল দিয়ে বললেন—দুর্ভিক্ষ তোমাদেরই শোষণ নীতির ফল। অর্থনৈতিক ইতিহাসে এই সত্যকেই তথ্য-প্রমাণের একটি গ্রানাইট ভিত্তির উপর তিনি স্থাপন করেছেন। অরবিন্দ ঘোষ তাই বলেছিলেন: "রমেশ দত্তের অর্থনৈতিক চিন্তা ভিন্ন বাঙালির স্বদেশী আন্দোলনের 'বয়কট' এত সহজে হোতে পারত কিনা সন্দেহ। এক্ষেত্রে তিনি শুধু ইতিহাস লেখেন নি, ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।" ইংরেজশাসন ব্যবস্থার অন্তরালে শোষণ নীতির নগ্ন চিত্র এঁকে রমেশচন্দ্র ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে ধারাটি প্রবর্তন করে গিয়েছেন তার গুরুত্ব কী অসাধারণই না ছিল।

সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশে রমেশচন্দ্রের আর্থনীতিক চিন্তা নতুন করে যাচাই করে নেবার প্রয়াস দেখা গিয়েছে। কোনো কোনো বিজ্ঞ পণ্ডিত 'ইকনমিক হিস্ট্রি' গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়কে পুরাতনযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গি-প্রসূত বলে বাতিল করতে চেয়েছেন। অথচ অর্থনৈতিক গবেষণার ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্রের এই বইখানি যে এঁদের সকলের উপজীব্য, এতো কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। অধুনা একজন তথাকথিত সুবিজ্ঞ অধ্যাপক তাঁর এই জাতীয় একখানি পুস্তকের ভূমিকায় লিখেছেন:

"He derived its institutional treatment from the prevailing view of history, its moral tone from the self-righteousness of Gladstonian liberalism, and its utilitarian bias from the Indian middle class ethos at the end of the nineteenth century. Dutt's work is an articulation of this *Zeitgeist*. Trade of the East India Company seemed to him

to have been an engine of destruction of native industry, its finance—a medium of drainage of native wealth, its revenue policy—an obstacle to agrarian progress, and its military expansion—an orgy of patronage and corruption which produced the huge Indian debt. In this he was a follower of Mill and and Wilson. Economic transition did no appear to him as evolving out of the complex interplay o changing economical and political forces. He saw them a unconnected strands and missed the interwoven texture of their growth . He found unity not in the working out o an impersonal process but in the sustained utterance of a moral judgment. And he failed to see the seminal role of the private British capitalist in India."*

এই কথা বলবার পর লেখক বলেছেন, যেহেতু রমেশচন্দ্রের "attitude and method are outcome of the particular historica situation"—সেই হেতু ইহা বর্জনীয়। অধ্যাপক ত্রিপাঠীর এই উক্তি বিচার মনে রাখতে হবে যে, 'ইকনমিক হিস্ট্রি' লেখা হয়েছিল এই শতকের স্বচনায় একটি অনালোচিত বিষয়ের তিনি পথিকৃৎ। তৎকালীন প্রচলিত যুগচিন্তা দ্বার প্রভাবিত হয়েও এবং উদারনৈতিক মতবাদের অনুবর্তি হওয়া সত্ত্বেও, সমগ্র ভিক্টোরীয় যুগের জটিল অর্থনৈতিক সমস্যার আনুপূর্বিক আলোচনায় রমেশচন্দ্র যে নিরাসক্ত ছিলেন, তাঁর দৃষ্টির বা চিন্তার স্বচ্ছতা যে আবিলতামুক্ত ছিল, এর প্রমাণ তো তাঁর গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান। যে আর্থনীতিক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে তখনকার ভারতবর্ষ চলছিল, তার গতি ও প্রকৃতি রমেশচন্দ্র গভীরভাবেই পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং তাকে তিনি সমকালীন ইতিহাস থেকে আদৌ বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। ভারতে private British capital-এর নিয়োগের ফলে ইংরেজের স্বার্থ কি পরিমাণে এই দেশের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে

---

* *Trade and Finance in the Bengal Presidency* : **Amalesh Tripathi**

উঠেছিল, তার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে তারই একটা বাস্তব চিত্র আঁকবার শক্তি সেদিন মডারেট রমেশচন্দ্রের কব্জিতেই ছিল। ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মূলধনের প্রয়োগের ফলাফল সম্পর্কে বিতর্কের স্থান আছে এবং এ বিষয়ে কি একালে, কি সেকালে, পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য বিদ্যমান। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনুসৃত বাণিজ্যিক নীতির ফলে ভারতের নিজস্ব অর্থনৈতিক কাঠামো কি সত্যিই ধ্বংস হয় নি? এবং ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের মূলে কি ভারতের সম্পদ প্রত্যক্ষ প্রেরণা জোগায় নি? তাইতো দেখি, তাঁর গ্রন্থের সর্বশেষে রমেশচন্দ্র যেখানে বলছেন : 'England's destiny hangs on the destiny of India"—সেখানে তিনি কত বড়ো দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে গেছেন, তা অনুধাবন করলে পরে তাঁর আর্থনীতিক চিন্তার মধ্যে অসঙ্গতির লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না।

॥ বারো ॥

১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে রমেশচন্দ্র 'মোম্বাসা জাহাজে চড়ে ভারতবর্ষে ফিরলেন; এ-কথা আগেই বলেছি। এবার তাঁর সহযাত্রী ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা (মিস মার্গরেট এলিজাবেথ নোবল)। রমেশচন্দ্র নিবেদিতা প্রসঙ্গ অনেকের নিকট সুপরিচিত নয়, যেমন সুবিদিত ন রমেশচন্দ্র-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করে আমি যতটু জানতে পেরেছি, আমার প্রিয় পাঠকদের কাছে তা জানাবার মতোন। রমেশ চন্দ্র বিবেকানন্দের চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো ছিলেন, তবু এই দুই দত্ত-কুলোদ্ভ বরণীয় বাঙালি-সন্তানের মধ্যে একটা আন্তরিক প্রীতির সম্পর্ক নিঃশব্দে গড়ে উঠেছিল। বিবেকানন্দ রমেশচন্দ্রের গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং তাঁর প্রতিভ ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। অন্যদিকে রমেশচন্দ্র দূ থেকে বিবেকানন্দের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতেন তাঁর প্রচণ্ড স্বদেশপ্রেম ও তাঁর সর্বজনীন আদর্শের জন্য। স্বদেশপ্রেমের স্বর্ণসূত্রদ্বারাই উনিশ শতকে সমকালীন প্রত্যেকটি বাঙালি চিন্তানায়কের জীবন অন্যের জীবনের সঙ্গে বিধৃ ছিল; এই কালের ইতিহাস যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা কেউ-ই এ কথাটা বিশেষভাবে চিন্তা করেন নি। সেই কারণেই বোধ হয় উনিশ শতকে বাঙালির নব-জাগৃতির স্রষ্টাদের বিবিধ চিন্তা ও কার্যের আলোচনায় যুগপ প্রকাশ পেয়েছে একটি সংকীর্ণ মনোভাব ও পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। কোনে একজনকেই আমরা বিগ্রহ হিসাবে দেখেছি; কিন্তু এই সত্যটা আমরা ভুলে যাই যে, কোনো একজনের চিন্তা বা কার্যের ফলে জাগৃতি সম্ভবপর নয় এঁদের প্রত্যেকের চিন্তায় একটা পারস্পরিক সম্পর্ক যদি না থাকত তা হোলে জাগৃতির এমন অখণ্ড রূপ আমরা দেখতে পেতাম কিনা সন্দেহ। উনি শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার নব-জাগরণের যে ইতিহাস, তার পেছনে আছে বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধ উপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষ, প্রভৃতির মিলিত চিন্তা। আরো অনেকের নাম করা যায় যেমন, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিবনাথ শাস্ত্রী, চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ একাধিক দেশপ্রেমিক। রাজনীতি, সাহিত্য, ধর্ম, ও সমাজচিন্তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এঁদের স্ব স্ব চিন্তার স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও, এঁদের সমকালীনতা এঁদের অনেককেই পারস্পরিক প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছিল। রমেশচন্দ্রের সময়ের কথাই বিবেচনা করা যাক। তখনকার ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে তিনি যাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেককেই তিনি ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন, স্নেহ করতেন। বয়োঃ-কনিষ্ঠ বিবেকানন্দ ছিলেন তাঁর পরম প্রীতি ও স্নেহের পাত্র। দুঃখের বিষয়, রমেশচন্দ্রের জীবনীকার, তাঁর জামাতা জে. এন গুপ্ত এসব বিষয়ে কিছুই আলোচনা করেন নি। ফলে তার রচিত *Life and Work of R. C. Dutt* বইখানি তথ্যপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও উহা অসম্পূর্ণ। রমেশচন্দ্রের জীবনে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ যেমন আছেন তেমনি আছেন বিবেকানন্দ, নিবেদিতা; অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ। এঁদের কারো কথাই তাঁর জীবনীকার লেখেন নি ; বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, সুরেন্দ্রনাথ ও নিবেদিতার নামের উল্লেখ আছে মাত্র। অরবিন্দ ও বিবেকানন্দের নামের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। আমরা অন্য দিকে দেখা যায় যে, বিবেকানন্দ-সাহিত্যে রমেশচন্দ্র সুলিখিত। সমসাময়িক ইতিহাসের সামগ্রিক রূপরেখা বুঝতে হলে সমকালীন সকলের কথাই আলোচনা করতে হয়—অবশ্য যাঁদের জীবন আলোচনার যোগ্য। রমেশচন্দ্রকে বুঝতে হোলে তাঁর সমকালীন বরণীয় বাঙালি সন্তানদের মধ্যে অনেকের কথা-যেমন বলতে হয়, তেমনি বলতে হয় দাদাভাই নৌরজি, ফিরোজ শা মেটা, গোপালকৃষ্ণ গোখলে ও টিলকের কথা। এঁদের সকলের সঙ্গেই তিনি একযোগে দেশের কাজ করেছিলেন।

বিবেকানন্দের জন্মকালে রমেশচন্দ্র বিলাতে অধ্যয়নরত ছাত্র। সুতরাং বিবেকানন্দের প্রকৃত কর্মজীবন যখন আরম্ভ হয়, তখন দেখা যায় রমেশচন্দ্রের ভাবধারা ভারতের সমাজজীবন, এবং এর আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক জীবনকে বিশেষভাবেই প্রভাবিত করতে আরম্ভ করেছে। বিবেকানন্দের ভাবধারা

রমেশচন্দ্রের ভাবধারা থেকে অনেকখানি পৃথক ছিল; কিন্তু আমেরিকা ও
ইংলণ্ডে এই তরুণ সন্ন্যাসীর বেদান্ত প্রচার অভিযানের মধ্যে কেবলমাত্র ধর্ম ব
ভগবানই যে স্থান পায়নি, বরং সমাজকল্যাণচিন্তা ও অর্থনীতিও যে স্থা
পেয়েছে, এই জিনিস লক্ষ্য করে রমেশচন্দ্র বিবেকানন্দের প্রতি প্রথম আকৃ
হয়েছিলেন। ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে রমেশচন্দ্র সরকারী চাকরি থেকে
অবসর গ্রহণের প্রাকালে দশমাসের ফার্লো নিয়ে বিলাত যাত্রা করেন আর ঠিক
সেই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ প্রায় পাঁচ বৎসর কাল পরে ভারতে প্রত্যাবর্তন
করেন। ১৮৯৭, ২৮শে, ফেব্রুয়ারি তারিখে কলকাতায় একটি জনসভায়
তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হোল; মানপত্র পাঠ করলেন রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব
বাহাদুর। এই অভিনন্দনের উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ যা বলেছিলেন তার মধ্যে
ছিল স্বদেশপ্রেমের এক নূতন বার্তা। বিনয়কৃষ্ণের এক পত্রে এ-কথা জানতে
পেরে লণ্ডন থেকে রমেশচন্দ্র বিনয়কৃষ্ণকে উত্তরে লিখলেন: "আপনার পত্রে
বিবেকানন্দ সম্পর্কে সংবাদ পেয়ে যারপরনাই আনন্দিত হলাম। এই হৃদয়বান
সন্ন্যাসীর দ্বারা দেশের, বিশেষ করে বাংলার যুবসম্প্রদায়ের অনেক কল্যাণ
সাধিত হবে।" সেই সময়ে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বিনয়কৃষ্ণ দেবের
নিকট রমেশচন্দ্রের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, "দত্তসাহেব বেদের বাংলা-
অনুবাদ করছেন আবার ভারতের দুর্ভিক্ষ নিয়ে চিন্তা করছেন, এ কী কম
প্রতিভার পরিচায়ক! তিনি একজন যথার্থ দেশপ্রেমিক। আমি তাঁর প্রতি
গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করি। এবার তিনি যখন দেশে ফিরবেন আমাকে তাঁর সঙ্গে
একবার আলাপ করিয়ে দেবেন।" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ১৮৯৭ সালে
লণ্ডনে মিস মার্গারেট নোবলের সঙ্গে রমেশচন্দ্রের প্রথম পরিচয় হয়েছিল।
তার কিছুকাল পূর্বেই মার্গারেট বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন এবং
তাঁকে 'গুরু' বলে বরণ করেছেন। লণ্ডনে রমেশচন্দ্রের একাধিক বক্তৃতা, বিশেষ
করে তাঁর রামায়ণ ও মহাভারতের ইংরেজি কাব্যানুবাদ মার্গারেটকে তাঁর প্রতি
এমন প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে যে, এই বিদুষী আইরিশ মহিলা তাঁকে 'ধর্মপিতা'
বলে স্বীকার করেন। এই বিদেশিনী ভারতপ্রেমিকাকে রমেশচন্দ্র তাঁর
কন্যার সমতুল্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুতঃ লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দের
কাছে আত্মনিবেদনের অব্যবহিত পরে ভগিনী নিবেদিতা যখন রমেশচন্দ্র

দত্তের সঙ্গে পরিচিতা হন, তখন থেকেই ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি যেন আরো প্রবল আকর্ষণ বোধ করতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু, যদুনাথ সরকারের সঙ্গে পরিচয়ের বহু আগে নিবেদিতা রমেশচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য ও দেশপ্রেম দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

১৮৯৯ সালের মাঝামাঝি সময় বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বারের জন্য যুক্তরাষ্ট্র গমন করেন। যাবার পথে তিনি লণ্ডন হয়ে গিয়েছিলেন। এই যাত্রায় নিবেদিতা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। জুলাই মাসের শেষে তিনি লণ্ডনে এসে পৌছলেন। এখানে তিনি ১৬ই আগষ্ট পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। রমেশচন্দ্র তখন লণ্ডনে। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের কাছে তিনি এই ভারতপ্রেমিকের কথা শুনেছেন; তারপর নিবেদিতার কাছ থেকেও যখন রমেশ দত্ত সম্পর্কে শুনলেন, তখন স্বামীজির মনে এক প্রবল আগ্রহ হোল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য। নিবেদিতাই উৎসাহী হয়ে সেদিন লণ্ডনে ভারতবর্ষের এই দুই মনীষির মধ্যে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছিলেন। নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে বিবেকানন্দ স্বয়ং এসেছিলেন রমেশচন্দ্রের কাছে। এ ঘটনা ১৮৯৯ সালের অ'গস্ট মাসের কথা। বন্ধু বিহারীলাল গুপ্তের কাছে লিখিত রমেশচন্দ্রের এক পত্রে এই সাক্ষাৎকারের উল্লেখ আছে। "I met Swami Vivekananda yesterday. He came to see me accompanied by Miss Margaret Noble. I was impressed by him." রমেশচন্দ্র সহজে কারো সম্পর্কে এমন কথা—"I was impressed"— লিখবার মানুষ ছিলেন না। সুতরাং এর থেকে বুঝা যায় যে, তিনি এই ভারতপ্রেমিক সন্ন্যাসীর মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু দেখেছিলেন যা তাঁকে সেদিন মুগ্ধ করেছিল। রমেশচন্দ্র বিবেকানন্দকে একখানি *Civllization in Ancient India* পুস্তক উপহারস্বরূপ দিয়েছিলেন। স্বামীজি সাগ্রহে রমেশচন্দ্র-প্রদত্ত এই বইখানি শুধু পাঠ করেন নি, পরে এক পত্রে তিনি তাঁকে লিখে জানিয়েছিলেন: "প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার এমন সুনিপুণ চিত্র এর আগে আমি আর কোন বইতে পাইনি; নিঃসন্দেহে ইহা আপনার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান হিসাবে স্বীকৃত হবে। প্রথম যৌবনে একদা আপনার 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' ও 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' উপন্যাস দুইখানি পাঠ করে আমি যারপরনাই মুগ্ধ হয়েছিলাম; সেইসময় থেকেই আমি আপনার সম্পর্কে আমার অন্তরে শ্রদ্ধা পোষণ করে

এসেছি। আমাদের কর্মের ক্ষেত্র পৃথক হোলেও চিন্তার ক্ষেত্রে বোধহয় আমি আপনার সগোত্র।"

১৪ই আগষ্ট ১৮৯৯। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটিতে অধ্যাপক বেন (Prof. Bain) উপনিষদ্ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই সভায় রমেশচন্দ্র ও বিবেকানন্দ দুজনেই উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি ছিলেন স্যর রেমণ্ড ওয়েস্ট। অধ্যাপক রীস ডেভিসও নিমন্ত্রিত শ্রোতাদের মধ্যে একজন ছিলেন। অধ্যাপক বেনের বক্তৃতাটি সভায় তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করল। বিবেকানন্দ সেই বিতর্কে অংশ গ্রহণ না করে থাকতে পারলেন না। য়ুরোপের লোকদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপ্রীতি নৈর্ব্যক্তিক অসীম ব্রহ্মের অনুভূতির পক্ষে প্রবল অন্তরায়স্বরূপ—এইরকম একটা কথা বিবেকানন্দ তাঁর সেই বক্তৃতায় বলেছিলেন। অধ্যাপক রীস ডেভিস ঈষৎ বিচলিত হলেন। তিনি এর একটা জবাব দিলেন। বিবেকানন্দ আবার উঠলেন এবং যখন তিনি "I have the greatest respect for the European intellect"—এইকথা বলে তাঁর প্রত্যুত্তর আরম্ভ করলেন তখন সভায় একটি নিস্তব্ধভাবে বিরাজ করতে লাগল। সেদিনকার সভায় রমেশচন্দ্রও যোগদান করেছিলেন এবং তিনিও তাঁর বক্তৃতায় বিবেকানন্দের কথার পুনরুক্তি করে বলেছিলেন যে, য়ুরোপীয়দের intellect সম্পর্কে তিনি শ্রদ্ধা পোষণ করে থাকেন, কিন্তু ভারতের অধ্যাত্মজ্ঞান বা অধ্যাত্মচিন্তা যে সেই intellect থেকে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এ-কথা বলতেও তিনি পরম গৌরববোধ করেন। সভার শেষে রমেশচন্দ্র ও বিবেকানন্দ একসঙ্গে এক গাড়িতেই ফিরলেন। পথিমধ্যে উভয়ের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়েছিল। সেদিন রমেশচন্দ্র বিবেকানন্দকে বলেছিলেন—"আমার যা সাধ্য করেছি এবং করব, তবে য়ুরোপে আপনার মতোন মানুষের প্রয়োজন আছে। racial supremacy ভাবটা এদের যেন মজ্জাগত—আমি এটা আদৌ বরদাস্ত করতে পারি না—" এই কথা বলেছিলেন বিবেকানন্দ রমেশচন্দ্রকে। রমেশচন্দ্রের এক পত্রে এই ঘটনাটির উল্লেখ আছে।

এরপর স্বামীজি তাঁর মানসকন্যা নিবেদিতাকে রমেশচন্দ্রের এই মূল্যবান বইখানির একটি সমালোচনা লিখতে বলেছিলেন। স্বামীজির মৃত্যুর পর 'ইণ্ডিয়ান রিভিয়ু' পত্রিকায় নিবেদিতা 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা' বইখানির

একটি বিস্তারিত সমালোচনা লিখেছিলেন। পরবর্তিকালে কলকাতায় একবার এক সভায় বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনবার জন্য রমেশচন্দ্র নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং তিনি সে-নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলেন। "নরেন খুব চমৎকার বক্তৃতা করতে পারে; তার বক্তৃতার ওজস্বী ভাষা এবং প্রগাঢ় চিন্তা আমার ঈর্ষার বিষয়," এই কথা একবার তিনি বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে বসে। ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের অকালমৃত্যুতে রমেশচন্দ্র যারপর নাই মর্মাহত হয়েছিলেন এবং সেইসময়ে তাঁর অন্তরের সুগভীর বেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করে তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে একখানি পত্র লিখেছিলেন। বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর নিবেদিতা রমেশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন, বিশেষ করে তিনি যখন বরোদা রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। নিবেদিতার সঙ্গে রমেশচন্দ্রের পিতা-পুত্রীর সুনিবিড় সম্পর্ক বাংলার জাতীয় ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায়। "নিবেদিতা অতি নিকট হইতে রমেশ-চন্দ্রের স্বদেশপ্রীতিমূলক কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। রমেশচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার মধ্যে ভারত-আত্মার পরিচয় প্রদানের আন্তরিক প্রয়াসও তিনি লক্ষ্য করেন।" বস্তুতঃ রমেশচন্দ্রের জীবন ও কর্ম, এবং প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং সেই শ্রদ্ধার ততোধিক আন্তরিক প্রকাশ—ইহাই রমেশচন্দ্রকে ভারতসেবিকা নিবেদিতার নিকট পরম শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছিল।

বিবেকানন্দের অন্যতম মার্কিন শিষ্যা মিসেস ওলে বুলের সঙ্গেও রমেশচন্দ্র বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। য়ুরোপে অবস্থানকালে তিনি নরওয়েতে মিসেস বুলের আতিথ্য গ্রহণ করে কিছুকাল তাঁর ভবনে বাস করেছিলেন। নিবেদিতা ও মিসেস বুল—এই দুইজন বিদেশিনী মহিলার বিবেকানন্দ-প্রীতি দেখে তিনি খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকার নর-নারীর মনের ওপর বিবেকানন্দ সেদিন যে আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তা রমেশচন্দ্র প্রত্যক্ষ করে গিয়েছেন। পরবর্তিকালে বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর তাঁর অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দকেও (কালী মহারাজ) রমেশচন্দ্র বিশেষ স্নেহ করতেন।

অভেদানন্দকে স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন, "কালী, রমেশ দত্তের ইতিহাসখানা ভাল করে পড়িস আর যদি পারিস ঐ ধরণের আর একখানা বই লিখবার চেষ্টা করিস। এইরকম বইয়ের খুব দরকার।" অভেদানন্দ যখন তাঁর *India and Her People* গ্রন্থখানি রচনা করতে প্রবৃত্ত হন তখন তিনি রমেশচন্দ্রের কাছ থেকে অনেক পরামর্শ ও সাহায্য লাভ করেন। রমেশচন্দ্র তাঁকে অনেক ঐতিহাসিক উপাদান সানন্দে সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। অভেদানন্দ তাঁর পুস্তকের ভূমিকায় এ-কথা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করেছেন। তাঁর বইখানি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় এবং এইদেশে এই বইখানির প্রকাশ ও প্রচার দীর্ঘকাল নিষিদ্ধ ছিল।

বিবেকানন্দের মৃত্যুর পরে নিবেদিতার বাগবাজারের স্কুলটির আর্থিক অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে ওঠে; মিশন থেকে তিনি কোনোপ্রকার সাহায্য পান নি। স্কুল বন্ধ হবার উপক্রম হোল। নিবেদিতা সব কথা খুলে তাঁর 'ধর্মপিতা' রমেশচন্দ্রকে সেই সময়ে একখানি পত্র লিখেছিলেন। রমেশচন্দ্র নিবেদিতাকে তখনি কিছু টাকা পাঠিয়ে দিয়ে পরামর্শ দিলেন যে, তিনি যেন অতঃপর বই লিখে ও বই প্রকাশ করে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করেন। রমেশচন্দ্রের এই পরামর্শ নিবেদিতাকে উৎসাহ দিল। সেই উৎসাহের পরিণতি—*The Web of Indian Life* নামক বিখ্যাত বই। ভারত-সংস্কৃতির কথা যতভাবে প্রচারিত হয়, রমেশচন্দ্রের তাই ছিল একান্ত কাম্য। তাই আমরা দেখতে পাই যে, নিবেদিতাকে তিনি এই বই লিখবার ব্যাপারেও যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। সতর নম্বর বোসপাড়া লেনের ছোট্ট স্কুলটিতে নিবেদিতার কর্মপ্রয়াসকে কেন্দ্র করে যখন ভারতের নবজাগরণের উদ্যোগপর্বের সূচনা হয়েছিল তখনো আমরা দেখতে পাই যে, রমেশচন্দ্র প্রায়ই সেখানে আসতেন এবং আলোচনা-সভায় নিবেদিতাকে অনেক বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। শুধু তাই নয়। এই সময়েই বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা শিখবার জন্য তিনি নিবেদিতাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ধর্মপিতার কাছ থেকে এইভাবে তিনি নানা সদুপদেশ লাভ করেছিলেন! পরাধীন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে নিবেদিতা রমেশচন্দ্রের কাছেই

সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেছিলেন এবং তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের সবসময়েই বলতেন—"Read Dutt's *Economic History*." বস্তুতঃ নিবেদিতা তাঁর ধর্মপিতার স্বদেশপ্রেম ও অর্থনৈতিক ভাবধারার দ্বারা বিশেষভাবেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। নিবেদিতার আধ্যাত্মিক জীবনে বিবেকানন্দের প্রভাব যতখানি, তাঁর রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক জীবনে রমেশচন্দ্র দত্তের প্রভাবও ঠিক ততখানি। তাইতো দেখতে পাই রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর শোকার্তা পত্নী মাতঙ্গিনী দত্তকে সমবেদনা জানিয়ে যে পত্রখানি তিনি লিখেছিলেন তার সর্বশেষ কথাটি ছিল এই: "He was so splendid through and through." রমেশচন্দ্রের চরিত্র ও মনীষার মূল্যনির্ণয়ে নিবেদিতার শুক্তির মতোন নিটোল এই একটি উক্তিই যথেষ্ট।

॥ তেরো ॥

এইবার রমেশচন্দ্রের জীবনের বরোদা-অধ্যায় সম্পর্কে কিছু বলব।

১৮৯৫ সালে তিনি যখন বর্ধমান-বিভাগের অস্থায়ী কমিশনার পদে নিযুক্ত হলেন, তখনই বরোদার গাইকোবাড় শয়াজী রাও রমেশচন্দ্রের নিকট একখানি পত্র লিখে তাঁকে অবসর গ্রহণের পর বরোদা রাজকার্যে যোগদানের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন। পত্রোত্তরে রমেশচন্দ্র মহারাজাকে জানালেন যে, তিনি সরকারী চাকরি থেকে যখন অবসর গ্রহণ করবেন, তখন তিনি মহারাজার এই অনুরোধ বিবেচনা করে দেখবেন। বরোদা রাজ্যের তখনকার শাসনব্যবস্থায়, বিশেষ করে অর্থনৈতিক অবস্থায় রমেশচন্দ্রের মতোন একজন উপযুক্ত ব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ১৯০৪ সালে তিনি যখন বিলাত থেকে ফিরলেন তখন মহারাজার পক্ষ থেকে আবার এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ১৯০৪ সালের আগস্ট মাসে রমেশচন্দ্র রাজস্ব-সচিব হিসাবে বরোদা রাজকার্যে যোগদান করেন। ঐ পদে তাঁর অবস্থানকাল ছিল দু'বছর এগার মাস। বেতন ছিল মাসিক তিন হাজার টাকা। এর আগে আর কোনো বাঙালি কোনো দেশীয় রাজ্যে এমন উচ্চপদ লাভ করেন নি এবং এর আগে আর কোনো উচ্চপদস্থ ভারতীয় সরকারী কর্মচারী অবসর গ্রহণের পর কোনো দেশীয় রাজ্যে যোগদান করেন নি। তখন এণ্ড্ ফ্রেজার বাংলার ছোটলাট। রমেশচন্দ্র ও ফ্রেজার দুজনে একই বছরে একসঙ্গে সিবিল সার্বিসে যোগদান করেছিলেন। সেইসময়ে একদা বেলভেডিয়ার প্রাসাদে গাইকোবাড়ের সম্মানার্থে একটি ভোজসভার আয়োজন হয়। সেই সভায় রমেশচন্দ্রের নিয়োগ সম্পর্কে ছোটলাট তাঁর বক্তৃতাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন: "ভারতীয় সিবিল সার্বিসের শ্রেষ্ঠতম রত্নটিকে মহারাজা গ্রহণ করেছেন; আমি আশা করি মিঃ দত্ত দ্বারা তাঁর রাজ্যের বহুতর উন্নতি সাধিত হবে।"

রমেশচন্দ্রের বয়স তখন ছাপ্পান্ন বৎসর যখন তিনি বরোদা রাজকার্যে যোগদান করেন। প্রশ্ন করা যেতে পারে, সেই বয়সে তাঁর নতুন করে চাকরি নেবার কী প্রয়োজন ছিল? সরকারী চাকরির মোটা পেন্সন

ছিল, প্রকাশিত পুস্তকাবলীরও একটা আয় ছিল। সংসারের দায়িত্ব আর বিশেষ কিছু ছিল না; মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে, (কমলা, বিমলা, অমলা ও সরলা—এই চারটি মেয়ের বিয়ে হয়েছিল যথাক্রমে স্বনামধন্য প্রমথনাথ বসু, ইঞ্জিনিয়ার বলীনারায়ণ বড়া, ব্যারিস্টার ক্ষীরোদবিহারী দত্ত আর সিবিলিয়ান জে এন গুপ্তের সঙ্গে। সর্বকনিষ্ঠা কন্যা সুশীলা খুব স্থূলাঙ্গী ছিল বলে তার বিয়ে দেন নি।), আর একমাত্র পুত্র অজয় দত্ত তখন বিলাতে ব্যারিস্টারি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। যে বয়সে মানুষের একটু নিশ্চিন্ত অবসর যাপনের সময়, সেই বয়সে রমেশচন্দ্র আবার চাকরি নিলেন কেন? রমেশচন্দ্র নিজেই এর উত্তর দিয়েছেন। বন্ধু বিহারীলাল গুপ্তকে এইসময়ে বরোদা থেকে এক পত্র লিখে তিনি জানিয়েছিলেন যে, সুদীর্ঘকাল যাবৎ সরকারী কর্মে নিযুক্ত থেকে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, একটি প্রাগ্রসর দেশীয় রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় সেই অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে তিনি দেখতে চান যে, কিছু সাফল্যলাভ করা যায় কি না। আর অগ্রজকে লিখেছিলেন: "If I succeed in my endeavours the result will reveal itself to the world, and Baroda will be a model State in India, not only in education and methods of administration, but also in the prosperity of the agricultural people and the starting of new mills and industries" বরোদা থেকে তাঁর 'ধর্মকন্যা' নিবেদিতাকে এক পত্রে রমেশচন্দ্র লিখেছিলেন: "I am trying to initiate progress in all lines and to make Baroda a happier State" রমেশচন্দ্রের প্রকৃতির মধ্যে ছিল একটি প্রকাণ্ড কর্মস্পৃহা—এবং সেই কর্মস্পৃহাই তাঁকে সেই পরিণত বয়সে অত দূর দেশে নিয়ে গিয়েছিল।

বরোদায় তিনি যে তিন বছর কাল ছিলেন সেই সময়ের মধ্যে রমেশচন্দ্রের শাসনব্যবস্থায় রাজ্যের কি কি উন্নতিমূলক সংস্কার সাধিত হয়েছিল, তার সম্পূর্ণ বিবরণ অনুসন্ধিৎসু পাঠক দেখতে পাবেন ঐ তিন বছরের বাৎসরিক

বিবরণীতে। রমেশচন্দ্র প্রণীত এবং বরোদা রাজ্যসরকার কর্তৃক তিন খ
প্রকাশিত *Baroda Administration Report* নানাদিক দিয়া মূল্যবা
রাজস্ব, অর্থ ও ভূমিব্যবস্থা,—প্রধানত এই তিনটি বিভাগের দায়িত্ব রমেশচন্দ্রে
উপর ন্যস্ত ছিল। এই রিপোর্টের প্রথম খণ্ডের সমালোচনা প্রসঙ্গে স্টেটসম্য
পত্রিকায় মন্তব্যের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হোল: "The Report c
the Administration of Baroda compiled by Mr. Romes
Dutt is remarkable. His is more than a work of reference
it is a book that can be read and enioyed. It bear
testimony not only to the conditions prevailing in th
dominons of Gaekwar, but also to the literary abilit
of his Revene Minister.... It tells us within the limit
of a handy volume, all that we know." রিপোর্ট রচনায় সিদ্ধহ
রমেশচন্দ্র, কি সরকারী কর্মজীবনে, কি বরোদা রাজ্যের রাজস্ব বিভাগে
ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসাবে যেসব রিপোর্ট রচনা করে গিয়েছেন, যদি কেউ য
সহকারে সেগুলি পাঠ করেন, আমার বিশ্বাস, তা'হোলে তিনি সমকালী
বাংলা ও একটি দেশীয় রাজ্যের আর্থনীতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাস সম্পে
বহু মূল্যবান তথ্য আহরণ করতে পারবেন।

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়েছি যে ভারতীয় কৃষকদের দুর্গতির কথা রমেশচন্দ্রে
চিন্তায় বিশেষ স্থান পেয়েছিল। বরোদায় এসে তিনি ভূমি-রাজস্ব বিভাগে
যেসব সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন তার মধ্যেও দেখা যায় যে, "he showe
the same anxiety for the tiller of the soil as he had don
while criticising the system prevailing in British India
রাজ্যের একটি তালুকের ভূমিকর হ্রাস করা সম্পর্কে রাজস্ব-সচিব হিসাবে
রমেশচন্দ্র গাইকোবাড়কে ১৯০৭ সালের ১১ই জানুয়ারি তারিখে যে পত্রখা
লিখেছিলেন তার মধ্যে তাঁর নির্ভীক মনোভাবের পরিচয় আছে। তাতে
তিনি লিখেছিলেন: 'We are all endeavouring to improve th
administration and the condition of the people.
But all endeavours will be in vain unless we moderat

the land assessment where it is excessive." এই চিঠিতে রমেশচন্দ্র তাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে একটি মূল্যবান মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন: "Land assessment is more intimately related in India to the everyday life of the people, and to their growth towards prosperity or towards degradation." রমেশচন্দ্রের এই সুচিন্তিত মন্তব্য আজো তার মূল্য হারায় নি।

বরোদা রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে সংস্কার প্রবর্তনে রমেশচন্দ্রের বৈপ্লবিক চিন্তা যে কতদূর ফলপ্রসূ হয়েছিল এবং এর ফলে এই দেশীয় রাজ্যটির আভ্যন্তরীণ উন্নতি যে কতদূর ঘটেছিল তার সমগ্র পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে হলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন। শিক্ষা, স্বায়ত্ত শাসন, ভূমি-রাজস্ব, শিল্প,—সকল বিভাগেই এই সময়ে বরোদা রাজ্যের প্রভূত পরিবর্তন ও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এর আগে ঠিক এইরকম উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল ১৮৭৩ সালে যখন বরোদা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন দাদাভাই নৌরজি। শাসনব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দূর করে ও বহুবিধ সংস্কার প্রবর্তন দ্বারা নৌরজি সাহেব তখন যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, রমেশচন্দ্র সে কথার উল্লেখ করেছেন তাঁর 'ইকনমিক হিস্ট্রি' বইতে। তাঁর জীবনীকার লিখেছেন যে, "The fostering and encouragement of indigenous industries was one of the principal features of Mr. Dutt's administration as Revenue Minister." তিন খণ্ডে প্রকাশিত পূর্বোক্ত রিপোর্টগুলিতে এর আনুপূর্বিক পরিচয় মিলবে। রাজ্যের একটি উচ্চ দায়িত্বসম্পন্ন কর্মে নিযুক্ত থেকে রমেশচন্দ্র নিজেকে রাজ্যের জনসাধারণ থেকে কোনো-দিন বিচ্ছিন্ন রাখেন নি। শাসক হিসাবে তিনি আদর্শ পুরুষ ছিলেন। যদিও রাজ্যের বিবিধ কার্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁর সময় ও শক্তির অনেকখানি ব্যয়িত হোত, তথাপি, তাঁর জীবনীকারের মতে, "Mr. Dutt was not the man to busy himself in the dust and dreariness of more official routine." জনসাধারণের সেবা ছিল তাঁর লক্ষ্য; সু-শাসনের প্রচলিত নীতিকে তিনি একটি বাস্তব রূপ দেবার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস পেয়েছিলেন—এবং এইগুণেই রমেশচন্দ্র দত্ত বরোদা রাজ্যের সকল শ্রেণীর

নর-নারীর চিত্ত জয় করতে পেরেছিলেন। সেখানে তাঁকে সবাই 'দেওয়ান বাবু' বলে ডাকত। বস্তুতঃ গাইকোবাড় তাঁকে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর মর্যাদাই দিয়েছিলেন। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, রাজকার্যের মধ্যে থেকেও তিনি গুজরাতী সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচয় গ্রহণ করতেও বিস্মৃত হন নি।

বরোদার চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ভবিষ্যতে তিনি নিজেকে কোন্ কাজে নিযুক্ত রাখবেন, সেই বিষয়েও রমেশচন্দ্র তাঁর কর্মসূচী নির্ধারিত করেছিলেন। ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯০৬ সালে বরোদা থেকে অগ্রজকে লেখা একটি পত্রে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ সাহিত্য-প্রয়াসের কথা এই ভাবে ব্যক্ত করেছেন: "I have a better plan in my head of writing a history of the Indian people from the ancient times to A. D. 1900! It will be in some six big volumes, and will record once for all Indian view of India's ancient civilisation, of the condition and the progress of the people under the Muhammadans, and of British administration during 150 years.... I will take up the work the day I retire from the Baroda service." কিন্তু তাঁর এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। কথিত আছে, ১৯০৬ সালে এপ্রিল মাসের এক বিনিদ্র রজনীতে রমেশচন্দ্রের মনে এই পরিকল্পনার উদয় হয়েছিল। যদিও পরবর্তিকালে একাধিক ভারতীয় ঐতিহাসিক এই জাতীয় ইতিহাস রচনা করেছেন, তথাপি সেসব প্রয়াস যেমন অসম্পূর্ণ তেমনি পক্ষপাতদুষ্ট। একদা আচার্য যদুনাথ সরকার এই গ্রন্থের লেখককে বলেছিলেন যে, তিনি যে ইতিহাস-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তার মূলে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা এবং সেই সময় নিবেদিতা তাঁকে বলেছিলেন—'Try to follow the line chalked out by that great historian, Mr. R. C. Dutt." যদুনাথের ইচ্ছা ছিল যে, তিনি রমেশচন্দ্র-পরিকল্পিত কাজে হাত দেবেন; কিন্তু মুঘল যুগের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়েই তাঁর সময় চলে যায়। যদি কোনো ঐতিহাসিক এই কার্যে অগ্রসর হতে পারেন, তা হোলে ভারত-ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একটি বড়ো রকমের কাজ হবে।

বরোদায় রমেশচন্দ্র গাইকোবাড়ের একজন বেতনভুক্ উচ্চপদস্থ কর্মচারী মাত্র ছিলেন না; তাঁর ব্যক্তিত্ব, চরিত্র এবং শাসনকার্যে অসাধারণ দক্ষতা তাঁকে মহারাজের নিকট অতি প্রিয়পাত্র করে তুলেছিল। গাইকোবাড় নিজে ছিলেন একজন উচ্চশিক্ষিত, উদার-হৃদয় এবং রাজকর্মে সুঅভিজ্ঞ ব্যক্তি। গুণীর কাছেই গুণীর আদর। তাই আমরা দেখতে পাই যে, গাইকোবাড় রমেশচন্দ্রকে শ্রদ্ধা করতেন, বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর সঙ্গে একজন কর্মচারী অপেক্ষা একজন বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করতেন। স্বাধীনচিত্ত রমেশচন্দ্রকে তাই বরোদা রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রবর্তনে বিশেষ কোনো বাধা পেতে হয়নি। বস্তুতঃ সকল রাজকর্মচারীই (এঁদের মধ্যে একজন শ্বেতাঙ্গ সিবিলিয়ানও ছিলেন) রমেশচন্দ্রের ব্যবহারে যারপর নাই প্রীত ছিলেন এবং তিনি সকলের সহযোগিতা লাভ করতে পেরেছিলেন। গাইকোবাড় শয়াজী রাও-র শাসনকালে বরোদারাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে হিন্দু, পার্শী, ইংরেজ, মুসলমান প্রভৃতি কর্মচারীর সমাবেশ ঘটেছিল। রাজ্যের প্রধান বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন একজন মুসলমান। এঁরা সকলেই রমেশচন্দ্রকে গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন। একটি দেশীয় রাজ্যের দেওয়ান হিসাবে এই যে সফলতা, নিঃসন্দেহে এ তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে।

বরোদায় রমেশচন্দ্র কেবলমাত্র রাজকার্য নিয়েই তাঁর সময় অতিবাহিত করেন নি। যে সামাজিক মর্যাদায় তিনি সেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তার ফলে একাধিক সম্রান্ত রাজন্যপুরুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, দেখা যায়। ত্রিবাঙ্কুর, নাভা, জাঞ্জিরা প্রভৃতি রাজ্যের কি হিন্দু, কি মুসলমান, বহু সামন্ত নৃপতি তাঁকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখতেন। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা রাম বর্মা এবং রাজভ্রাতা কেরল বর্মা উভয়েই বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। রমেশচন্দ্র উভয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। মহারাজার অনুরোধে তিনি একবার ত্রিবাঙ্কুর পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। কেরল বর্মা একজন সাহিত্যরসিক ব্যক্তি ছিলেন। ১৯০৯ সালে রমেশচন্দ্র যখন তাঁর 'মাধবীকঙ্কণ' উপন্যাসের একটি সংক্ষিপ্ত ইংরেজি অনুবাদ, *The Slave girl of Agra* নাম দিয়ে প্রকাশ করেন, তখন ঐ অনুবাদ পাঠ করে কেরল বর্মা এর

একটি সমালোচনা লিখেছিলেন। রমেশচন্দ্র ঐ সমালোচনাটির প্রশংস করেছিলেন। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য পরিদর্শনে এসে তিনি সেই দেশের সাহিত্যের অগ্রগতি সম্পর্কে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন এবং পরে এই বিষয়ে তিনি কেরল বর্মার কাছ থেকে লিখিত একটি 'নোট' চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। ঐ দেশের সাহিত্য সম্পর্কে রমেশচন্দ্রের একটা প্রবল আগ্রহ ছিল। রমেশচন্দ্রের ভারতীয় অর্থনীতির ইতিহাস বইয়ের প্রথম সংস্করণে ত্রিবাঙ্কুরের অর্থনৈতিক পরিচয় অনুল্লিখিত ছিল; কেরল বর্মা-ই এই দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং কিছু তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন যা গ্রন্থের পরবর্তি সংস্করণে সন্নিবেশিত হয়

বরোদায় রমেশচন্দ্র কাজ করেছিলেন ১৯০৪ এর আগস্ট মাস থেকে ১৯০৭ এর জুলাই পর্যন্ত। একাদিক্রমে তিন বছর যাবৎ একটি দেশীয় রাজ্যের সর্বাপেক্ষা দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে বরোদার সামগ্রিক, বিশেষ করে অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যাপারে কী পরিমাণ প্রতিভা ও শ্রম তিনি নিয়োগ করেছিলেন তা স্বল্প পরিসরের মধ্যে বলে শেষ করা যায় না। এই তিন বছরে তিনি যেসব নীতি (Policy) ও সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন তার ফলে বরোদা রাজ্যের প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। একটি দেশীয় রাজ্যের উন্নতি সাধনে রমেশ-প্রতিভা কী পরিমাণ যুগান্তর এনে দিয়েছিল, আজ এই সুদূর কালের ব্যবধানে, তা আমরা সম্যক উপলব্ধি করতে পারব না। মনের মত ক্ষেত্র পেয়ে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ পেয়ে তিনি যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তার ফলেই বরোদায় ভাবী উন্নতির সূচনা হয়েছিল। রমেশ-প্রতিভার একটি বড়ো পরিচয় আছে বরোদার প্রশাসনিক বাৎসরিক বিবরণগুলির মধ্যে। বরোদার রাজস্ব-সচিব হিসাবে রমেশচন্দ্র দ নিঃসন্দেহে তিন বছরে ত্রিশ বছরের কাজ করে গিয়েছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে রমেশচন্দ্র যখন বরোদায় রাজকার্যে নিযুক্ত হন, তখ এখানে ছিলেন আরেকজন বরণীয় বাঙালি-সন্তান। তিনি অরবিন্দ ঘোষ। বিলাতে থাকতেই গাইকোবাড়ের দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়েছিল। বিলাতে থাকতেই অরবিন্দ শয়াজী রাও-র প্রাইভেট সেক্রেটারি নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ১৮৯৩ সালের মার্চ মাসে মহারাজার সঙ্গে একই জাহাজে চড়ে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত করেন। তখন থেকেই তিনি বরোদা রাজকার্যে যোগদান করেন, পর

রাজকলেজের ইংরেজির অধ্যাপক এবং পরে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়ে সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসরকাল এখানে অতিবাহিত করেছিলেন। প্রবীণ রমেশচন্দ্র যখন রাজস্ব-সচিব হয়ে এখানে আসেন তখন অরবিন্দের বয়স বত্রিশ বছর। বরোদা থেকে বাংলায় ফিরে আসার আগে তিনি এখানে অন্ততঃ দু'বছর রমেশচন্দ্রের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। অরবিন্দ রমেশচন্দ্রের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের কথা শুনেছিলেন। বরোদায় থাকাকালীন অরবিন্দ রামায়ণ ও মহাভারত কাব্যের ইংরেজি অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন। একদিন তিনি সেই অনুবাদ রমেশচন্দ্রকে দেখিয়েছিলেন। সে অপূর্ব অনুবাদ পাঠ করে রমেশচন্দ্র মুগ্ধ হলেন; এর তুলনায় তাঁর অনুবাদ যে অকিঞ্চিৎকর, সে-কথা গুণগ্রাহী রমেশচন্দ্র অরবিন্দকে জানাতে দ্বিধা বোধ করেন নি। বলেছিলেন, "আগে জানতে পারলে আমার অনুবাদ ছাপাতাম না।" রমেশচন্দ্রের এই উদারতা অরবিন্দকে যারপর নাই বিস্মিত করল। তিনি বলেছিলেন, "আপনি ইংরেজিতে সুপণ্ডিত, আপনার অনুবাদ নিশ্চয়ই ভালো হয়েছে; আপনার বই যখন ছাপা হয়েছে তখন আমার এই অনুবাদ ছাপার অক্ষরে আর প্রকাশ করব না।" অরবিন্দ তাঁর কথা রেখেছিলেন; তার জীবিতকালে তাঁর সেই অনুবাদ প্রকাশে তিনি বিরত ছিলেন। দুঃখের বিষয়, রমেশচন্দ্রের জীবনীকার তাঁর বইতে অরবিন্দের নামটি কোথাও উল্লেখ করেন নি। না করবার একটা কারণ অবশ্য অনুমান করা যায়। রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে অরবিন্দ যে মন্তব্যটি প্রকাশ করেছিলেন তা অনেকেই পছন্দ করেন নি, রমেশচন্দ্রের আত্মীয়েরা তো নয়ই। এ-বিষয়ে স্থানান্তরে আলোচনা করব।

বরোদায় রমেশচন্দ্রের প্রবাস-জীবন একরকম নিঃসঙ্গ ছিল বললেই হয়। তাঁর স্ত্রী ও কন্যারা ক্বচিৎ এখানে এসে বাস করতেন। বড়ো মেয়ে কমলা একবার সপরিবারে এসে বাবার কাছে ছয় মাস ছিলেন এবং তার আগে স্ত্রী ও দ্বিতীয়া কন্যা বিমলা কিছুকাল এখানে বাস করেন। নতুবা বরোদায় রমেশচন্দ্র একাই ছিলেন। বন্ধু বিহারীলালকে তাই তিনি বার বার লিখতেন: "I shall be delighted to have your company, for it is a lonely cheerless

life I am leading here." বরোদায় তাঁর প্রবাস-জীবনের একটি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন বড়ো মেয়ে কমলা। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন: "আমি যখন বরোদায় পিতৃদেবের সঙ্গে অবস্থান করছিলাম, তখন সপ্তাহে আমরা দু'দিন টেনিস ও একদিন ব্যাডমিনটন খেলতাম। খেলার পর হাল্কা রিফ্রেসমেণ্ট ও গান হোত। আমার মেয়েরা বাংলা গান গাইত। মিসেস মেটা গাইতেন গুজরাতী গান আর স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের লেডি সুপারিনটেনডেণ্ট মিস ডোরে গাইতেন মারাঠি গান; শরীফ বীণ বাজাতো এবং তার সঙ্গে সে হিন্দী গান গাইত। এই সান্ধ্য গানের আসর খুব জমত এবং চিত্তাকর্ষক ছিল; রাত আটটা কি ন'টাব আগে এই আসর বন্ধ হোত না। সকলেই পিতৃদেবের আতিথেয়তায় যারপর নাই পরিতুষ্ট ছিলেন। বরোদার নরনারী নির্বিশেষে সকলেব মুখেই শুনতাম: 'দেওয়ান বাবু গরীব কা দোস্ত'—দেওয়ান বাবু গরীবেব বন্ধু। আমরা যখন ছিলাম তখন এখানে একটি মহিলা সম্মেলন হয়; পার্শী, গুজরাতী, মারাঠি ও কিছু বাঙালি মেয়ে - মোট চারশো মহিলা এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন; কিছু আবৃত্তি ও গান হয়েছিল। আমার মেয়ে প্রতিমা বন্দেমাতবম্ গেয়েছিল। বাংলার বাইরে তখনো পর্যন্ত বন্দেমাতরম্ গানের খুব বেশী প্রচলন হয় নি, অনেকে শুধু এর নামই শুনেছিল, তাই সম্মেলনে সমবেত মহিলারা যখন গানটি শুনলেন তখন তাঁরা যারপর নাই মুগ্ধ হলেন; এত মুগ্ধ হলেন যে প্রতিমাকে গানটি তিনবার গাইতে হয়েছিল। বরোদায় দেখেছি রাজ্যের কী সম্ভ্রান্ত, কী সাধারণ, সকল লোকই পিতৃদেবকে অপরিসীম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখত। গুজরাতী 'গর্বা' উৎসব হোত শরৎকালে; তিনি এই উৎসবের খুব প্রশংসা করতেন। বরোদা রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের কাজের গুরুভার দায়িত্ব পালন করেও, দেখেছি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাধনা থেকে পিতৃদেব নিজেকে বিরত রাখতেন না। বরোদার নিঃসঙ্গ জীবনকে তিনি এমনি ভাবেই কর্মের দ্বারা পরিপূর্ণ করে রাখতেন।"

বরোদা রাজ্যের চীফ মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন ডাঃ মেটা আর প্রধান বিচারপতি ছিলেন তায়েবজী। এই দুই পরিবারের সঙ্গে রমেশচন্দ্রের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ডাঃ মেটার স্ত্রী শারদাকে তিনি কন্যার মতোন মনে করতেন। এই বিদুষী মহিলাই রমেশচন্দ্রের 'সংসার' উপন্যাস গুজরাতী

ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। অনুবাদ-গ্রন্থের নাম 'সুধাহাসিনী'। রমেশচন্দ্র গুজরাতী ভাষা শিখেছিলেন। 'সুধাহাসিনী' পাঠ করে তিনি এক পত্রে শারদাকে লিখেছিলেন: "The translation is so deeply interesting to me." প্রবাসে এই দুই পরিবারের সকলেই তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনকে অনেকখানি পূর্ণ করে রেখেছিলেন। কিন্তু এই চাকরি তাঁর আর যেন ভাল লাগছিল না। ১৯০৭, ১৭ই এপ্রিল, শারদাকে লিখিত একপত্রে রমেশচন্দ্র তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করে বলছেন: "I have done something in Baroda in these three years; let me plunge back to those pursuits which are dearest to my heart—" সাহিত্যের বৃহত্তর জগতে ফিরে যাবার জন্যে এই যে আকুতি, ইহাই তো রমেশচন্দ্রের প্রতিভার একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য।

বরোদায় থাকবার সময়েই হায়দ্রাবাদ থেকে সরোজিনী নাইডু রমেশচন্দ্রকে একখানি পত্র লিখে (এই চিঠির তারিখ ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০৬) তাঁর *The Golden Threshold* কাব্যগ্রন্থখানি উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন তাঁর অভিমতের জন্য। ঐ পত্রে তিনি রমেশচন্দ্রকে 'one of the great men of modern India' বলে অভিহিত করেছেন, দেখা যায়। রমেশচন্দ্র সরোজিনী নাইডুকে তাঁর রামায়ণ-মহাভারত-এর ইংরেজি কাব্যানুবাদ এক প্রস্থ পাঠিয়ে শিষ্টাচার প্রদর্শন করেছিলেন।

১৯০৫ সাল।

বারাণসীতে গোপালকৃষ্ণ গোখলের পৌরোহিত্যে জাতীয় কংগ্রেসের একবিংশতিতম অধিবেশন বসল। গান্ধীর রাজনৈতিক গুরু গোখলে শিক্ষাব্রতী, ত্যাগীপুরুষ। পুণার ফার্গুসন কলেজের এই কৃতী অধ্যাপক ১৯০২ সালে মাত্র ত্রিশ টাকা পেনসন নিয়ে দেশের কাজে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। গোখলের বাঙালি-প্রীতিও সুবিদিত। তিনি রমেশচন্দ্রের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন এবং রমেশ-চন্দ্র সম্পর্কে অন্তরে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। রমেশচন্দ্র গোখলের পাণ্ডিত্য ও অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমের প্রতি বহুপূর্বেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বারাণসী

কংগ্রেসে তাঁকে সভাপতির পদে নির্বাচন করার প্রস্তাব রমেশচন্দ্রই করেছিলেন। কথিত আছে, সেইসময়ে তিনি গোখলেকে 'Coming man of India' বলে উল্লেখ করেছিলেন। কাশী কংগ্রেসে সভাপতির মঞ্চ থেকে এই গোখলেই মুক্তকণ্ঠে বলেছিলেন: "All India owes a deep debt of gratitude to Bengal." এই কংগ্রেসে ভগিনী নিবেদিতাও উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেস অধিবেশনের সময় কাশীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় শিল্প সম্মেলনে (Indian Industrial Conference) রমেশচন্দ্র সভাপতিত্ব করলেন। এর একটি নেপথ্য ইতিহাস আছে। ১৮৯০ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন বসেছিল তাতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ও ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ শিল্পপ্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন এবং তাঁর সেই ইঙ্গিত অনুসরণ করে ১৮৯১ সালে ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতি-মানসে কলকাতায় একটি শিল্প সম্মেলনের আয়োজন হয়। রমেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ জামাতা, প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথ বসু ছিলেন এর উদ্যোক্তা। সেইথেকে শিল্পপ্রদর্শনী ও শিল্পসভা এবং ভারতীয় শিল্পসম্পদ্ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা কংগ্রেসে মাঝে মাঝে হোতে থাকে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা। এই আন্দোলনের একটা প্রত্যক্ষ ফল এই ছিল যে দেশীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবন, উন্নতিসাধন এবং স্বদেশজাত জিনিসের বহুল ব্যবহার বিষয়ে উদ্যোগ। ১৯০৫-এর কাশী কংগ্রেসে যে শিল্পমেলার অনুষ্ঠান হয় তাকে একটা বাস্তব ও স্থায়ীরূপ দেবার জন্যই এই ভারতীয় শিল্প-সম্মেলনের অনুষ্ঠান। রমেশচন্দ্র দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতির কথা চিন্তা করেছেন; বরোদায় রাজস্ব-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত থাকবার কালে তিনি তাঁর চিন্তাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার একটা ব্যবহারিক ক্ষেত্র পেয়েছিলেন। কাজেই নব-অনুষ্ঠিত ভারতীয় শিল্প সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ তাঁকেই সভাপতি-পদের যোগ্য ব্যক্তি বলে মনে করলেন। এই সম্মেলনের তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯০৫। তাঁর অন্যান্য বহু ভাষণের মধ্যে এটিও অত্যন্ত মূল্যবান ও সারগর্ভ। রমেশচন্দ্র স্বদেশী আন্দোলনে কোনো সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি, কারণ তখন তিনি বরোদার রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনকে তিনি যে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন, কাশীর বক্তৃতায় তা

প্রমাণ আছে। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা এই যে, কুটীর ও গ্রামীণ শিল্পের পর্যায় অতিক্রম করে ভারতবর্ষ যে অদূর ভবিষ্যতে শিল্পের পথে পদক্ষেপ করবে এবং শিল্পের উন্নতি ভিন্ন যে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়, এ-কথা তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর এই ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন। কৃষি অর্থনীতির পরিবর্তে অদূর ভবিষ্যতে শিল্প অর্থনীতি দেখা দেবে, এই কথা তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন সেদিন। কিন্তু শিল্পের পথে পদক্ষেপের পক্ষে কি কি বাধা, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রমেশচন্দ্র তাও উপলব্ধি করেছিলেন। বলেছিলেন: "We have to run the race with the treble disadvantage of want of modern industrial training, want of capital, and want of control over our fiscal legislation" আর স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে বলেছিলেন, "It will give a new life to our industrial enterprises and there is nothing which the people of India desire more earnestly than to see Inidian industries flourish and the industrial classes prosper." তাঁর স্বজাতিকে শিল্পে উন্নত করে তোলার জন্য এবং ইংরেজের 'Industrial serfdom' থেকে মুক্ত করবার জন্য, দেখা যায়, রমেশচন্দ্র কতকাল আগে চিন্তাভাবনা করেছেন। দেশপ্রেমের তরঙ্গায়িত উচ্ছ্বাস তাঁর মধ্যে হয়তো ছিল না, কিন্তু যা ছিল তার আন্তরিকতা ও গভীরতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। বাক্যের দ্বারা শিল্পপ্রয়াস সার্থক হয় না, তাই রমেশচন্দ্র সেদিন শিল্পোদ্যোগে অগ্রণী ব্যক্তিদের সাবধান করে বলেছিলেন: "Exert not only by words, lectures on platform, or by writing in the newspaper, but by solid, practical and substantial work." কর্মী মানুষ রমেশচন্দ্র কাজের কথাই বলে গিয়েছেন। তাঁর এই মূল্যবান কথাগুলি কি আজো আমাদের স্মরণযোগ্য এবং অনুসরণযোগ্য নয়?

ক্রমাগত কঠোর পরিশ্রমের পর রমেশচন্দ্রের শরীর একটু অসুস্থ হয়। এইবার বিশ্রামের প্রয়োজন হোলো। বরোদার কাজ থেকে তাই কিছুদিনের

জন্য ছুটি নিয়ে তিনি ১৯০৬, ৯ই জুন তারিখে বিলাত যাত্রা করলেন। এইবার তাঁর ইংলণ্ডে অবস্থানকাল ছিল প্রায় ছয় মাস। নভেম্বরের মাঝামাঝি তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। সমগ্র বাংলাদেশে তখন স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়ে উঠছে। স্বদেশগতপ্রাণ রমেশচন্দ্র বিশ্রামলাভের আশায় বিলাত গেলেও স্থির থাকতে পারলেন না। গোখলের সঙ্গে একযোগে ভারতবর্ষের বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে এবং বিশেষভাবে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ নিয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে আলাপ-আলোচনা ও বক্তৃতাদি করতে থাকেন। ইতিপূর্বে ইংলণ্ডে রমেশচন্দ্রের রাজনৈতিক কর্মের সহকর্মী ছিলেন দাদাভাই নৌরজি ও উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়; এইবার দেখা গেল গোখলে তাঁর সহকর্মী। এইসময়ে তিনি লণ্ডনে কিছুদিন গোখলের সঙ্গে একত্রে অবস্থানও করেছিলেন। ১৯০৬-এর জুলাই মাসে রমেশচন্দ্র যখন লণ্ডনে অবস্থান করছিলেন সেইসময়ে, প্রবাসে উমেশচন্দ্রের (W. C. Bonnerjee) মৃত্যু হয়। উমেশচন্দ্রের শবযাত্রায় তিনি অনুগমন করেছিলেন এবং শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়া অবধি উপস্থিত ছিলেন। ব্যথিতচিত্তে বন্ধু বিহারীলালকে তিনি একপত্রে উমেশচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদ জানিয়ে লিখেছিলেন: "ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি বলে নয়, বস্তুতঃ উমেশচন্দ্র একজন যথার্থ দেশপ্রেমিক ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সত্যই প্রশংসনীয় ছিল।" বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে রমেশচন্দ্র কতটা কাজ করেছিলেন তা জানা যায় বিহারীলাল গুপ্তকে লেখা একখানি পত্র থেকে। এই চিঠির তারিখ ৮ই আগস্ট, ১৯০৬। তিনি লিখছেন: I had not a quiet time in London last month. I worked like a horse to have the Partition upset, making earnest personal appeals to Lord Ripon, Mr. Morley, Mr. Ellis, Sir Charles Dilke and a host of other influential men. My appeals were successful at last. I have achieved what at one time seemed impossible and was declared impossible by Cotton, Gokhale, Wedderburn and others. Morley has declared the Partition a 'settled fact' not to be reversed, but I moved him from his declared opinion." বিলাতের সরকারী

উধ্ব'তন মহলের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের উপর সেই সময়ে রমেশচন্দ্রের প্রভাব কতদূর ছিল, তার সম্যক মূল্যায়ন করতে না পারলে রমেশচন্দ্রের কর্মজীবনের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়াস স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার মতোন, এ-কথা যেন আমরা কখনো বিস্মৃত না হই।

রমেশচন্দ্রের বিলাতে থাকাকালে স্বল্পকালের ব্যবধানে আরো দুইজন বিশিষ্ট ভারতীয়ের মৃত্যু হয়, যথা. বদরুদ্দীন তায়েবজী ও আনন্দমোহন বসু। এঁদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করবার জন্য লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান সোসাইটির উদ্যোগে এবং দাদাভাই নৌরজির সভাপতিত্বে একটি সভার আয়োজন হোলো। এ-সভায় রমেশচন্দ্র ছিলেন প্রধান বক্তা। আনন্দমোহন বসুর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে রমেশচন্দ্র সেদিন বলেছিলেন: "গত পঁচিশ বছর ধরে যাঁরা ভারতের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে আনন্দমোহন বসু ছিলেন অগ্রগণ্য—I hope the example of such men as Badruddin Taybji and Mr. Bose will inspire the members of the younger generation to be always faithful and true to their country, and to work with wisdom and moderation." দুঃখের বিষয় হোলেও, এ-কথা আমরা বলতে বাধ্য যে, বর্তমান কালে কী দেশনেতা, কী দেশকর্মী, কারো মধ্যে আমরা এই গুণগুলি দেখতে পাই না। দেশের কাজ করতে গেলে গলাবাজীর দরকার হয় না; দরকার wisdom, moderation এবং দেশের স্বার্থের প্রতি আনুগত্য। রমেশচন্দ্রের চরিত্রে এই গুণগুলির পূর্ণমাত্রায় সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়।

নিঃস্বার্থ দেশকর্মী রমেশচন্দ্র তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পূর্বে বরোদা থেকে বন্ধু সুরেন্দ্রনাথকে যে পত্রখানি লিখেছিলেন সেটি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। সেই পত্রের একটি অংশ উদ্ধৃত হোলো। তিনি লিখেছেন: "আমাদের কালে কী বিস্ময়কর বিপ্লবই না আমরা দেখে গেলাম! একটি জাতির চিন্তায় ও আদর্শে কী বিপুল পরিবর্তনই না এখন দেখা দিয়েছে! আমাদের সহকর্মিগণ একে-একে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। উমেশ চলে গেল, আনন্দমোহন গিয়েছে, লালমোহনও গত। আমরাও শীঘ্র তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করব।

কিন্তু উনিশ শতক ও বিশ শতকের গোড়ার দিকের ভারতবর্ষের ইতিহাস এই স্বল্পকয়েকজন দেশপ্রেমিকের নাম নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখবে।"

এই তালিকায় রমেশচন্দ্র দত্তের নামটিও যে স্থান পাবার যোগ্য, সে-কথা বলা বাহুল্য।

১৯০৭, জুলাই মাস। রমেশচন্দ্র বরোদা রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। ভারতসচিব লর্ড মর্লে তাঁকে সেপ্টেম্বর মাস থেকে রয়্যাল ডি-সেণ্ট্রালাইজেসন কমিশনের অন্যতম সদস্যপদে নিয়োগ করেন। পারিশ্রমিক মাসিক একহাজার পাউণ্ড। ১৯০৯ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে উক্ত কমিশনের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং এই উপলক্ষে শেষবারের মতন ১৯০৮ সালের মে মাসে তিনি ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন এবং প্রায় ছয়মাস কাল সেখানে অবস্থান করেছিলেন। এই কমিশনের প্রথম সভাপতি ছিলেন স্যর হেনরি প্রিমরোজ। তিনি পরে পদত্যাগ করেন এবং তাঁর স্থলে নিযুক্ত হন স্যর চার্লস হবহাউস। কমিশনে মোট সদস্য ছিলেন পাঁচজন। চারজন শ্বেতাঙ্গ আর একজন ভারতীয়। কমিশনের সেক্রেটারি ছিলেন ভারতীয় সিবিল সার্বিসের বিশিষ্ট কর্মচারী হেনরী হুইলার। ভারতে সরকারী শাসন-কাঠামোর সংস্কার ও উন্নতিসাধনে পরামর্শ দেওয়া-ই ছিল এই কমিশনের বিবেচনার বিষয়। এত বড়ো একটা গুরুত্বপূর্ণ কমিশনে রমেশচন্দ্রের নিয়োগ নিঃসন্দেহে তাঁর ওপর রাজপুরুষদের প্রগাঢ় আস্থার পরিচায়ক; ভারতীয়দের মধ্যে এ-বিষয়ে তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি তখন আর কেই-বা ছিলেন? কমিশনের terms of reference-এর মধ্যে একটি বড়ো রকমের ত্রুটি ছিল—শাসনব্যবস্থার মৌলিক সংস্কারসাধন এর উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে গণ্য করা হয়নি। তবু, রমেশচন্দ্র দেখলেন, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো, শাসনব্যবস্থার অন্ততঃ কিছুটা উন্নতি বা পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে। তাই পরিণত বয়সে তিনি তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে এই প্রয়োজনীয় কাজটিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

ইংরেজ আমলে ভারতশাসন ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের নির্দেশে এই শতাব্দীতে উল্লেখযোগ্য যেকয়টি রাজকীয় কমিশন বসেছিল, সেগুলির মধ্যে

এই 'Decentralisation Commission'টি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কমিশনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বুঝতে হোলে সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক পটভূমিকাটি একটু জানা দরকার। তখন স্বদেশী আন্দোলনের পরিণত অবস্থা, সর্বভারতীয় রাজনীতিতেও তখন দেখা দিয়েছে এক নতুন চিন্তা-ভাবনা, যাকে ভ্যালেনটীন চিরোল তাঁর *India in Unrest* বইতে 'New spirit' বলে অভিহিত করেছেন। এই 'New spirit' বা নতুন চেতনা হোলো পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ। এর প্রবক্তা তখন একজনই ছিলেন—তিনি অরবিন্দ ঘোষ। এই প্রসঙ্গে তাঁর এই সময়কার বক্তৃতাবলী, বিশেষ করে বারুইপুর ও ঝালকাঠিতে প্রদত্ত বক্তৃতা দুইটি স্মর্তব্য। এই New spirit-এর সেদিন যাঁরা ধারক ছিলেন, ইতিহাসে তাঁরা চরমপন্থী (Extremist) হিসাবে অভিহিত হয়েছেন। রমেশচন্দ্র কমিশনের অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হবার পর মর্লেকে যে কয়েকখানি পত্র লিখেছিলেন, তার মধ্যে একখানিতে তিনি এই নতুন রাজনৈতিক চিন্তার দিকে ভারতসচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং তাঁর অসামান্য যুক্তিজাল বিস্তার করে তিনি মর্লেকে বুঝিয়েছিলেন যে, শাসনব্যবস্থায় আমূল সংস্কার প্রবর্তন করতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে ভীষণ অনর্থের সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। আর একখানি পত্রে তিনি ভারত সরকারের তৎকালীন 'Divide and rule' নীতির নিন্দা করে লিখেছিলেন: "হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ-বৈষম্যের প্রশ্রয় দেওয়া স্বদেশের উন্নতির পরিপন্থী; পৃথক নির্বাচন জাতীয় সংহতির মূলে কুঠারাঘাত করবে।" আরো একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ভারতবর্ষে তখন একটি নতুন শাসনসংস্কার প্রবর্তনের কথা চলছিল—ইহাই মিণ্টো-মর্লে সংস্কার। বলা বাহুল্য, কমিশনের উদ্দেশ্য সংকীর্ণ হোলেও, কমিশন যে রিপোর্ট রচনা করেছিলেন, তা প্রত্যক্ষ ভাবে মিণ্টো-মর্লে সংস্কারকে প্রভাবিত করেছিল এবং রমেশচন্দ্রের আগ্রহাতিশয্যে শাসন-সংস্কারের কতকগুলি মৌলিক নীতির উপরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।

এই কমিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করে রমেশচন্দ্র কী পরিমাণ পরিশ্রম করেছিলেন তার সাক্ষ্য দিয়েছেন কমিশনের অন্যতম সদস্য স্যর উইলিয়ম মেয়ার। রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি লিখেছিলেন: "I was much struck by his full and fair examination of witnesses, by his

great interest he took in the Commission's work, and by his constant industry in reading up the voluminous papers that were before us and in writing notes on these."

কমিশনের অবশিষ্ট কাজ ছিল বিলাতে এবং সেই উপলক্ষেই ১৯০৮ সালের জুন মাসে রমেশচন্দ্রকে বিলাতে আসতে হয়েছিল। এই তাঁর শেষবারের মতোন বিলাত আগমন। বিলাতেই কমিশনের রিপোর্ট রচিত হয়েছিল। ঠিক সেই সময়েই লর্ড মর্লে ভারতীয় শাসনব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে পার্লিয়ামেণ্টে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। স্বভাবতঃই রমেশচন্দ্রের দৃষ্টি ও আগ্রহ এই দিকে নিপতিত হোলো। কমিশনের গুরুভার কাজের অবকাশে তিনি মহাসভার আলোচনার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর অন্যতম জীবনীকার মিঃ গ্যাটেসন লিখেছেন : "Mr. Dutt took active interest in the scheme of Reforms which Lord Morley was preparing for India....He interviewed some members of the House of Lords. He discussed reform proposals with members of the India Council ; and he was in close touch with several members of the House of Commons...he exerted himself personally, and through friends, to secure some real reforms for India—to secure some share for Indians in the control and direction of Indian administration. In all this work Mr. Romesh Dutt laboured hand in hand with Mr. Gokhale. No two men were better suited to work together in such a great cause as Mr. Dutt and Mr. Gokhale."*

মনে রাখতে হবে তখন রমেশচন্দ্রের বয়স ষাট বছর ; সেই বয়সে দেশের স্বার্থের জন্য এই যে তন্মনিবেদিত প্রয়াস, ইহাই রমেশ-চরিত্রকে একটি স্বতন্ত্র গৌরব প্রদান করেছে। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন একজন মডারেট ও convinced constitutionalist, কিন্তু একজন মডারেটের পক্ষে দেশের কল্যাণচিন্তা যতখানি অকুণ্ঠভাবে করা দরকার রমেশচন্দ্র তা করে গেছেন।

*_R. C. Dutt_ : G. Natesan

১৯০৭ সালে পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদ যখন আত্মপ্রকাশ করে, তা দমনের জন্ম যে সরকারী নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, এই মডারেট রমেশচন্দ্রই তীব্র ভাষায় তার নিন্দা করে মর্লেকে এক পত্রে লিখেছিলেন: 'I see no remedy to this state of things until the people are strongly represented both in the legislation and in the administration of each province.—" এবং তাঁর এই আবেদন ব্যর্থ হয়নি। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ যে শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের ভেতর দিয়েই অদূরকালে একদিন চরিতার্থতা লাভ করবে, রমেশচন্দ্র অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এই মতবাদ পোষণ করতেন। এ মতবাদ তাঁর বন্ধু, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথও পোষণ করতেন। রাজনীতিতে ক্ষুরধারসম্পন্ন রমেশচন্দ্র তাঁর দূরদৃষ্টিবলে উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতবাসীর পূর্ণস্বাধীনতার আদর্শ চরিতার্থ হবার একমাত্র পথই হোলো শাসনতান্ত্রিক সংস্কার;—কারণ, এর ফলে শাসনব্যবস্থায় দেশের লোকের হাতে ক্রমশঃ ক্ষমতা আসবে। ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের ক্রমিক রূপ-পরিবর্তনের তাৎপর্য অনুধাবন করবার পক্ষে লর্ড মর্লেকে রমেশচন্দ্র যেসব চিঠি লিখেছিলেন, সেগুলির অনুশীলন অপরিহার্য। রমেশচন্দ্র মিণ্টো-মর্লে সংস্কারকে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে সহায়ক হবে বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে স্বায়ত্তশাসনের পথে নিঃসন্দেহে ইহা ছিল সেদিন একটি বড়ো রকমের পদক্ষেপ। অন্ততঃ রমেশচন্দ্র তাই মনে করতেন। "I believe there will be a large expansion of real self-government in all institutions," বন্ধু বিহারীলালকে একখানি চিঠিতে তিনি এই কথা লিখেছিলেন।

১৯০৯, এপ্রিল। স্থান: হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটে রমেশচন্দ্রের ভবন।

ভাইসরয়ের শাসন-পরিষদে মিঃ এস. পি সিংহের (পরবর্তিকালে 'লর্ড') নিয়োগ এই সময়ে ঘোষিত হয়। এই প্রথম যে একজন সম্ভ্রান্ত ভারতীয় বড়লাটের কার্যকরী পরিষদে নিযুক্ত হলেন। এই উপলক্ষে সিংহ-দম্পতির সম্মানে রমেশচন্দ্র তাঁর হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটের নবনির্মিত সুরম্য ভবনে একটি পার্টি

দিলেন। সেদিনের কলকাতায় এটা ছিল একটি স্মরণীয় সামাজিক ঘটনা। শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কর্মজীবনে রমেশচন্দ্র বহু পার্টি দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেই বলেছেন, এমন সাফল্যমণ্ডিত অনুষ্ঠানের আয়োজন এর আগে তিনি আর কখনো করেন নি।

এরপর রমেশচন্দ্রের জীবনের কাহিনী আর অতি অল্পই আছে।

এই বছরের জুন মাসে তিনি পুনরায় বরোদার কাজকার্যে যোগদান করেন। এবার তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন; বেতন মাসিক চার হাজার টাকা। এই পদ গ্রহণের সময় তিনি গাইকোবাড়কে জানিয়েছিলেন যে, তিনি এক বৎসরের অধিককাল এই দায়িত্ব বহন করবেন না। তিনি মনে মনে ঠিক করেছিলেন যে, ১৯১১ সালে অবসর গ্রহণ করবেন এবং তারপর জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি বাংলার একটি স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে অতিবাহিত করবেন। বাঁকুড়া জেলার জলবায়ু শুকনো, তাই তিনি আগে থেকেই সেখানে একটি বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৭ সালেই তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করবেন, সংকল্প করেছিলেন। রমেশ-চন্দ্র যখন বরোদার প্রধান অমাত্য, তখন চাকরি থেকে অবসর নিয়ে বিহারীলাল গুপ্ত ঐ রাজ্যের আইন-সচিবের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, অমাত্যের নির্দেশেই গাইকোবাড় এই নিয়োগে সম্মত হয়েছিলেন। রমেশচন্দ্রের বন্ধু-প্রীতির এটি একটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু বরোদার প্রধান অমাত্যপদে রমেশচন্দ্র অতি অল্পকালই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯০৯, ৩০শে নভেম্বর। বরোদায় রমেশচন্দ্র দত্তের গৌরবময় জীবনাবসান বাংলা তথা ভারতবর্ষের সমকালীন ইতিহাসে এক বেদনাদায়ক ঘটনা।

এই মৃত্যু ছিল নিতান্তই আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত। একষট্টি বছর বয়স হোলেও রমেশচন্দ্রের দেহের স্বাস্থ্য ছিল প্রচুর, আর মনের শক্তি ছিল তেমনি অপরিসীম। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন প্রচুর প্রাণশক্তির একটি মূর্ত বিগ্রহ। মৃত্যুর তিন বছর আগে তিনি একবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তথাপি, তাঁর জীবনীকারের মতে, "He was in perfect health, and in the full vigour of mind and body." কিন্তু যদিও ১৯০৭ ও ১৯০৮, এই দুই বছরে হৃদরোগের আর আবির্ভাব হয়নি, তথাপি অনুমান হয় যে জীবনব্যাপী

নিরলস পরিশ্রমের ফলে ভিতরে ভিতরে তাঁর স্বাস্থ্য জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। প্রদীপের শিখা নিভে যাবার আগে যেমন একবার প্রদীপ্ত এবং উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তেমনি দেখা যায় যে, মৃত্যুর অব্যবহিতকাল পূর্বে রমেশচন্দ্রের স্বাস্থ্যের একটি উজ্জ্বল শ্রী দেখা গিয়েছিল। সেই তারুণ্যমণ্ডিত সুগঠিত দেহ যে ভিতরে ভিতরে জীর্ণ হয়ে এসেছিল, মৃত্যু যে আসন্ন, তাঁর আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব কেউ-ই তা অনুমান করতে পারেন নি। এমন কি, মৃত্যুর তিন মাস পূর্বে বন্ধু বিহারীলালকে এক পত্রে তিনি লিখছেন—"I am fairly enjoying good health." তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুর একটা কারণ ছিল। ১৯০৯-এর নভেম্বর মাসে তৎকালীন বড়লাট লর্ড মিণ্টো সপরিবারে বরোদা রাজ্য পরিদর্শন করেন। এই উপলক্ষে তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন করবার জন্য রমেশচন্দ্রকে গুরুতর পরিশ্রম করতে হয়। তাঁর লৌহ-সদৃশ কাঠামোতে এই পরিশ্রম সহ্য হয়নি। ১৫ই নভেম্বর, বড়লাটের সম্মানে আয়োজিত এবং রাজপ্রাসাদে অনুষ্ঠিত ভোজসভাতেই তিনি হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন। বহু নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গের সমাবেশ ঘটেছে সেই ভোজসভায়; রমেশচন্দ্র রাজ্যের প্রধান অমাত্য, কাজেই সেখানে সর্বক্ষণের জন্য তাঁর উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য। অন্য যে কেউ হোলে পরে ব্যাধির আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই ভোজসভা ত্যাগ করতেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা অপেক্ষা শিষ্টাচার তাঁর কাছে প্রবল মনে হোলো। ঘর্মাক্ত কলেবরে সেই প্রবল ব্যাধির অসহ্য যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করে, ভোজসভার অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত রমেশচন্দ্র বসে রইলেন। শেষ অতিথি বিদায় না নেওয়া পর্যন্ত তিনি ভোজসভা ত্যাগ করেন নি। এই শিষ্টাচারের চরম মূল্য তাঁকে দিতে হোলো। তাঁর স্বদেশ ও স্বজন থেকে সুদূর বরোদায় ৩০শে নভেম্বর রাত্রি দ্বিপ্রহরে রমেশচন্দ্রের মৃত্যু হোলো। মৃত্যুকালে তাঁর শয্যাপার্শ্বে সতীর্থ ও সুহৃদ বিহারীলাল গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। তাঁর এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মৃত্যুকে রমেশচন্দ্র বীরের মতোন প্রশান্ত-চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। পরের দিন সকালবেলায় পরিপূর্ণ সামরিক সম্মানের সঙ্গে বিশ্বামিত্র নদীর তীরে কেদারেশ্বর শ্মশান-ভূমিতে বাঙালির জীবন-প্রভাতের কবির শেষ শয্যা বিরচিত হোল। সেইসঙ্গে চিরকালের মতোন নিস্তব্ধ হয়ে গেল দেশপ্রেমের একটি বলিষ্ঠ কণ্ঠ। বরোদায়

রমেশচন্দ্র একজন সুদক্ষ শাসকহিসেবে অতুলনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাই বুঝি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বরোদার সহস্র-সহস্র নর-নারী অশ্রুসজল চক্ষে তাদের 'গরীবকা দোস্ত' দেওয়ানবাবুর শবানুগমন করেছিল সেদিন। শোকাকুল সেই জনতার পুরোভাগে ছিলেন গাইকোবাড় স্বয়ং। বরোদায় এমন দৃশ্য বহুকাল কেউ প্রত্যক্ষ করেনি।

রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর 'কর্মযোগিন' পত্রিকায় অরবিন্দ লিখেছিলেন: "Of all the great Bengalis of his time Romesh Dutt was perhaps the least original···Though he stood for a time foremost among the most active of Congress politicians, he was neither a Ranade nor a Surendranath; he had literary talent of an imitative kind but no literary genius—was no great Sanskrit scholar, he can not rank with Ranade or even with Gokhale as an economist, yet his are the most politically effective contributions to economic literatute in India that recent years have produced. His history of ancient Indian civilisation is a masterly compilation.···The best things he ever did were his letters to Lord Curzon and his Economic History. In this one instance it may be said that he not only wrote history but created it."

রমেশ-প্রতিভার এই মূল্যায়ন সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে, তবে অপ্রাসঙ্গিক বোধে আমরা সেই বিতর্ক থেকে এখানে বিরত রইলাম। কংগ্রেসের মডারেট নীতিবাদের একটি আলোকস্তম্ভ ছিলেন রমেশচন্দ্র। অরবিন্দের রাজনৈতিক চিন্তায় মডারেটদের জন্য কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। আদর্শবাদী অরবিন্দের পক্ষে তাই বাস্তবধর্মী রমেশচন্দ্র সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি বলা সম্ভব ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও আদর্শবাদী ছিলেন। রমেশচন্দ্রের মৃত্যুতে ব্যথিত চিত্তে কবি যা লিখেছিলেন তা এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই উদ্ধৃত হয়েছে

রবীন্দ্রনাথ রমেশচন্দ্রের সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং তিনি তাঁর স্নেহও লাভ করেছিলেন। রমেশচন্দ্র সম্পর্কে কবির অপকট অনুরাগ সুবিদিত। "তাঁহার সেই প্রচুর প্রাণশক্তি তাঁহাকে দেশহিতকর বিচিত্র কর্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে। অথচ সে শক্তি কোথাও আপনার মর্যাদা লঙ্ঘন করে নাই।" রমেশচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই যে শ্রদ্ধানিবেদন এর তাৎপর্য অনুধাবন করবার মতোন। তাঁর মানসিকতার যে চিত্রটি কবির লেখনী মুখে ফুটে উঠেছে তা কোনো অনুরাগীর অন্ধ স্তুতি-নিবেদন মাত্র নয়, একটি শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ের অকৃত্রিম অনুরাগ।

রমেশচন্দ্রের মৃত্যুতে গভীর আঘাত বোধ করেছিলেন আর একজন। তিনি ভগিনী নিবেদিতা। মর্ডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় তাঁর স্বাক্ষরিত একটি বিশেষ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই মনীষির জীবনাদর্শের বহুমুখীন অভিব্যক্তির কথা যেমন ভাবে আলোচিত হয়েছিল, এমন আর কেউ করেন নি। নিবেদিতা তাঁর এই প্রবন্ধে অরবিন্দের মন্তব্যের একটা উত্তর দিয়েছিলেন। শাসক হিসাবে, অরবিন্দের মতে, রমেশচন্দ্র ছিলেন 'second-rate,'—এর প্রতিবাদ আছে নিবেদিতার প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন: 'As an administrator it is difficult to understand in what sense he was second-rate. As an economician, he was probably more up-to-date than his own countrymen are quite prepared to understand. His economics were not gathered, to any great extent, from foreign books. And thereby they avoided many errors ... In work his industry was appalling...Unassuming, simple, generons to a fault, Romesh Chandra Dutt was a man of his own people. The object of all he ever did was not his own fame, but the uplifting of India."

রমেশচন্দ্রের বিধবা পত্নীকে সান্ত্বনা দিয়ে নিবেদিতা যে ব্যক্তিগত পত্রখানি লিখেছিলেন, তাতে তিনি বলেছেন: "Few women have so noble a record to cherish as yours, so great a name to carry, so lofty a pride! He was so splendid through and through!"

বস্তুতঃ রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর একটি সর্বজনীন শোকের বন্যা বয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশে, ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাইরে, বিশেষ করে ইংলণ্ডে। দেশ-বিদেশের গুণী-জ্ঞানী সকলই তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে জানিয়েছিলেন অপকট শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা। লণ্ডন ও কেমব্রিজে সেদিন তাঁর মৃত্যুতে দুটি শোক সভার আয়োজন হয়েছিল। কলিকাতা পৌরসভায়ও একটি মহতী শোকসভার আয়োজন হয়েছিল। 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় সুরেন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশে অশ্রুতর্পণ করে লিখলেন: "A prince and and a great man has fallen, and from the stage of Indian affairs has passed away one of the most distinguished leaders of thought whom this generation has produced···Administrator, author, orator, thinker—Romesh Ch. Dutt stands out as one of the most prominent men of his generation."

'A leader of thought' বা চিন্তানায়ক, ইতিহাসে রমেশচন্দ্রের ইহাই সঠিক পরিচয়।

রমেশচন্দ্র সম্পর্কে আর একটি কথা বলার আছে। সেটি হোলো তাঁর পত্রসাহিত্য। পত্ররচনায় এমন লিপিকুশলতা এবং মৌলিকতা মাইকেলের পর সেযুগে কেশবচন্দ্র এবং রমেশচন্দ্র ভিন্ন আর কেউ দেখাতে পারেন নি। রমেশচন্দ্র চিঠি লিখতেন ইংরেজিতে এবং তাঁর সমগ্র জীবনে (লণ্ডনে ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে বরোদায় মৃত্যুর একমাস আগে পর্যন্ত) তিনি যেসব চিঠি লিখেছেন তার সংখ্যা পাঁচশতেরও অধিক। মানুষ রমেশচন্দ্রের, বন্ধুবৎসল রমেশচন্দ্রের, অনুগত অনুজ রমেশচন্দ্রের এবং সর্বোপরি স্নেহশীল পিতা রমেশচন্দ্রের সম্পূর্ণ পরিচয় মিলবে এই চিঠিগুলির মধ্যে। স্বীয় পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে তিনি যাদের সঙ্গে নিয়মিত পত্রালাপ করতেন তাদের মধ্যে বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ, লালমোহন ঘোষ, বিনয়কৃষ্ণ দেব ও ভগিনী নিবেদিতার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি অনুভূতিশীল হৃদয়ের সজীব স্পর্শ আছে তাঁর চিঠিগুলির মধ্যে যা সচরাচর দুর্লভ। এখানেই আমরা তাঁর

অবারিত মনের পরিচয় পাই—দেখতে পাই তিনি যেন প্রত্যক্ষভাবে কথা বলে চলেছেন তাঁর পত্রের প্রতিটি ছত্রে। বাংলায় অনূদিত হোয়ে তাঁর এই রসোত্তীর্ণ পত্রাবলীর যদি একটি স্বতন্ত্র সংকলন প্রকাশিত হোতো তবে নিঃসন্দেহে তা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করত। জ্যেষ্ঠা ও দ্বিতীয়া কন্যা কমলা ও বিমলার বিয়ের পর তাদের দুজনকে রমেশচন্দ্র অনেকদিন যাবৎ অনেকগুলি পত্র লিখেছিলেন; অন্যান্য মেয়েদের, এমন কি নাতনীকেও লিখতেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বাসনা ও বেদনায় স্নিগ্ধ অনেকগুলি মুহূর্ত উজ্জ্বল হোয়ে আছে এইসব চিঠিগুলির মধ্যে। তাঁর স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের নিবিড় অনুভূতি মেশানো এই চিঠিগুলি যে কত সুন্দর, কত চিত্তস্পর্শী তা পাঠ করলে পরে সত্যই মুগ্ধ হোতে হয়। সুদীর্ঘ চিঠি লিখতে ভালোবাসতেন রমেশচন্দ্র, নানা কর্তব্যের ফাঁকে হৃদয়কে অবারিত আর মনকে উন্মুক্ত করবার জন্য পত্ররচনায় তিনি কখনো আলস্য বা ক্লান্তি বোধ করতেন না। তাঁর যৌবনের সঙ্গী ও সতীর্থ, সুহৃদ বিহারীলালকে একবার ১৮৯৪ সালে এক পত্রের সঙ্গে তিনি লংফেলোর অনুসরণে দুটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন। তার একটির শেষের চারটি লাইন এখানে উদ্ধৃত হোলো:

"Life is sweeter, life is dearer,
When true friendship links us nearer,
Heart to heart and hand to hand,
As in youth, in age we stand !"

এইভাবে কি অগ্রজকে লেখা, কি স্বীয় আত্মজাদের নিকট লেখা, রমেশচন্দ্রের প্রত্যেকখানি পত্রই সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ আর হৃদয়ের অকপট অনুভূতিতে ভাস্বর। রমেশচন্দ্রের পত্রাবলী নিঃসন্দেহে তাঁর প্রতিভার আরেকটি দিকচিহ্ন।

রমেশচন্দ্রের চরিত্র ও জীবন এবং জীবনাদর্শ, তাঁর বিবিধ কর্মপ্রয়াস এবং প্রতিভার বহুমুখীনতা আলোচনা করলে পরে নিবেদিতার কথার পুনরুক্তি করে বলতে হয়—"He was a man of his own people"—দেশবাসীর সেবাতেই সার্থক তাঁর জীবন। সকলের ঊর্দ্ধে তাঁর চরিত্র, তাঁর স্বদেশবাৎসল্য।

সাফল্যমণ্ডিত বিবিধ প্রয়াস দ্বারা চিহ্নিত সেই জীবন নিঃসন্দেহে উত্তরপুরুষের পরম সম্পদ। চরিত্রবান ও বিদ্যাবিভূতিসম্পন্ন রমেশচন্দ্র দেশসেবা করে গিয়েছেন সম্পূর্ণ আত্মসমাহিত চিত্তে, দেশসেবার ব্যবসায় তিনি করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় বলতে ইচ্ছা হয়: "রমেশচন্দ্রের মত পুত্র আবার কি গর্ভে ধারণ করিবে, মা?"

রমেশচন্দ্রের মৃত্যুতে প্রেসিডেন্সী কলেজে অনুষ্ঠিত এক শোকসভায় (এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়) মনীষি গিরিজা-শঙ্কর রায়-চৌধুরী একটি চমৎকার প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। সেই প্রবন্ধটি থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা এই আলোচনা শেষ করলাম। তিনি লিখেছেন:

"এই বিপুলকর্মী এত কাজ একেলা কি করিয়া করিলেন, এত শক্তি তাঁহাকে যোগাইল কে? উত্তরে বলা যায় যে, তিনি প্রেরণা পাইয়াছেন শক্তির একটি মূল প্রস্রবণ হইতে। সেই প্রস্রবণ তাঁহার জীবনব্যাপী একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা—এই আকাঙ্ক্ষার প্রাচুর্যে ও মহত্ত্বে তাঁহার হৃদয় নিশিদিন পরিপূর্ণ ছিল।...একদিন অচেতন জাতিকে লইয়া যাত্রা আরম্ভ করিয়া এক জীবনেই যে তাহাকে অর্ধজাগ্রত অবস্থায় পৌছাইয়া দিয়া বিদায় লাভ করিতে পারিয়াছেন, এজন্য তাঁহার জীবনব্যাপী উদ্যম যেন অনেকটা সফল হইয়াছে ভাবিয়া মৃত্যুশয্যায় তিনি কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইয়াছেন।...তিনি দেশকে ভালবাসিতেন, শুধু মুখে নয়, শুধু হুজুগে নয়। বস্তুতঃ দেশকে হৃদয় দিয়া ভাল না বাসিলে, শত ক্ষমতা ও যোগ্যতা সত্ত্বেও, দেশের কোন প্রকৃত মঙ্গল করা যায় না। বুকের পাঁজরের তলায় এই দুর্ভিক্ষ ও অত্যাচার-পীড়িত দেশের সম্মিলিত তপ্তশ্বাস আসিয়া অন্তরকে নিয়ত দগ্ধ করিত বলিয়াই, দীননয়নে অসহায়, নিরুপায় কোটী দেশবাসী প্রতীকার ভিক্ষা করিত বলিয়াই তিনি ধ্রুবতারার মত একটি লক্ষ্যের প্রতি নিশিদিন চিত্তকে জাগ্রত রাখিয়াছিলেন।"

এই মহৎ জীবনের পরিপূর্ণ অনুশীলন দ্বারাই আবার গড়ে উঠবে বাঙালির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

॥ পরিশিষ্ট ॥

মহাভারত ও রামায়ণ

[মহাভারত ও রামায়ণ মহাকাব্যদুখানির ইংরেজি অনুবাদের সঙ্গে রমেশচন্দ্র যে সুচিন্তিত ভূমিকা লিখেছিলেন, এখানে সেই ভূমিকাদুটির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ দেওয়া হোল।]

১। মহাভারত

যদি কোনো বৈশিষ্ট্য মহাভারত এবং ভারতবর্ষের আর একটি মহাকাব্যকে পরবর্তি সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্য হতে স্বাতন্ত্র্য দান করে থাকে তবে তা হচ্ছে কবির কাহিনী কথনের অপূর্ব সারল্য। এই সরলতাই এই কাব্যদুটিকে অন্য সব সংস্কৃত কাব্যের কৃত্রিম সৌন্দর্য হতে পৃথক করে দিয়েছে। কালিদাসের কাব্য অলঙ্কার ও উপমায় ঐশ্বর্যময় কিন্তু মহাভারত সরল, অমার্জিত—তার অলঙ্কার স্বয়মাগত। দেবপাদ রাজগণের মহান কার্য কবিকে দেবতার অমেয় শক্তি স্মরণ করিয়েছে, যোদ্ধার দ্রুতধাবন শব্দমর্মরিত আবণ্য হস্তীযূথের মত্ত পদক্ষেপের স্মৃতি জাগিয়ে দিয়েছে। কবি শরসঞ্চালনের শব্দে সমুদ্র-বিহঙ্গের পক্ষসঞ্চালন, ক্রমবর্ধমান জনস্রোতে উদ্বেলিত ঊর্মিমালা, যোদ্ধার ঋজুতায় উত্তুঙ্গ পর্বত এবং নীলাব্জের মাধুরীতে কুমারীর লাবণ্য প্রত্যক্ষ করেছেন।

সমস্ত উপমা স্বাভাবিক ভাবে এসে কবির নিকট উপস্থিত হয়েছে, কবি তাদের স্পর্শে কাব্যকে সুষমামণ্ডিত করেছেন, কিন্তু কখনোই তিনি উপমার সন্ধানে ফেরেন নাই। পাঠকের চিত্ত জয় করবার জন্য কবি তাঁর অপূর্ব কাহিনী, বীরের চরিত্র এবং ঘটনার উদ্দীপন শক্তিকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। মহিমময় সংস্কৃত ছন্দ কবির সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল, কিন্তু অনবধানতা হেতু রচনায় যে বিচ্যুতি ঘটেছিল, পরবর্তি যুগের বৈয়াকরণিকগণ তাকে 'আর্ষ' নামে অভিহিত করেছেন। কবি কখনোই তাঁর কাব্যকে কৃত্রিম অলঙ্কারে ভূষিত করেন নাই, মানবচিত্তবিনোদনের জন্য তিনি বীরের মহান কাহিনী গ্রহণ করেছেন।

আর কি অপূর্ব সেই শূরদল। পরবর্তিকালের সংস্কৃত কাব্য হতে

মহাভারতের চরিত্র বহুরূপে শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ উত্তরকালের সংস্কৃত কাব্যগুলি সৌন্দর্যময় হলেও তাতে নূতন কোন চরিত্রের দেখা মেলে না।

সব বীরের একই আকার। প্রত্যেক প্রেমার্তা নায়িকা নীরব বেদনায় ক্লিষ্ট, বিদূষক হয় চতুর নচেৎ নির্বোধ এবং প্রতিটি হৃদয়হীন প্রতারকের পরিণাম যন্ত্রণাময়। এখানে এক যোদ্ধার সঙ্গে অপরের, এক নারীর সহিত দ্বিতীয়ার বিশেষ কোনো প্রভেদ নাই। মহাভারতের প্রতিটি চরিত্র বৈচিত্র্য এবং স্বকীয়তায় দেদীপ্যমান। এক ইলিয়াড্ ছাড়া এমন কোনো কাব্য নাই যেখানে মহাভারতের মত স্বাভাবিক চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে। মহাভারতকার দান্তের মত দুঃখ দহনে তাঁর সৃষ্টিকে ক্লিষ্ট করেন নাই, সেক্সপীয়রের হৃদয়াবেগের তীব্র উদ্বেলতাও সেখানে নাই। এই কাব্য আধুনিক ভাস্করের সৃষ্টির অসাধ্য। এখানে প্রাচীন শিল্পীর তুলিকাস্পর্শে অমৃত-চরিত্র মানব প্রত্যক্ষ হয়েছে। এখানে অন্ধ রাজমহিমান্বিত ধৃতরাষ্ট্র, মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবীর পিতামহ ভীষ্ম, শস্ত্রগুরু দ্রোণ, আত্মাভিমানী মহাধনুর্ধর কর্ণের দেখা মেলে। প্রতিটি চরিত্র মহান ও স্বকীয়তার বৈচিত্র্যে অনুপম। ধর্মাশ্রয়ী রাজা যুধিষ্ঠির, বৃকোদর ভীম, কিরিটী অর্জুনকে মহাভারতের এ্যাগামেনন, এ্যাসাক্স এবং এ্যাকিলস বলা চলে। অহমিকাদ্ধোত দুর্যোধন এবং দুর্দমনীয় দুঃশাসন কুরু অগ্রগণ্য। জ্ঞান ও চরিত্রমাধুর্যে শ্রীকৃষ্ণ ইউলিসিস হতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। মহাভারতের নারী-চরিত্রগুলিও এমনি অপূর্ব। সার্থকস্রষ্টা কবি তার অমর তুলিকাস্পর্শে অজস্র বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। রাজমাতা গরবিনী গান্ধারী, সন্তানবৎসলা পৃথা, রোষদীপ্তা গর্বিতা দ্রৌপদী ও ধীমতী সুভদ্রার চরিত্র কবির তুলিকাস্পর্শে মূর্তিমতী হয়েছে।

মহাভারতের চরিত্র চিত্তাকর্ষক, কাহিনী অপূর্ব। ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চের প্রতিটি দৃশ্যই সম্পূর্ণ এবং আকর্ষণীয়। রাজপুত্রগণের অস্ত্র-পরীক্ষার আসরে ভারতকাব্যের এ্যাকিলস ও হেক্টর অর্জুন এবং কর্ণের প্রথম সাক্ষাতেই বৈরীভাবের উদ্রেক, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরোৎসব, যুধিষ্ঠিরের সাড়ম্বর রাজ্যাভিষেক, মদোদ্ধত শিশুপাল বধ, অক্ষক্রীড়ার চরম পরিণতি, অবমাননাকারীর উদ্দেশে দ্রৌপদীর কোপ, পাণ্ডবের তপোবনবাসের স্নিগ্ধ ছবি, মৎস্যদেশে গোধন-হরণ-কালে ছদ্মবেশী অর্জুনের যোদ্ধবেশ ধারণ ও বিজয়লাভ এবং মহাযুদ্ধের সূচনায়

বীরগণের প্রাজ্ঞ ভাষণ প্রভৃতি দৃশ্য পাঠকের মনকে বিস্ময়াপ্লুত করে দেয়। তারপর অষ্টাদশ দিবসব্যাপী মহাপ্রলয়! অপেক্ষাকৃত কম ঘটনাবহুল প্রথমাংশ কবির তুলিকার কয়েকটি ত্বরিতস্পর্শে অঙ্কিত হয়েছে, কিন্তু ভীষ্মের পতনের পর হতেই পাঠকের কৌতূহল বর্ধিত হতে আরম্ভ করে। অর্জুন-তনয়ের করুণ মৃত্যু, অর্জুনের প্রতিশোধ গ্রহণ, শস্ত্রগুরু দ্রোণের মৃত্যু প্রভৃতি দৃশ্যগুলি একে একে এসে উপস্থিত হয়। তারপর এই মহাযুদ্ধের দুই নায়ক কর্ণার্জুনের যুদ্ধদৃশ্য কাব্যের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা। নিশীথে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড এবং দুর্যোধনের মৃত্যু যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। কাব্যের শেষাংশে বীরগণের অন্তিম যাত্রা এবং যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুবাদে দুটি খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে।

গ্লাডষ্টোন বলেছেন—বাস্তব অভিজ্ঞতার বাহিরে জ্ঞান যখন সীমিত ছিল, জীবন যখন ছিল প্রাণচঞ্চল তারুণ্যে সবুজ, তখন হোমারের কাব্য অন্য কাব্য হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে জ্ঞান-মঞ্জুষা রূপে বর্তমান ছিল।

মহাভারত সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। এই কাব্য প্রাচীন ভারতের জ্ঞান ও জীবনের জ্ঞান-রত্নাকর। মহাভারত অতীতের অবগুণ্ঠন মোচন ক'রে বিগত সভ্যতাকে দৃশ্যমান করে তুলেছে।

সর্বশেষে বলা যায় আধুনিক ভারতীয় তার প্রাচীন ঐতিহ্যকে গ্রহণ করতে জানে। এ সত্য অতিশয়োক্তি নয় যে, বিংশ কোটী হিন্দুর হৃদয়ে ভারত-কাহিনী লালিত হয়। শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে এমন হিন্দু নাই যার শৈশব জীবন মহাভারতের চরিত্রে প্রভাবিত হয় নাই। প্রায় অশিক্ষিত তেলী, মোদক প্রভৃতি সম্প্রদায় মহাভারত পাঠে চিত্ত বিনোদন করে। উত্তর-পশ্চিমের দীর্ঘদেহী সবল কৃষক যেমন পাণ্ডব ও কৃষ্ণকে জানে, বোম্বাই ও মাদ্রাজের জনগণের মনও তেমনি ধর্মযুদ্ধের কাহিনী অধিকার করে আছে। কাব্যের বিক্ষিপ্ত কাহিনীগুলি কাব্যরসে বিঘ্ন ঘটালেও তাদের মনোহারিত্ব ও বিশিষ্টতা জনচিত্ত অধিকার করে তাদের নৈতিক চরিত্র গঠন করে দিয়েছে।_ ভারতের জননী, প্রৌঢ় পিতা তাদের তনয়-তনয়ার জ্ঞান-বিকাশের জন্য মহাভারতের কাহিনী অপেক্ষা বলবার মত অধিকতর যোগ্য কথা জানেন না। এই দুই কাব্য হিন্দুর জাতীয় সম্পদ। ইয়োরোপে কিন্তু ঠিক এমনটি দেখা যায় না। গ্রীসে হোমারের কাব্য, ইতালিতে ভার্জিলের

এবং ইংরেজি ভাষা-ভাষী অঞ্চলে সেক্সপীয়র এবং মিল্টনের কাব্য আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করতে পারি। খৃষ্টীয় জগতে এক বাইবেল ব্যতীত অন্য কোনো গ্রন্থ মহাভারত রামায়ণের মত এমন নৈতিক প্রভাব বিস্তার করে নাই। তিন সহস্র বৎসর ধরে হিন্দু এই দুই মহাকাব্যের উত্তরাধিকারী বিংশ কোটী হিন্দুর জাতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে এই কাব্য একান্তভাবে জড়িত।

২। রামায়ণ

মহাভারতের মত রামায়ণও বহু শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছে। মূল কাহিনী একই কবির কল্পনাসম্ভূত বলে স্পষ্টই ধারণা হয়। কুরু ও পাঞ্চালের যুদ্ধ কাহিনী মহাভারতের উৎস এবং রামায়ণের সৃষ্টি হয়েছে কোশল ও বিদেহ রাজগণের স্বর্ণযুগের স্মৃতি অবলম্বনে। মহাভারতের চরিত্র বাস্তবানুগ এবং জীবন্ত। রামায়ণের চরিত্রাদর্শ—সত্য, নিষ্ঠা, প্রেম ও কমনীয়তা। বংশানুক্রামিক দ্বন্দ্বের সত্য অথবা কল্পিত কাহিনী আশ্রিত গাথা মহাভারতের বিষয়বস্তু। রামায়ণের কবি এক স্বর্ণযুগের স্মৃতি উদ্বোধন করে যে ভক্তি, বিশ্বাস, দুঃখ ও গার্হস্থ্যজীবনের প্রেম বর্ণনা করেছেন তাই রামায়ণকে মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। মহাভারত মহাকাব্য আর রামায়ণ ভারতবাসীর হৃদয়ের ধন।

মহাভারতের গম্ভীর সৌন্দর্যমহিমা অতুলনীয় কিন্তু জীবনের যে নিগূঢ় অনুভূতি রস সমস্ত মানুষকে একসূত্রে গ্রথিত করে তা রামায়ণে এত প্রচুর-ভাবে বর্তমান যে কেবল হিন্দু নয়—জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে এই কাব্য সমান সমাদর লাভ করেছে। রামের প্রজাবাৎসল্য, প্রজার রাজপ্রীতি অতি সুন্দর। এই আনুগত্য প্রত্যেক যুগেই হিন্দুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কর্তব্যনিষ্ঠ রাম। মুমূর্ষু পিতার শয্যাপার্শ্ব হতে রাজপুত্রের নির্বাসনের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কাহিনী বর্ণনার বলিষ্ঠতায় এবং সংবেদনশীলতায় ভারত-সাহিত্যে অতুলনীয়। রাজপুত্রের গুণমুগ্ধ মমতাময়ী বিমাতা যখন পুত্রের রাজ্যাভিষেকের আনন্দে মগ্ন তখন ক্রূরবুদ্ধি পরিচারিকা সেই আনন্দকে বিষাক্ত করে দিল। নারীর সুপ্ত অসূয়া জাগ্রত হয়ে তরুণী-পত্নীর হৃদয়াবেগ ও জননীর শঙ্কার সঙ্গে একত্র মিলিত হ'ল।

প্রবীণা ধাত্রীর অশ্রু বিষের মতন
প্রবেশিল মনে
মিশিল মাতার ভীতি বণিতার
আবেগের সনে।

সেবিকার হীন বুদ্ধি রাণীর মনকে বিকৃত করে দিল। স্বামীকে প্রভাবান্বিত করে স্বীয় পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করতে তিনি দৃঢ়সংকল্প হলেন। তরুণীর প্রতিজ্ঞা বর্ষীয়ান রাজাকে দুর্বল করে দিল। রাম নির্বাসনে গেলেন। অতীতের কার্যের জন্য রাজার করুণ বিলাপ, বর্তমানের জন্য আত্মধিক্কার ও পুত্রশোকে প্রাণ ত্যাগ প্রভৃতি ঘটনা এই দৃশ্যের শেষাংশকে কারুণ্যমণ্ডিত করেছে। মানব-মানসের বিচিত্র গতি, হীন ষড়যন্ত্র, স্ত্রীরূপে রাণীর হিংসা, মাতৃরূপে বৈরিতা, নারী ও রাজরাণীর ক্ষমতালুব্ধতা, প্রবীণ পিতা ও স্বামীর দৌর্বল্য ও নিরাশার দ্বন্দ্ব প্রভৃতি ঘটনা এর চেয়ে অধিকতর জীবন্ত করে চিত্রিত হয়নি।

সেক্সপীয়র এমন হৃদয়াবেগে আপ্লুত বাস্তব চিত্র আঁকতে পারেন নি। বীরত্ব কাহিনী বর্ণিত না হলেও উপরোক্ত দৃশ্যাবলীর জীবন্ত বাস্তব রূপই রামায়ণের প্রধান সম্পদ। পারিবারিক জীবনের প্রেম, প্রীতি ও দ্বন্দ্বের কাহিনী ভারতীয় সমাজে সর্বস্তরের জীবনকে স্পর্শ করেছে। রামের ন্যায়পরায়ণতা ও সীতার সতীপ্রেম স্বর্ণসূত্রের মত এই মহাকাব্যের মধ্যে দীপ্তমান হয়ে হিন্দুর নিকট একে মহান করে তুলেছে। হিন্দুর আদর্শ পুরুষ ও নারী—রাম এবং সীতা। অগ্নিপরীক্ষা, প্রলোভন, ভাগ্যবিপর্যয় সমস্ত দুর্যোগের মধ্যেও তাঁরা নিজ কর্তব্যে অবিচল। আত্মপরীক্ষা ও সহনশীলতা যদি হিন্দু পুরুষচরিত্রের আদর্শ হয়, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগও তবে হিন্দুনারীর আদর্শ। সীতা হিন্দু রমণীর চিত্তে এমন স্থান অধিকার করে আছেন যেখানে আর কোনো কবির কোনো সৃষ্টি পৌঁছিতে পারেনি। প্রায় সমস্ত হিন্দু তরুণীর শৈশবস্মৃতি সীতার করুণ কাহিনীতে ভরে থাকে। এই কাহিনী হিন্দুবালিকা মায়ের কোলে, স্বজন পরিমণ্ডলীতে বসে সারা-জীবন ধরে শুনছে, স্মরণে রাখছে।

প্রাচীন গ্রীসে জীবনের আদর্শ ছিল সৌন্দর্য সুখানুভূতি এবং প্রাচীন ভারতের আদর্শ হ'ল কর্তব্যনিষ্ঠা ও সহনশীলতা এবং প্রীতি। হেলেনের

নারীচরিত্রের রসমাধুরী সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ সম্মোহিত করেছে, আত্মত্যাগী, নিষ্ঠাপূত সীতাচরিত্র যুগ যুগ ধরে মুগ্ধ করেছে হিন্দুকে।

ভারতবর্ষে এই দুটি মহাকাব্য সৃষ্টির কারণ আধুনিক পাঠক সহজেই বুঝবেন। মানবজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা যদি সত্যের পাবকশিখায় দীপ্ত হয়ে কাব্যে স্পন্দিত না হয় তবে সে কাব্য শাশ্বত গৌরবের অধিকারী হতে পারে না।

ভারতের অতীত যুগের বীরদের কাহিনী ও আদর্শ মহাভারতের উপজীব্য আর হিন্দুর প্রাচীন পারিবারিক জীবন, ধর্মজীবন তার সমস্ত মাধুর্য নিয়ে রামায়ণে স্থান পেয়েছে।

একটি কাব্য অন্যটির পরিপূরক। বিস্মৃত অতীতের শৌর্য-বীর্য ও জীবনাদর্শ এরাই আমাদের নিকট উন্মোচিত করেছে। ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোনো দেশ তার প্রাচীন সভ্যতার এমন জীবন্ত চিত্র সংরক্ষণে সমর্থ হয়নি। জাতীয় জীবন, সভ্যতা, ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ এবং ধর্মসংস্কারের উপর মহাকাব্যদুটির প্রভাব অনুভবের মধ্য দিয়ে জাতির গত তিন সহস্র বৎসরের ইতিহাস উদ্ভাসিত হয়েছে।*

* অনুবাদ: শ্রীনমিতা চক্রবর্তি।